অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য

সম্পাদিত

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট শিল্পী
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

বুদ্ধদেব বসু

জন্ম : ১৯০৮, কুমিল্লা। ছেলেবেলায় নোয়াখালিতে ছিলেন, তারপর ঢাকায়। ছাত্রাবস্থায় 'কল্লোলে'র সঙ্গে যুক্ত হন, ঢাকা থেকে অজিত দত্তর সহযোগিতায় 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের এম. এ.। ১৯৩১ থেকে কলকাতায় বসবাস করছেন, কলকাতার কোনো-এক কলেজে দীর্ঘকাল ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'সাড়া', ১৯৩০; প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা', ১৯৩০; প্রথম ছোটোগল্পের বই 'অভিনয়, অভিনয় নয়', ১৯৩০। এঁর প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে আশির ঊর্ধ্বে।

বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৫ সালে 'কবিতা' নামক ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রায় একই সময়ে 'কবিতাভবন' নাম দিয়ে একটি প্রকাশালয় স্থাপন করেন। তাঁর পরিচালনায় 'কবিতা' পত্রিকা আধুনিক বাংলা কবিতার মুখপত্র, এবং কবিতাভবন নবীন লেখকদের একটি কেন্দ্রস্থল হ'য়ে ওঠে। ইনি মাঝে-মাঝে ইংরেজিতেও লিখে থাকেন, নিজের গল্প কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ভারতীয় ও বৈদেশিক পত্রাদিতে প্রকাশ করেছেন, এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে 'An Acre of Green Grass' নামে এঁর একখানা ইংরেজি বই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে।

উৎসর্গ

পরিমল রায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পটি 'ওথেলো' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো, এই সংকলনে নাম বদলে দিলাম। 'অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস—আর বুলু' 'এরা আর ওরা'র দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু খণ্ডিত আকারে মুদ্রিত আছে; এই গ্রন্থে তার মূল পাঠ পুনরুদ্ধার করা হ'লো। সবগুলি গল্পই প্রভূতরূপে পরিমার্জিত হয়েছে, এবং গল্পগুলি সাজানো হয়েছে মোটামুটি কালানুক্রম রক্ষা ক'রে। এদের রচনার কাল ১৯২৭-১৯৪৬।

বু. ব.

ভূমিকা

১

Anarchy has been bitter in Bengal, sanity sabotaged, and dark, now, with confusion is our literary scene···But Time, the inscrutable scene-shifter, is tirelessly at work, and history teaches us to hope that the blight will soon be over. Specially now that our political freedom has been attained, there is every reason to look forward to a time when our literature, released from the obligations of public service, freed from froth, cured of sobs and bravado, will become adult, fully mature. The soil is rich, the waters are sweet, and the seed of Rabindranath cannot have been cast in vain.

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থ—An Acre of Green Grass-এর উপসংহারে এই মন্তব্যই করেছেন। সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁর নিজের সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পিমানসের পরিচয় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধকালীন প্রচারসর্বস্ববাদী যে সাহিত্যকে তিনি অরাজকতা ও সুস্থবুদ্ধি-ভ্রংশের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন, যুদ্ধের ডামাডোলেও তিনি সর্বপ্রযত্নে নিজের রচনাকে সেই দুর্লক্ষণ থেকে মুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। জনসেবার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি-পাওয়া সাহিত্যের বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরিপক্বতার যে ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে, বুদ্ধদেবের পরিণত রচনায় রয়েছে তারই পথনির্দেশ। বিশুদ্ধ-সাহিত্যসৃষ্টির এ আদর্শকে পলায়নী-মনোবৃত্তি-প্রসূত কলাকৈবল্যবাদ বলে উপহাস করা সহজ, কিন্তু প্রচারবাদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তায় যখন দশদিক উন্মুখর, তখন

সাহিত্য-সৃষ্টির এ প্রেরণায় অবিচলিত থাকা একেবারেই সহজ নয়। বাংলা সাহিত্যে আজ যাঁরা ঐকান্তিক শিল্পপ্রেরণাকেই সাহিত্যসৃষ্টির নিঃশ্রেয়স বলে মনে করেন বুদ্ধদেব তাঁদেরই অগ্রপথিক। তাঁর দৃষ্টিতে শিল্পায়নের মূল্যেই জীবনায়নের মূল্য।

অথচ আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে সেদিনকার এই তরুণতম প্রতিভার দুঃসাহসী আত্মপ্রকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবলতম আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তখন কলকাতায় 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র পৃষ্ঠায় সাহিত্যে নবযুগসৃষ্টির বিদ্রোহী বাসনা নিত্য নব-নব শিল্পরূপ গ্রহণ করছে। 'সবুজ পত্রে'র যুগকেও পিছনে ফেলে জীবনের নব নব দিগন্তে নতুন সৃষ্টির উৎস সন্ধানে বেরিয়েছে বেপরোয়া তরুণের দল। নবযৌবনের সেই দুকূলপ্লাবী ভাববন্যায় ভেসে গিয়েছে সাহিত্যের পরিচিত তটরেখা, প্লাবিত হয়েছে সংযম শালীনতা ও সুনীতির প্রচলিত সীমানা। বাংলা সাহিত্যের সেই বিপ্লবী পরিবর্তনের দিনে সেই নবভাববিলাসী তারুণ্যের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বুদ্ধদেব ঢাকা থেকে প্রকাশ করলেন 'প্রগতি' পত্রিকা। 'প্রগতি' 'কল্লোল'-'কালিকলমে'রই কনিষ্ঠ সহোদর। সম্পাদক বুদ্ধদেবও তরুণ দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। 'কল্লোলে' প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'রজনী হল উতলা' রচনার সময় তাঁর বয়স কৈশোরের সীমানা পেরোয় নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লেখা সতেরো থেকে উনিশ বছরের মধ্যে; আর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'সাড়া' রচনার বয়স উনিশ-কুড়ি। বয়সের দিক থেকে নিতান্ত অর্বাচীন এই কিশোর-প্রতিভার বলিষ্ঠ আবির্ভাব একেবারে প্রথম থেকেই রসিক ও সমালোচকদের উচ্চকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এত অল্প বয়সে এত নিন্দা ও এত প্রশংসা, এককথায় এমন স্বীকৃতি, আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে জুটেছে বলে আমাদের জানা নেই। বলাই বাহুল্য, সেদিনকার বিরুদ্ধ সমালোচকেরা একটু বাড়াবাড়িই করেছিলেন। বয়ঃসন্ধির উদ্দামতাকে তাঁরা পরিণত বয়সের রচনার মাপকাঠিতে বিচার ক'রে নিশ্চয়ই ভুল করেছিলেন।

তাছাড়া, সেদিনকার যে লেখকগোষ্ঠীর সহযাত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদের সম্মিলিত কীর্তি ও অপকীর্তির নিন্দা-প্রশংসাব সমভাগী তাঁকেও স্বাভাবিক নিয়মেই ধুঁতে হয়েছিল। কিন্তু যেদিন থেকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী লেখকগণ নিজ নিজ স্বকীয়তায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন, সেদিন থেকেই বুদ্ধদেবের সাহিত্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিজস্ব প্রতিভার আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠল।

বুদ্ধদেব ব্যক্তিজীবনে—'কল্লোল যুগে'র লেখকের ভাষায়—নিভৃততম মানুষ, একান্তই অন্তর্মুখী। কিন্তু শিল্পিজীবনে বিচিত্রতম প্রকাশের বহুমুখীনতায় অজস্রবর্ষী। গল্প-উপন্যাসে, কাব্য-নাটকে, লঘুপ্রবন্ধ ও সমালোচনায় সমান দক্ষতাসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। বস্তুত কাব্য, কথাশিল্প ও প্রবন্ধ-সাহিত্যেব ত্রিবেণী-সংগমে বাণীসাধনার অমন সার্বভৌম সফলতা এ-যুগের সাহিত্যেও সর্বদা চোখে পড়ে না। আর গত পঁচিশ বৎসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষাব ভিতর দিয়ে ক্রমবিকশিত পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করলে বুদ্ধদেবের সাহিত্যধর্মের পুনর্বিচার আজ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। শুধু পরিণত কালের রচনাই নয়, বয়ঃসন্ধির সার্থক রচনাবলী সম্পর্কেও সমকালীন বিরূপতা আজ পরিহারযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। আর বুদ্ধদেবের শিল্পপরিণতির এই ইতিহাস অনুকরণ করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, কাব্যে ও কথাশিল্পে তিনি রবীন্দ্রগোত্রের শিল্পী, রবীন্দ্রনাথেরই বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। আজ মনে হয়, তাঁর প্রথম যুগের রবীন্দ্র-বিদ্রোহ পরিণত যৌবনেব রবীন্দ্রানুসরণেরই পূর্বরঙ্গ মাত্র। ......and the seed of Rabindranath cannot have been cast in vain.

২

বলা হয়েছে, বুদ্ধদেবেব দৃষ্টিতে শিল্পায়নের মূল্যেই জীবনায়নের মূল্য। কোন বিরাট সংস্কৃতির ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যথার্থ শিল্পিমাত্রেরই সম্পর্কে কথাটি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্পর্কে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। মানুষের সাহিত্যসংস্কৃতির

সুদীর্ঘ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সাহিত্যপ্রতিভা মূলত দুই জাতের। এক, যাঁদের কাছে জীবনসাধনাই মুখ্য ; আর, যাঁদের কাছে জীবনসাধনাও বাহ্য, শিল্পসাধনাই সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ কথা। ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকি-বেদব্যাস মুখ্যত জীবনসাধক, আর কালিদাস-ভবভূতি মূলত শিল্পসাধক। বাংলায় চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম-বঙ্কিমচন্দ্র জীবনসাধক ; আর জয়দেব-বিদ্যাপতি-ভারতচন্দ্র-মধুসূদন শিল্পসাধক। কদাচিৎ কোন লোকোত্তর মহাপ্রতিভার মধ্যে এই উভয় ধর্মের সম্মিলন ঘটে। যেমন রবীন্দ্রনাথে ঘটেছে। এঁরা জীবনশিল্পী। এঁদের জীবনসাধনা আর শিল্পসাধনায় কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কোন দেশের জাতীয় জীবনে পুনরুজ্জীবনের সাধনা যখন একটা সুন্দর সার্থকতায় উপনীত হয় তখন সেই বিপুল ঐতিহ্যের মধ্যে যে প্রতিভা জন্মলাভ করে, সে উত্তরাধিকার সূত্রেই শিল্পসাধনার প্রবণতা নিয়ে আবির্ভূত হয়। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রথম জাতের সাহিত্যস্রষ্টাদের কারবার ; কিন্তু এঁদের সাহিত্যের প্রেরণা আসে প্রাক্তন সাহিত্যের ভাবজগতের মধ্যে পরিক্রম হয়ে। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য মুখ্যত শিল্পসাধনারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর সাহিত্যের উপকরণ ততটা সংগৃহীত হয়নি যতটা হয়েছে সাহিত্যসংস্কৃতির ব্যাপক ও গভীর অনুশীলনে। তাঁর সাহিত্যের ফলশ্রুতি হল, জীবনের শিল্পায়ন-বৃত্তির মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য। আর্ট অভিনয় নয়, আর্টই জীবন। বরং জীবনের চেয়েও আর্ট অনেক বড়।

'অভিনয় নয়' গল্পের প্রেমচতুর নায়ক প্রতুলের কাছে নায়িকা রমা মূর্তিমতী প্রহেলিকা। 'রমা প্রেমকলায় কারুশিল্পী ; কবিদের যেমন কবিতা লেখার উপলক্ষ্যের অভাব হয় না, ওরও তেমনি প্রজাপতিপনার উপকরণের অকুলোন ঘটত না কখনো। মনোহরণের বিদ্যায় ও ছিল আজন্মসিদ্ধা।' রমার এই দুর্বোধ্য প্রণয়কলার মূল্য নিরূপণে যখন প্রতুলের বিদ্যা বুদ্ধি চাতুর্য সমস্তই ব্যর্থ, তখন রমার অন্তরুন্মীলনে সহায়তা করল শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটকের অভিনয়। সীতা-

রামের প্রণয়মহিমার শিল্পসৌন্দর্যে তন্ময়ীভূতা রমার ব্যক্তিত্ব শিল্পের সাধারণীকৃতির প্রভাবে চিরন্তনী নারীসত্তায় বিগলিত হল। শিল্পই জীবনকে সার্থকতার পথ দেখালো।

বুদ্ধদেব ইংরেজি সাহিত্যে পারংগম। বিশেষত প্রথম-সমরোত্তর ইংরেজি সাহিত্য এবং তার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সুগভীর। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে যে রবীন্দ্রসাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার মূলে রয়েছে তৎকালীন ইংরেজি ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। বস্তুত শুধু বুদ্ধদেবই নন, সে যুগের তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠী সাগর-পারের সাহিত্যজগতের নতুন হাওয়াকে আমাদের দেশেও চালু করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। প্রথম-সমরোত্তর ইয়োরোপের বিপর্যস্ত জীবনযাত্রায় যে বেআব্রুতা দেখা দিয়েছিল আমাদের সাহিত্যেও তারই প্রতিফলন অনিবার্য হয়ে উঠল। দেশীয় সাহিত্যে এই বিদেশী হাওয়া সে-যুগে বহুনিন্দিত হলেও নিতান্তই অপরিহার্য ছিল। রবীন্দ্রনাথেরই গৌরবে বাংলার সাহিত্যসেবীরা সেদিন সারা পৃথিবীর নাগরিকত্বের অধিকার পেয়েছিলেন। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে দেশ-দেশান্তরের মানুষও মানুষের অতিনিকট প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর কোথাও জীবনের নতুন মূল্যবোধ দেখা দিলে প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশেরই জীবন্ত প্রাণে তা প্রতিস্পন্দিত হয়। সেদিনের এই পশ্চিমের হাওয়া রবীন্দ্রসংস্কৃতির দক্ষিণ পবনের আনুকূল্য না পেলেও কালান্তরের সংবাদ বহন ক'রে এনেছিল।

তারপর বাংলা সাহিত্যের হাওয়া বদল হয়েছে একাধিক বার। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে পূর্ব-ইয়োরোপ ও উত্তরপূর্ব-এশিয়ার নবজীবনবাদ যুগান্তরের শিল্পীর প্রাণে সঞ্চার করেছে নতুন প্রেরণা। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যও আপন প্রকৃতি ও প্রবণতা নিয়ে আপন কক্ষপথে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জনসাহিত্য রচনার প্রেরণা তাঁকে কোনদিনই প্রলুব্ধ করেনি। নবজীবনবাদে দীক্ষা নিয়ে জীবনের নতুন মূল্যবোধ রচনার দিকেও তিনি প্রধাবিত হননি। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাধনায়

ভারতীয় সংস্কৃতি যে মহত্তর ও সুন্দরতর জীবনাদর্শের ঐতিহ্য রচনা করেছে তার মধ্যেই তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত মানবতার আশা ও বিশ্বাসের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর সুকর্ষিত কবিমানস সংস্কৃতির অনুশীলনে আস্থাবান। তাই তাঁর কাছে শিল্পচর্যার মধ্যেই জীবনচর্যার সার্থকতা। এবং এই কারণেই তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণে দুটি বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে এই যে, তাঁর সাহিত্যে জীবনশিল্পের চেয়ে বাণীশিল্পের চমৎকারিত্বই অধিক চিত্তাকর্ষক; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিশিষ্ট আঞ্চলিকতা নয়, নির্বিশেষ নাগরিকতাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের উৎকৃষ্ট পরিবেশ।

প্রথম বৈশিষ্ট্যের ফলে পবিবেশনেব রসই তাঁর সাহিত্যের মুখ্য রস। তাঁর একটি গল্পের নায়িকা বিরক্তি-ভরে বক্তাকে বলছে, 'বড্ড বাজে বকা তোমার স্বভাব। এইজন্যই তোমার হাতে গল্প জমে না।' বস্তুত সাহিত্যে কেবল গল্প শোনাব কৌতূহল-ভবা মনের শৈশব যাদের কাটেনি বুদ্ধদেব বসুর লেখা তাদের জন্য নয়। তাঁর গল্পে গাল্পিক উপাদান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এমন কি 'লোমহর্ষক মনস্তত্ত্বের' সন্ধানও সেখানে কদাচিৎ পাওয়া যাবে। তাঁর উপন্যাসের কাব্যধর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালি কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়; কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে বাধিবার জন্য একটু উচ্চ তটভূমি মাত্র।' একথা সর্বক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য না হলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে, বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু কাব্যের স্বাদ ও সুরভি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গল্পগুলি সংলাপপ্রধান এবং রসিক পাঠক সেই বিচিত্র সংলাপের মধ্যেই সাহিত্যপরিবেশনেব রসাস্বাদন করেন। রবীন্দ্রনাথ-বীরবলের পববর্তী যুগে বাংলা গদ্যকে যাঁরা শিল্পসুষমায় সুন্দর করেছেন বুদ্ধদেব তাঁদের অন্যতম। তাঁর পরিচ্ছন্ন গদ্যে শিল্পের সৌন্দর্য ঝলমল ক'রে ওঠে। তাঁর গদ্যের অবিরল প্রবাহে অবগাহন ক'রে মননশীল পাঠক বাক্যরস-চর্বণার আনন্দ অনুভব করে।

তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁকে নাগরিক জীবনের শিল্পী করেছে। রবীন্দ্রনাথের আদি যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্প বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পল্লীনির্ভর। তার মধ্যে শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর, মানিক ও মনোজ বিশেষ ভাবে আঞ্চলিকতার স্রষ্টা। বুদ্ধদেবের সাহিত্যে 'স্থানীয় রং' চোখেই পড়ে না। তাঁর পাত্রপাত্রীরা একটি বিশেষ স্থানে ও কালে বিন্যস্ত সন্দেহ নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব মানুষের বাইরের পরিবেশের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তার মনোলোকের রহস্যোন্মেষের প্রতিই অধিক মনোনিবেশ করছেন। তাছাড়া নাগরিক জীবনেই সর্বজনীনতার ভাবটি সুপরিস্ফুট। বুদ্ধদেবের মনের প্রবণতা সার্বভৌম মানবিকতার দিকেই। ভাবলোকে তিনি যে পাত্রপাত্রীদের সৃষ্টি করেন তারা অনায়াসেই পৃথিবীর নাগরিক হতে পারে, কেবল শিল্পের খাতিরে তাদের বিশেষ স্থানে ও কালে রূপদান ক'রতে হয় বলেই তারা কোনো একটি বিশেষ দেশের বিশেষ শহরের অধিবাসী হয়ে ওঠে।

৩

নাগরিক জীবনের শিল্পী হলেও বুদ্ধদেব নাগরিকতার সর্বাঙ্গীণ জীবনজিজ্ঞাসার দিকে দৃষ্টি দেন নি। নাগরিক সভ্যতার আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুইই আছে। অসংখ্য সমস্যাভাবে জটিল সে-জীবন। কিন্তু বুদ্ধদেব তলিয়ে গেছেন মানুষের মানসলোকে। নরনারীর মন-দেয়া-নেয়ার রহস্যই তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-কথারই নব-নব রূপায়ণ। এক কথায় তাঁকে প্রেমের শিল্পী বলা যেতে পারে। প্রেম কথাটিকে প্রচলিত ও সীমাবদ্ধ অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে নরনারীর দেহ ও হৃদয়-বিনিময়ের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত ক'রেই প্রেমের শিল্পী কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগ ও সুখবাদী নারীপুরুষের সম্পর্ক যেমন বৈচিত্র্য তেমনি জটিলতা নিয়ে মানুষের কাছে দেখা দিয়েছে। সভ্যতার আদিতে যা কেবল

জৈবসৃষ্টির প্রেরণামাত্রই ছিল আধুনিক মানুষের কাছে তার নানা অর্থ, নানা তাৎপর্য। একজন যৌনতত্ত্ববিদ্ মার্কিন ডাক্তার বলেছেন, যেদিন নারীপুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের 'centre of gravity has been shifted from procreation to recreation' সেদিন থেকেই মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে অভূতপূর্ব জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধদেবের সাহিত্যে প্রেমের বিচিত্র গতির শিল্পিত রূপ পরিদৃশ্যমান। কিশোর-কিশোরী-লীলার স্বপ্নকামনা থেকে শুরু ক'রে সুখবাদী মানুষের রতি ও রিরংসার নগ্নচিত্র যেমন তিনি অংকন করেছেন তেমনি বন্দনা করেছেন ত্যাগে ও আত্মনিবেদনে মধুর ও সুন্দর প্রেমের মহিমাকে। কিন্তু তাঁর অন্তর্লোকের নিভৃততম প্রদেশে যে স্বপ্নদেখা সৌন্দর্যপিপাসু কবিসত্তাটি বাস করে, ভোগবাদ তার ধর্ম নয়, সে চিরন্তন রসতীর্থের পথিক, রোমান্টিক ভাববাদের আনন্দলোকেই তার শিল্পসাধনার মন্ত্রদীক্ষা।

বর্তমান সংকলনে গ্রথিত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই এ পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সর্বশেষ গল্পকেই সবাগ্রে গ্রহণ করা যাক। গল্পটির নাম 'আমরা তিনজন'। কিশোর মনের বয়ঃসন্ধির গল্প। প্রেম যখন আত্মরতিতেও পৌঁছয়নি, স্বপ্নরতিতেই মশগুল হয়ে আছে, সংগমতৃষ্ণার চেয়ে আসঙ্গলিপ্সাই যখন বড়, তখনকার চেতনলোকে নারীর প্রথম আবির্ভাবের কাহিনী। বিকাশ, অসিত আর হিতাংশু; ঢাকার পুরানা পল্টনের 'থ্রি মাস্কেটিয়াস', সবেমাত্র স্কুলের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়েছে। মনের সেই বয়সে পদার্পণ করেছে যখন বন্ধ গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড়েই স্বর্গের আভাস বহন ক'রে আনে। যখন অপরিচিত কিশোরীর মুখেই মোনা লিসার রহস্যময় হাসি ভেসে আসে, বেগ্নি-বেগ্নি কালো রঙের চোখে এক-ফোঁটা হিরের মত চোখের মণি চিত্তাকাশে সন্ধ্যাতারার দীপ্তি নিয়ে দেখা দেয়, যখন অনামিকা তরুণীর সান্নিধ্যই আনন্দের অফুরন্ত নির্ঝর হয়ে ওঠে। গল্পটি কিছুই নয়। পাড়ায় নবাগত প্রতিবেশীর কন্যার সঙ্গে পরিচয়, তার সামান্য সান্নিধ্যলাভ, টাইফয়েডে দীর্ঘদিন ধরে তার সেবার

সুযোগ পেয়ে ধন্য হওয়া এবং অবশেষে তার বিবাহ ও প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তার মৃত্যু—এই হল আখ্যানভাগের বিষয়বস্তু। অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক কাহিনী। কিন্তু নবকৈশোরের প্রথম নারীচেতনা নিয়ে অমন আশ্চর্য-সুন্দর গল্প বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। টাইফয়েডে মূর্ছিতপ্রায় মেয়েটির অস্ফুট অস্পষ্ট প্রলাপবচনও কিশোরত্রয়ের মর্মের মণিকোঠায় অপূর্ব সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেবার ফাঁকে ফাঁকে একটু অবসর পেলেই তারা সেই কথা ক'টি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—যেন তিনজন কৃপণ পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে বন্ধঘরে। মণিমুক্তোই বটে। কৈশোরের অম্লান স্বপ্ন পরবর্তী জীবনে মহার্ঘতম সম্পদ হয়ে দেখা দেয়। গল্পশেষে বক্তা বলছে,—'আর আমি,—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশশো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মত, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে একটু সৌরভ।' এই স্বপ্ন, এই সৌরভের পূর্ণমর্যাদা বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যে বর্তমান।

লেখকের প্রথম যুগের লেখা, বর্তমান গ্রন্থের প্রথম গল্প 'রেখাচিত্র'ও এই স্বপ্নের প্রতিই লেখকের পক্ষপাতিত্ব পরিদৃশ্যমান। বাস্তবের কঠোর আঘাতে তরুণ যৌবনের স্বপ্নভঙ্গ হয়, প্রত্যহের কুশাঙ্কুরবিদ্ধ দিনযাত্রায় সংসারের কর্কশতা হৃদয়ের সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে নিঃশেষ ক'রে দেয় ;—এই যদি জীবনের অনিবার্য নিয়তি তাহলে স্বপ্ন স্বপ্নই থাক্, দৈনন্দিন জীবনে তাকে টেনে এনে তার অপমৃত্যু না ঘটানোই শ্রেয়। গল্পটিতে পাশের বাড়ির ননদ-ভ্রাতৃবধূর কুৎসিত কোন্দলের মধ্যে যে কদর্য বাস্তবতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তার বৈসাদৃশ্যে স্বপ্নকামনার সুকুমার আলেখ্যটি আরো রমণীয় আরো হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রেম জীবনে সার্থক হয়ে উঠল না বলে যে-বিচ্ছেদকে এতদিন অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল বাস্তব জীবনের ছবি দেখে তাকেই আশীর্বাদ বলে বিশ্বাস হয়েছে। গল্পের উপসংহারে বক্তা বলছে, 'তোমার যৌবনের একটি

উজ্জ্বল শুভক্ষণ আমাকে দিয়াছিলে, তাহাই আমার যথেষ্ট, তাহাই আমার আজীবনের স্মৃতিমন্থন উপহার।'

বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্পে অনেক ক্ষেত্রেই এই স্মৃতি-সমুদ্রমন্থন করা যৌবনের একটি উজ্জ্বল শুভক্ষণ হলাহল-জর্জরিত জীবনে অমৃতের সন্ধান এনে দিয়েছে। 'দু-একটা স্বর' এবং 'দাম্পত্য আলাপে'ও এই একই সুরের আলাপ। 'দু-একটা স্বর' সাহিত্যিক শিবপ্রসাদ দত্তের বঞ্চিত হৃদয়ের নিঃস্বতায় করুণ। শিবপ্রসাদের জীবনে পঞ্চাশোত্তর যুগ বিপুল খ্যাতি ও সংবর্ধনা বহন ক'রে এনেছে। সম্পাদক, প্রকাশক, নাটক- এবং সিনেমাওলাদের ভিড় তার ঘরে লেগেই আছে। সভাসমিতিতে অভিনন্দন কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে ক্লান্ত। আজ সে সাহিত্য বানায়, সাহিত্যের ব্যবসা করে। কিন্তু তার জীবনে একদিন সত্যকার কাব্য ছিল, কাব্যের প্রেরণাও ছিল। যেদিন সে তার প্রেরণাময়ীর কাছ থেকে পেল প্রত্যাখ্যান সেদিন থেকে তার কাব্যেরও অবসান ঘটল। আজ বাড়িতে-গাড়িতে অভাব কিছুই নেই। অভিনন্দনের মালাচন্দনে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবার উপরে আছে সেবাময়ী স্ত্রী আভার অক্লান্ত যত্ন। কিন্তু তবু হৃদয়ের শূন্যস্থান শূন্যই রয়ে গেছে। খ্যাতি ও বিত্তের প্রাচুর্যে হৃদয়ের শূন্যতা কখনোই পূর্ণ করা যায় না।

'দু-একটা স্বর'-এ স্ত্রীর কণ্ঠ নীরব। কিন্তু 'দাম্পত্য আলাপে' স্ত্রীও গল্পের রসপরিবেশনে সহযোগিনী। প্রাগ্‌বিবাহ যুগের প্রেমিকার স্মৃতি-তর্পণে স্ত্রীও সুরুচিসম্পন্ন রসিকতার সাহায্যে স্বামীর রসোদগারে সহায়তা করেছে। এখানে প্রেমের রূপটি যেমন নয়নাভিরাম শিল্পায়নও তেমনি মধুস্বাদী। প্রেম এখানে একটি আনন্দচেতনামাত্র। 'যেমন ভোরবেলার আধোঘুমের স্বপ্ন, তার আকার নেই, শুধু আকুলতা আছে। সে-ছবি কার কেউ জানে না। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমে পড়ার অবস্থা এটা নয়, এটাকে বলতে পারো প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া।'

কিন্তু এই 'প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া' স্থূল ভোগবিলাসী মানুষের কাছে তাৎপর্যহীন। নিভৃত চেতনার আনন্দ-কণিকা রূপে প্রেমের আস্বাদন সূক্ষ্ম কবিমানসের ধ্যানসাপেক্ষ। সুখবাদী মানুষের মনে সুরত-ক্রীড়ার মধ্যেই প্রেমের পরাগতি। তাদের কাছে প্রেমও একটি পণ্যমাত্র, সম্ভোগের মূল্যেই নারীদেহের মূল্য নিরূপিত। শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ধনতান্ত্রিক নাগরিক জীবনের এই ভোগসর্বস্ব সুখবাদ আধুনিক সভ্যতার একটি চরম অভিশাপ। এই ভোগবাদের অভিশাপ, এই নির্বিবাদ নির্বিচার সুরতপ্রীতির নগ্নচিত্র বুদ্ধদেব উজ্জ্বল বর্ণে অংকন করেছেন। ক্ষোভের বিষয়, এর জন্য সহৃদয় সামাজিকবৃন্দের নিকট যে সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা ত তিনি পানই নি, উপরন্তু এই 'লালসার অসংযম'কে সাহিত্যে শিল্পিত রূপ দেবার অপরাধে তিনি নিন্দিত এবং ভর্ৎসিতই হয়েছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে নাগরিক জীবনে অবাধ প্রেমের চিত্র আঁকতে গিয়ে বুদ্ধদেব সুখবাদী মানুষের কথা বারবারই বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যের ফলশ্রুতি সর্বদাই সুখবাদের বিরুদ্ধে। এদিক দিয়ে উপন্যাসে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে 'যবনিকা পতন'। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থখানি তার উপযুক্ত সমাদর থেকে আজো বঞ্চিত। হয়ত এ-গ্রন্থে বর্ণিত নিষিদ্ধ দেহমিলনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনাই নিম্নরুচির পাঠকের কাছে সবচেয়ে উত্তেজক বলে মনে হবে, কিন্তু যাঁদের মননশীল চিত্তে সাহিত্যের সত্যকার আবেদন ব্যর্থ হয় না তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, অবাধ সম্ভোগবাদের বিরুদ্ধে এ-গ্রন্থ বুদ্ধদেবের বলিষ্ঠতম প্রতিবাদ। আত্মসুখপরায়ণ মানুষের হাতে শুভবুদ্ধির যে অপমৃত্যু এ-গ্রন্থের ট্রাজিক পরিণামকে রূপায়িত ক'রে তুলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই।

বর্তমান সংকলনে 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পে এই নাগরিক প্রণয়-লীলারই রূপায়ণ। হয়ত গল্পটির ভাবপ্রেরণায় ব্রাউনিঙের 'পর-ফিরিয়ার প্রেমিক'• কবিতার প্রভাব বিদ্যমান, কিন্তু 'এমিলিয়ার প্রেম'

প্রেমসম্ভোগের কাব্যমাত্রই নয়, গল্পটি অভিজাত নাগরজীবনের একটি বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র। এ গল্পের নায়ক চিত্রশিল্পী ভাস্কর বারো বছর ইয়োরোপে কাটিয়ে এসেছে; নায়িকা এমিলিয়া কোনো এক দিশি রাজ্যের মন্ত্রিকন্যা, তার জন্ম ইটালিতে। উভয়ের সাক্ষাৎ বিলাসিনী মহানগরীর বিলিতি হোটেলের নাচের আসরে। যেখানে আলো-দিয়ে বোনা সান্ধ্য গাউন হার মানে সাপের মত পেঁচিয়ে-ওঠা স্বপ্নের মত জড়িয়ে-ধরা শাড়ির কাছে। প্রথম সাক্ষাতেই ভাস্কর আর এমিলিয়া হিংস্র আবেগে পরস্পরকে দখল ক'রে বসল। তারপর চলল দিনের পর দিন দেহ-সম্ভোগলীলা। শান্ত সোনালি সুখ আঙুরের মত নিটোল হয়ে ফলে উঠতে লাগল দেহের বৃন্তে। কিন্তু এমিলিয়ার জীবনে ভাস্করই ত প্রথম এবং একমাত্র পুরুষ নয়। পূর্বপ্রণয়ীর সাক্ষাতে ভাস্করের সর্বগ্রাসী বাহুর প্রেমে জাগল ঈর্ষা এবং সন্দেহ। হতভাগিনী এমিলিয়া যখন তার কাছে চরম আত্মনিবেদনের সুখে সুপ্তিনিশ্চেতন তখন 'আস্তে আস্তে, অতি গভীর প্রেমে, ভাস্করের জোরালো আঙুল গভীর হয়ে বসে গেল এমিলিয়ার গলায়।' সে তাকে হত্যা করল। এ গল্পের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু বুদ্ধদেবের অন্যান্য উৎকৃষ্ট রচনার মত এ গল্পও বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টি। তাঁর লেখায় ভিলেনকে চোখে আঙুল দিয়ে ভিলেন বলে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। হিতকথা কখনো শিল্পকথাকে ছাপিয়ে সঙিন উঁচু ক'রে আত্মপ্রকাশ করে না। কিন্তু সহৃদয় পাঠক-চিত্তে বিশুদ্ধ শিল্পের যে আবেদনক্ষেত্র আছে সেখানে এ-জাতীয় সৃষ্টির প্রতিবেদন অব্যর্থ। এমিলিয়ার প্রেম শুধু সার্থক ছোটগল্প হিসেবেই নয়, সুখবাদী মিথুনলীলা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের শিল্পদৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবেও অনবদ্য।

'অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস—আর বুলু' গল্পেও একই প্রণয়লীলার রম্যচিত্র। অতনু মিত্র রোমান্সের রাজহংস। ওর ধারণা হৃদয় জিনিসটা সভ্যমানুষের কুসংস্কার। বলতে গেলে মেয়েদের হাওয়ায় হাওয়ায় ও বড় হয়েছে। নারীসান্নিধ্যের মাখন খাওয়াই অভ্যাস ওর। এক আঁচলের জট ছাড়িয়ে আর এক আঁচলে ছিটকে পড়াই ওর নাগরবৃত্তির

নিয়ম। সাবিত্রী বোস ব্যারিস্টার-দুহিতা, লাভলক প্লেসে ওদের বাড়ি। ওর উপাসকের দল বলে যে, ও বাংলার আগে ইংরিজি শেখে, এবং ইংরিজির চেয়ে ভাল জানে ফ্রেঞ্চ। চালচলনে তার জুড়ি নেই। ভুরু নাচাতে, ঠোঁট বাঁকাতে, কাঁধ ঝাঁকাতে সে বাঙালিনী সমাজে অতুলনীয়া। এই সাবিত্রী বোস অতনুকে কুয়াশার মত ঘিরে রয়েছে। কিন্তু একদিন এই সাবিত্রীরূপিণী কুহেলিকা ভেদ ক'রে অতনুর জীবনে প্রেমের আলো নিয়ে এল পনেরো বছরের একটি কালো মেয়ে— বুলু। অতনুর জগতে সাবিত্রী বোসদেরই ভিড়; বুলু সেখানে অভাবনীয়া। তাই অতনু বলছে, 'সে আমার কাছে এসেছে অপরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে, অভিনবত্বের কৌতূহল নিয়ে। ও অন্য দেশের— এমন কি, অন্য গ্রহের—মানুষ; ওর চালচলন আমি ঠিক বুঝি না। ওর চোখ যে ভাষা বলে, তা কোনোকালে হয়ত জানতাম, কিন্তু অনভ্যাসে ভুলে গেছি।' এখানেই অতনু মিত্রদের ট্র্যাজেডি, মৌন প্রেমের সহজ আত্মনিবেদন এরা গ্রহণ করতে ভুলে গেছে। তাই অতনু মিত্রের জীবনে বুলুর আবির্ভাব মিথ্যা হল, সাবিত্রী বোসের অভিশপ্ত প্রেমালিঙ্গনেই আবার তাকে বাঁধা পড়তে হল। গল্পটির সুনিপুণ শিল্পরূপ চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছে অন্তিম লগ্নে। যেদিন বুলু চলে যাচ্ছে সেদিন অতনু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের মধ্যে বুলু যেন তার কাছে এল। হঠাৎ একটি ফুলের গন্ধ অতনুর স্বপ্নচেতনাকে আবিষ্ট ক'রে দিল। 'ফুলের? না মেয়েলি প্রসাধনের? অথবা ও যেন দেহেরই গন্ধ—দেহেরও নয়, মনের স্ত্রীসত্তার চিরন্তন সৌরভ যেন।' স্বপ্নভঙ্গে মনের খুশিতে অতনু গেল সাবিত্রী বোসের কাছে। আর আশ্চর্য, যে গন্ধকে সে বুলুর দেহসুরভি মনে ক'রে স্বপ্নে পুলকিত হয়ে উঠেছিল, সাবিত্রীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে অতনু জানতে পারল সেটা সাবিত্রীরই নতুন প্রসাধনের সৌরভ। অতনু মিত্রের জগতে, এমন কি তার স্বপ্নকামনায়ও, বুলু নয়, সাবিত্রী বোসই যে সত্য—এই প্রতিপাদ্যকে একটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলে লেখক এ গল্পে কাব্যের সৌরভ সঞ্চার করেছেন।

শুধু উপাস্তিক কাব্যের ব্যঞ্জনাই নয়, একটা পুরোপুরি গল্পই যে কাব্যের উপাদানে গড়ে তোলা যায় তারও প্রমাণ রয়েছে 'রোদ' গল্পটিতে। এখানে গল্প বলতে কিছু নেই, একটা অনুভূতিমাত্র। পরিণত জীবনে বাল্যকৈশোরের বেপরোয়া জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়া; গুরুজনের শাসন, স্বাস্থ্যের নিয়ম-না-মানা উদ্দামতাকে আস্বাদন করবার হঠাৎ-ফিরে-পাওয়া আবেগ এবং তার প্রতিক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই এ গল্পে ভাষা পেয়েছে। অনুত্তীর্ণ কৈশোরে ঝড়ে জলে রোদে হাওয়ায় বাইরের আকাশ পৃথিবী আলো বাতাসের সঙ্গে মিশে যে দুর্নিবার জীবনাবেগ, তাকে হারাতে হয় বলে অনুশোচনা করছে গল্পের নায়ক সুরথ। ক্ষোভের সঙ্গে বলছে, 'জীবনে উন্নতি বলতে যা বোঝায় তা এমনি তুচ্ছ। আমরা ছোটো বাড়ি থেকে বড় বাড়িতে যাই, বছরে ছ-খানার বদলে চব্বিশখানা ধুতি কিনি, অপত্যেরা বড় হয়, স্ত্রীরা মোটা হন আর কিছু হয় না। সুর বাজে না, মন বুজে গেছে, শুধু চলতে চলতে হঠাৎ কখনো মীড় দেয়—কোন্ সুর মনে পড়ে না, করেকার মনে পড়ে না—বুঝি না তাকে কখন হারালাম, কোথায় ফেলে এলাম।' একদিন সকালবেলার ঘাসের গন্ধে শৈশবের পরিচিত পরিবেশে সুরথ হঠাৎ এই হারানো সুরকে খুঁজে পেল। মনে হল, সমস্ত পৃথিবী তাকে বাইরে ডাকছে। আকাশের তলায়, হাওয়ার ঝাপটায়, ঘাসের গন্ধে, মেঘের রঙে। বেরিয়ে পড়ল সে। ফেরবার সময় দুপুরবেলার রোদ মাঠের বুকে আগুন ছড়াচ্ছে। পিচ গলছে পায়ের তলায়, সারা গায়ে পিন ফুটছে, নোংরা ঘাম ঠোঁটের উপর নোন্তা, চোখের ভিতর ঝাপসা, মেরুদণ্ডে পোকার মত কিলবিলে।···অসম্ভব! মানুষ ইচ্ছা করলেই তার নিয়মশৃঙ্খলিত পরিণত জীবনে শৈশবের দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

এ গল্প মনস্তত্ত্বপ্রধান, কিন্তু সে মনস্তত্ত্ব কবি-প্রতীতি-সম্মত। আর এই হচ্ছে বুদ্ধদেবের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের সামান্য-লক্ষণ।

'একা' গল্পেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। 'অভিনয় নয়' গল্পের বক্তা বলেছিল, 'আমাদের মধ্যে যে ape's blood আছে, তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়েই আমার গল্প।' ফ্রয়েডীয় মনঃ-সমীক্ষণ-বাদে এই উক্তির স্বীকৃতি রয়েছে। মানুষের মনের স্বপ্ন আর দেহের দাবি, তার মানবসত্তা আর জৈবসত্তার ঘাত-প্রতিঘাতেই তার চেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের দরিদ্র কেরানি; মাসিক চল্লিশ টাকার ভরসায় সংসার করার বাসনা আজো বাস্তবে পরিণত হয়নি। জীবনের পথে সে সম্পূর্ণ একা। দরিদ্রের মনোরথ সুখের ঘর রচনার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লালন ক'রে চলেছে। ভাবী বধূর যে নামটি কল্পনা ক'রে রেখেছে তাই অনুক্ষণ দমিত বাসনালোকে গুঞ্জরণ ক'রে ফেরে। এই মানুষটির জীবনে তার চেতন-সত্তার অজ্ঞাতসারে দেহের দাবি একদিন তাকে বিভ্রান্ত করল। 'গেল সে এগিয়ে, কাছে, আরো কাছে, তার আনন্দের দিকে, স্বপ্নের দিকে, সব স্বপ্নের সার্থকতার দিকে—তারপর যখন একেবারেই কাছে, যখন মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুলে তাকে ইশারা করল পিছনে আসতে, আর ঐ শরীর থেকেই ছুটে-আসা অদ্ভুত একটা পচা ফুলের মত মিষ্টি গন্ধ তাকে আঘাত করল, তখন আর সহ্য হলো না তার—ঐ মধুরতার তীব্রতাতেই যেন নাক্কার উঠল বুক ঠেলে, অসুস্থ লাগল, কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে, মরে যাওয়ার মত মনে হল তার নিজেকে।' এই অপমৃত্যু থেকে সে উর্ধ্বশ্বাসে এল পালিয়ে। ফিরে এল তার মনের সেই মেয়েটির ধ্যানে যে স্নান ক'রে তাঁতের শাড়ি পরে, কপালে দেয় সিঁদুরের টিপ। এ গল্পে আধুনিক মনঃসমীক্ষণ কবিসম্মত ভাষা পেয়েছে। বুদ্ধদেবের গল্প শিল্পকর্মে প্রতিষ্ঠা হয়েছে কাব্য-সৌন্দর্যের।

৬

কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি যুগের সাহিত্য সম্পর্কে সেদিন কবিগুরুর দুটি আপত্তি ছিল—একটি এর লালসার অসংযম, অন্যটি দারিদ্র্যের আস্ফালন। বুদ্ধদেবের সাহিত্যে সেদিনকার এই প্রথম

দুর্লক্ষণের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কবিগুরুর ভাষায় যাকে দারিদ্র্যের আস্ফালন বলা হয়েছে বুদ্ধদেবের সাহিত্যে তার প্রাদুর্ভাব কোনো যুগেই ঘটে নি। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর কবিমানসে যে চলোর্মিমালার সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'সুখের ঘর' আর 'হতাশা' গল্পে। 'সুখের ঘরে' দরিদ্র মানুষের 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি।' এ গল্পের চতুর্থ দৃশ্যে অজাত মানুষের স্বপ্নে ভাবী জাতকের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান বলছেন, 'তোমার মা-বাবা তোমাকে ঘৃণা করবে—সেইজন্য। অন্যেরা তোমাকে মাড়িয়ে যাবে পায়ের তলায়—সেইজন্য। চুরি শিখবে, নেশা ধরবে, খেতে পাবে না—সেইজন্য। রোগে ধুঁকবে, অনুতাপে পুড়বে, ধিক্কার দেবে জীবনকে, আবার মৃত্যুর ভয়ে তিলে-তিলে মরবে—সেই জন্য।' দারিদ্র্য-অভিশপ্ত পৃথিবীতে সেই জন্যই জন্ম হবে ভাবী জাতকের। বাস্তব-কল্পনার টানা-পোড়েনে এ গল্পের বুনোনি; গল্প-নাটক-কাব্যের মিশ্র-শিল্পে। কিন্তু একে আর যাই বলা যাক, দারিদ্র্যের আস্ফালন কিছুতেই বলা যাবে না।

মধ্যবিত্ত জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে বেকার সমস্যা। 'হতাশা' গল্পে বেকার-সমস্যার তত্ত্বকথা নয়, একটি বেকার যুবকের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৃদ্ধ পিতার দুর্ভাবনা আর তরুণী পত্নীর আশা ও বিশ্বাস; তারই মধ্যে নিজের ইজ্জৎ ও সম্ভ্রম বজায় রেখে নিখুঁত অভিনয় ক'রে চলেছে অনুপম। শুধু অন্যের কাছে নিজের মুখ রক্ষার চেষ্টাই নয়, চরম হতাশার মুহূর্তেও কিছুতেই ভেঙে না পড়ার উপাদানে গড়ে ওঠা এই বেকার যুবকের যে চরিত্র-রূপ গল্পটিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বুদ্ধদেব গর্ব বোধ করতে পারেন। অতি-পরিচিত মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব ঘরোয়া পরিবেশে ছলনা-চাতুরী-ভরা এই চরিত্রটি আমাদের চির-পরিচিত হয়েও চিরন্তন বিস্ময়ের আলম্বন হয়ে রইল।

বুদ্ধদেবের কবিমানসকে রোমান্টিক ভাববাদের আলোকে পরিচিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছি। আত্মধ্বংসের পথে আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে যে অবক্ষয়ের লক্ষণ সর্বদিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে স্বভাবতই তাঁর ভাববাদী শিল্পচেতনায় তার তরঙ্গ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এককালে বুদ্ধদেব শিক্ষকতা-বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতির বুনিয়াদ যেখানে রচিত হয় তার কেন্দ্রপীঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব তার অধোগমনের শোচনীয়তম রূপ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন আমাদের শিক্ষায়তনগুলি কি ভাবে ধীরে ধীরে মিথ্যার, প্রবঞ্চনার, ইতরতার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। আদর্শভ্রষ্ট শিক্ষা ও শিক্ষকজীবনে বিদ্যার নামে চলেছে ব্যবসা, শিক্ষার ছলে দুর্নীতি। 'মাস্টার মশাই' গল্পে বুদ্ধদেব বাংলার সাম্প্রতিক কলেজীয় শিক্ষার ফাঁকি ও প্রবঞ্চনাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। শিক্ষাতীর্থের আদর্শ-বিকৃতির কদর্যরূপ নিঃশেষে নিরাবরিত হয়েছে এ কাহিনীতে। শিল্পায়নের দিক দিয়ে হয়ত বুদ্ধদেবের স্বভাবজাত সূক্ষ্মতার স্পর্শ পায়নি গল্পটি, হয়ত বাস্তবের স্থূলহস্তাবলেপে শিল্পীর সংযম-সৌন্দর্যের আদর্শ সর্বদা রক্ষিত হয় নি, কিন্তু সমস্ত গল্পটিতে ভাববাদী বুদ্ধদেবেরই আত্মপ্রকাশ সার্থক পূর্ণতা পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রের চরম অবনতির মধ্যেই আদর্শ শিক্ষাব্রতী, পরাজিত সতীশংকরের অপরাজেয় মহিমা গল্পটিকে ভাবলোকের অম্লান ও অনির্বাণ দীপ্তিদান করেছে। শিল্পজীবনের এই পর্যায়ে এসে বুদ্ধদেবেরও জীবনচেতনা বাস্তবস্পর্শকাতর স্বপ্নলোকের ভাববিহার থেকে নেমে এসে বস্তুসংঘাতবিজয়ী আদর্শেরই ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে মহত্তর সৃষ্টি-সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে এনেছে।

বঙ্গবাসী কলেজ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

জগদীশ ভট্টাচার্য

রেখাচিত্র

পাশের বাড়িতে এইমাত্র একটা কুরুক্ষেত্র সংঘটিত হইয়া গেল। ব্যাপার কিছুই নয়;—রমেশবাবুর ভগ্নী সপুত্রকন্যা কিছুকাল ভ্রাতৃগৃহে কাটাইতে আসিয়াছেন; আজ কোনো কারণে সকালে চায়ের সময়েই সমস্তটা দুধ খরচ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার পুত্রের জন্য কিছু অবশিষ্ট ছিল না; ছেলেটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করিতেছে। সেই উপলক্ষ্যে রমেশবাবুর ভগ্নী ভ্রাতৃবধূর অনবধানতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কী-একটা কথা বলিয়াছিলেন:—রমেশবাবুর স্ত্রীর তাহা সহ্য হয় নাই—হইবার কথাও নহে—তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে অত গরজ থাকে তো ছেলের জন্য আলাদা দুধ—ইত্যাদি।

আরম্ভ ঐখানেই। কিন্তু উভয় মহিলা ঘণ্টাধিককাল আকাশ-বিদারণ চীৎকার করিয়া আমাদের—অর্থাৎ নিকটতম প্রতিবেশীদের কাছে ইহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িলেন যে রমেশবাবুর স্ত্রীর মন অত্যন্ত ছোটো, গৃহলক্ষ্মীর আদর্শানুযায়ী আতিথেয়তার অভাব তাঁহার ঘোরতর;—এবং বমেশবাবুর ভগ্নী অত্যন্ত কুটিল ও স্বার্থপর; যদিও তাঁহার স্বামী সম্প্রতি ডেপুটিত্বে প্রোমোশন পাইয়াছেন, তথাপি ভ্রাতৃগৃহের যাবতীয় বিত্ত নানান ছলে "লুটিয়া খাইতে" তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই, বরং আগ্রহ অত্যধিক।

প্রসঙ্গক্রমে আরো যে-সব কথা উঠিল, তাহা এখানে বলা যায় না।

শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ফেলিয়া এই বাক্‌বিতণ্ডার প্রতি কর্ণ এবং মনঃসংযোগ করিতেই হইল।

এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা হইয়াছে। রমেশবাবুর ভগ্নী আর এক মুহূর্ত ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান করিবেন না (তাঁহার স্বামী কি রোজগার করেন না?

তাঁহার পুত্র কি বন্যাজলে ভাসিয়া আসিয়াছে?), এই শপথ উচ্চারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে-করিতে অত্যধিক শব্দসহকারে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বোধহয় এতক্ষণে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন -- তারপর বোধহয় শ্রান্তিবশতই অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বরে আত্মঘোষণা করিতে পারিতেছেন না—আর রমেশবাবুর পত্নী, "দেমাকে" চরণ যাহাদের ভূমিস্পর্শ করে না, সেই প্রকার স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে মন্তব্য করিতে-করিতে রান্নাঘরে মাছের ঝোল চড়াইয়াছেন—ছ্যাকছ্যাক শব্দে তাঁহার অর্ধোচ্চারিত বাণীসমূহ আমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

বেচারা রমেশবাবু ন'টার সময় নাকে-মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া সারাদিনের মতো আপিসে পাল ন; আজ বোধহয় মাছের ঝোলটাও গলাধঃকরণের উপযোগী হইবে না।

দুর্ভাগ্য।

আবার রবীন্দ্র-কাব্যের পত্রোন্মোচন করিলাম, কিন্তু মন আর বসিল না। ঘন-ঘন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেছি। আকাশ তাহার অম্লান নীল হাসিখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে; স্ত্রীকণ্ঠের এ হেন নির্ঘোষেও সেই প্রশান্তির বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে নাই। অদূরে অশ্বত্থ গাছটার পল্লবপুঞ্জে সকালের রৌদ্র লুটাইতেছে, ঝিরিঝিরি হাওয়ায় তাহার আলোকিত কম্পনের বিরাম নাই। মোড়ের ল্যাম্প-পোস্টের মাথায় একটা ছোটো পাখি এতক্ষণ নিরুদ্বেগে বসিয়াছিল—এইমাত্র ঘোড়ার গাড়ির চাবুকের শব্দে ত্রস্ত হইয়া বাতাসে ডুব-সাঁতার দিয়া চক্ষের নিমেষে কোথায় যে উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না।

মেয়ে-স্কুলের গাড়ি আসিয়া থামিল; বুড়ি-ঝির আহ্বান শুনিয়া রমেশবাবুর দুই কন্যা বাহিরে আসিল, হাতে বই, খাতা, এবং খালি-হওয়া সাবানের বাক্সে স্কুলের মেয়েদের যাবতীয় সম্পত্তি;—একজনের হলদে রঙের ফ্রকটা রৌদ্রে যেন মিশিয়া গিয়াছে। হাসিতে-হাসিতে দুই বোন গাড়িতে গিয়া উঠিল।

ঐ মেয়ে দুটির হাসি, এই গভীব নীল আকাশ, আর অশ্বত্থের পত্রলিপ্ত আলোকচ্ছটা—এই সব মিলিয়া মিশিয়া আমার মনে অকস্মাৎ মোহ বিস্তার কবিল—চোখের পলকে রমেশবাবুর স্ত্রী এবং ভগিনীব চিহ্নমাত্র স্মৃতি আব রহিল না।

*　　　*　　　*

গতবাত্রে শুইতে-শুইতে দুইটা বাজিযা গিযাছিল, তবু ভোর হওযামাত্র তুমি আসিযা যেই আমার মাথাব উপব আস্তে তোমার হাতখানি বাখিলে, অমনি আমি জাগিযা উঠিলাম।

শুনিলাম তুমি বলিতেছ, "এখনো ঘুম থেকে কেউ ওঠেনি, চলো না এই ফাঁকে একটু বেডিযে আসি।"

অসম্পূর্ণ নিদ্রাব শৈথিল্য মুহূর্তে ঝাড়িয়া ফেলিযা উঠিলাম। আশ্বিনেব ভোবেব হাওযায শেফালি-শাখাব মতো ঈষৎ শিহবিয়া তুমি বলিলে, "একটু শীত – না?"

তাবপব আমাব কোনো উত্তবেব অপেক্ষা না বাখিযাই আমাব চাদবটা তিন ভাঁজ কবিযা গাযে জডাইযা নিলে।

আজ মনে হইতেছে, সেদিন আমাব চোখে তোমাকে সুন্দব লাগিযাছিল। সদ্যনিদ্রোত্থিতা তোমাব মুখে যে-লাবণ্য তখন ফুটিযাছিল, তাহা তোমাব মুখেও কম দেখিযাছি। উষাসঙ্গমে পূর্ণিমাব চাঁদেব মুখেব সবশেষ হাসিটুকু যেমন ক্ষণিক, তেমনি ক্ষণিক, হযতো তেমনি অলীক সেই সৌন্দর্য, যাহা তোমাব মুখে, ঠোঁটে, চোখেব পাতায সেদিন দেখিযাছিলাম। দিনেব আলোয তাহা ম্লান হইযা যায মানুষেব জাগ্রত কণ্ঠস্বব তাহাকে মুছিযা ফেলে। দেবতাব ভাষা যদি জানিতাম, তাহা হইলে সেদিন তোমাকে জানাইতে পাবিতাম আমাব চোখে এই শুভ্র আশ্বিনেব একটি প্রভাতে কত যে সুন্দব তোমাকে লাগিল।

বাহিবে আসামাত্র বাতাসে এমন একটি মদিব গন্ধ পাইলাম, যাহাতে এক মুহূর্তে আমাদেব তন্দ্রার জডিমা নিঃশেষে কাটিয়া গেল। সে গন্ধ শেফালিব না শিশিবেব, তৃণগুচ্ছেব না পথধূলিব, তাহা

সেদিনও নির্ণয় করিতে পারি নাই, আজও ঠিক মনে করিতে পারি না। কে জানে, হয়তো তোমার এবং আমার জীবনে ঐ একটি প্রভাত পাঠাইবেন বলিয়া বিধাতা আকাশের গায়ে তাঁহারই আনন্দের সৌরভ মাখাইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। সেই সৌগন্ধ্য নিশ্বাসে গ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা যেন সত্য-সত্যই জাগিয়া উঠিলাম। জাগরণক্লান্ত রজনীর পরে প্রভাত যে-আলস্য নিয়া আসে, আমাদের দেহ-মন হইতে মুহূর্তমধ্যে তাহা খসিয়া পড়িল। পূর্বাঞ্চলে আকাশের স্ফটিকপাত্র যেমন আরক্তিম আলোকের মদিরায় ভরিয়া-ভরিয়া উঠিতেছিল, আমাদের দেহ-মনের সকল অভাব, সমস্ত শূন্যতা তেমনি যেন প্রাণের জোয়ারে উপপ্লাবিত হইতেছে। আমি যে বাঁচিয়া আছি অত বড়ো একটা আকাশের নিচে দাঁড়াইয়া যে নিশ্বাস নিতে পারিতেছি, চলিবার সময় আমার পায়ের তলা হইতে যে মাটি সরিয়া যাইতেছে না, ইহারই জন্য বিস্মিত কৃতজ্ঞতার আমার যেন অন্ত ছিল না সেদিন। মনে হইয়াছিল, এই প্রথম বাঁচিলাম ; এবং এও সত্য যে বাঁচা মানে যে কতখানি বাঁচা তাহা তেমন করিয়া আর কখনো অনুভব করি নাই।

তুমি বলিলে, 'চলো যমনার দিকে।'

সারাটা পথ যে কী কথাবার্তা হইয়াছিল, আজ তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। সেই সকালবেলাটিতে কথা কহিবার কতটুকুই বা প্রয়োজন ছিল! তুমি হয়তো বলিয়াছিলে, 'বাঃ, সুন্দর কুকুরটা।' কিংবা 'এ-বাড়িটায় কে থাকে, জানো?' কিংবা, 'চলো ঐ বাগানে কিছু ফুল চুরি করা যাক।' এমনও হইতে পারে যে চলিতে-চলিতে হঠাৎ এক সময় তুমি বলিয়া উঠিয়াছিলে, 'আজ মঙ্গলবার।' তারপরেই যদি তুমি বলিয়া বসিতে যে দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়, তাহা হইলেও আমি একটুও বিস্মিত হইতাম না।

পাশাপাশি চলিতেছিলাম ; আমার আঙুলে মাঝে-মাঝে তোমার আঙুলের স্পর্শ ;—আর তোমার মুখ দেখিবার জন্য যখনই দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, তুমিও আমার মুখের উপর তোমার

দৃষ্টি আনিয়া রাখিয়াছ। দু-জনেই হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছি—তার পরক্ষণেই তুমি হয়তো বলিয়াছ 'এবার ফেরা যাক।'

এই কথা লেখার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হইল, তোমার কণ্ঠস্বর যেন শুনিতে পাইলাম এই মুহূর্তে যেন তুমি আমার কাছে আসিয়া কিছু বলিলে। সেইদিন তোমার যে-কথাগুলি ভোরের বাতাসে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া মিশিয়া গিয়াছিল আজিকার বাতাসেও যেন সেই ধ্বনির তরঙ্গ উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

কিন্তু সেদিন কি ঐ-সব ছাড়া আর-কিছুই আমাদের বলার ছিল না? অথচ, আশ্চর্য এই, কোনো অতৃপ্তিও ছিল না আমাদের মনে, ঐসব তুচ্ছ কথাতেই আমরা পরিপূর্ণ ছিলাম। চলার সুখকর পরিশ্রমে তোমার মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, শীতল বাতাস উষ্ণ হইয়া উঠিল, আকাশের পাশে যেন তরল সোনায় ফাটিয়া পড়িতেছে, ঘাসের মাথায় রুপালি শিশির শুকাইয়া আসিল। 'নাঃ!'—হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়া গায়ের চাদর খুলিয়া আমার হাতে দিলে, তোমার কালো চুলে যে দূর একরাশি সোনার ফুল ফেলিয়া দিয়া গেল; তোমার চোখের স্বচ্ছ কালো আয়নায় আকাশের আলো প্রতিফলিত দেখিলাম। মনে হইল পৃথিবীর আর আমার এই মিলিত মুহূর্তটির তুলনা নাই, মনে হইল এক নিশ্বাসে জন্ম-জন্মান্তরের জীবন আমরা একই সঙ্গে পান করিলাম।

তারপর ফিরিবার মুখে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে দেখা। মঞ্জুশ্রী যে-সে মেয়ে নয়, তার বাবা শহরের একজন বড়ো ডাক্তার (মোটরগাড়ি আছে)—তদুপরি রূপের জন্য খ্যাতি আছে তাহার। তোমাকে কোথায় কবে আধ ঘণ্টার জন্য দেখিয়াছিল, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে বন্ধুতা নাকি অত্যল্প সময়েই গাঢ় হয়, তাই তোমার সঙ্গে কিয়ৎকাল আলাপ করিবার এই সুযোগ সে হারাইল না। আমি সমরস্ক পরমহংস অপেক্ষাও গভীরতর ঔদাসীন্য দেখাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী আমার পৃষ্ঠদেশের প্রতি কয়েকটা কটাক্ষপাত করিতেছেন সন্দেহ হইল, কিন্তু সন্দেহভঞ্জনের জন্য মুখ ফিরাইয়া তাকাইলাম না।

পরে তুমিই হাসিতে-হাসিতে বলিলে, 'ও নিশ্চয়ই ঢের বিষ ছড়াবে।'

'অর্থাৎ কেলেঙ্কারি রটাবে? রটাক—কথায় তো আর ফোস্কা পড়ে না।'

'আর যদি কেলেঙ্কারি কিছু হ'য়েই যায়, তাহ'লে তো ভয়ই থাকলো না। তুমি আমি দূরে কোথাও চ'লে যাই না চলো—এডেন কি এডিনবরা যেখানেই হোক! পারবে না আমায় নিয়ে যেতে?'

'এখনই চলো না—এক্ষুনি কোথাও চ'লে যাই—বাড়ি আর না-ই ফিরলাম।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরমুখে তুমি উত্তর দিলে, 'না, সে হয় না—এখন টাকা নেই। কিন্তু মঞ্জুশ্রী কী বললে, জানো?'

মঞ্জুশ্রীর কাহিনী বলিতে-বলিতে হাসির তরঙ্গে তোমার সারা শরীর আন্দোলিত হইল, মুখে আঁচল গুঁজিয়া সেই হাস্যরোধ করিবার সেকী নিস্ফল চেষ্টা! হাসি জিনিশটা ব্যাধির চেয়েও সংক্রামক: মঞ্জুশ্রীর কোনো বচনে বা আচরণে এমন কোনো বিসদৃশতা নিশ্চয়ই ছিল না, যাহার কারণে হাসি এমন দুর্বার হইয়া উঠিতে পারে—কিন্তু তবু পরাস্ত বিপক্ষের মতো আমিও হাসিতে-হাসিতে পথের মধ্যেই একবার বসিয়া পড়িলাম।

হাওয়ার গায়ে হাসির শিলা ছুঁড়িতে-ছুঁড়িতে তুমি ঘরে গিয়া ঢুকিলে, হাসিতে-হাসিতে তোমার পিছনে আমি ঢুকিলাম। সবাই জিজ্ঞাসা করিল, 'কী রে, অত হাসির কী হ'লো?' তুমি বলিলে, 'পথে দেখলাম এক ভদ্রলোক হিমের ভয়ে ছাতা মাথায় চলেছেন।'

ঘরে সশব্দে স্টোভ জ্বলিতেছে; টোস্ট রুটির গন্ধে যত রাজ্যের ক্ষুধা যেন দাউ-দাউ করিয়া জঠরে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুধা জিনিশটা যে কত উপাদেয় এবং তাহার নিবৃত্তি যে কত তৃপ্তিকর তাহা সেদিন আমরা যেমন বুঝিয়াছিলাম, তেমন আর কে কবে বুঝিয়াছে!

সেদিন ভাবিয়াছিলাম, প্রভাতের আকাশে এমন-কী মোহ আছে, যাহা সমস্ত জীবনটাকে চক্ষের পলকে আস্বাদে সৌরভে মাধুর্যে আনন্দে

এতখানি ভরিয়া তুলিতে পারে! কিন্তু আজ মনে হইতেছে যে সেই একটি উজ্জ্বল সকালবেলায় যৌবনের দেবতা কখন অলক্ষিতে আমাদের ললাটে তাঁহার কল্যাণস্পর্শ রাখিয়াছিলেন; তেমন মুহূর্ত জীবনে আর আসিবে না।

* * *

আজ আবার আশ্বিন আসিয়াছে। আকাশের নীলিমা সূর্যকিরণে সেদিনের মতোই প্লাবিত হইল, শেফালি-গন্ধে বাতাস তেমনি উতলা হইয়া ফিরিতেছে। কিন্তু যৌবনের দেবতা আজ বিদায় লইয়াছেন।

আর তুমি?

আজ ঠিক এই মুহূর্তে তুমি কী করিতেছ, আমি মোটামুটি এখানে বসিয়াই তাহার বিবরণ দিতে পারি:—সেই তুমি, যে আমাকে বলিয়াছিলে যে এডেন কিংবা এডিনবরায়···

হঠাৎ শুনিলাম রাস্তায় আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি, রমেশবাবু। তাঁহার শার্টের উপর টাই লাগানো, পরনে ধুতি, পায়ে মোজা এবং চটিজুতা। ভদ্রলোক একেবারে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'শিগগির আসুন একবার, আমার বো—'

আর বলিতে হইল না আমি তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিলাম। মনে-মনে জল্পনা করিলাম, আফিং, না দড়ি? যদি আফিং হয়···

কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ব্যাপার তেমন গুরুতর নহে। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাবশত ভদ্রমহিলা মূর্চ্ছা গিয়াছেন মাত্র—হয়তো তাঁহার হিস্টিরিয়াও আছে। দাঁতে দাঁত লাগিয়া মুখ দিয়া ফেনা গড়াইতেছে এই দৃশ্য দেখিয়া রমেশবাবু—আমি একটু আগে যাহা ভাবিতেছিলাম, সেই-রকমই কিছু একটা ভাবিয়া আপিসের বেশ অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, 'আপনি অস্থির হবেন না—

বিশেষ কিছু হয়নি। চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতে বলুন, আর পাখা নিয়ে হাওয়া করুক কেউ—তাহ'লেই ফিট সেরে যাবে।'

'এই মণ্টু—যা তো, তোর মা-কে বল গে জল আর পাখা নিয়ে—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী?—যা না শিগগির।' বলিয়া রমেশবাবু পুত্রের পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত করিলেন।

মণ্টু কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেল। রমেশবাবু কাতর নয়নে একবার তাঁর ভগ্নীর একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বলবেন না মশাই—এই দজ্জাল—'

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম 'আপনার আপিসের বেলা হ'লো, রমেশবাবু।'

'আর আপিস! ঘরে যার এত অশান্তি'

এই সময়ে রমেশবাবুর স্ত্রী নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া জল পাখা ইত্যাদি লইয়া ঘরে ঢুকলেন এবং তাঁহার পরিচর্যায় রমেশবাবুর ভগ্নী অল্পক্ষণ পরেই চোখ মেলিয়া ঘরে অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া গেলেন।

আমি বিদায় নিয়া বলিলাম, 'এখন আপনি নিশ্চিন্তে আপিস যেতে পারেন রমেশবাবু, উনি সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন।'

'তাহ'লে—আর তো মরা গেলাম না—তা'লে মশাল কোনো না। আমি তাহ'লে আপিসে—' বলিতে-বলিতে রমেশবাবু তখনই রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় সেই মণ্টুই প্রহারের কষ্ট ভুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল—'বাবা, তুমি প্যাৎলুন পরলে না?'

'অ্যাঁ! প্যাৎলুন? তাই তো—ছি-ছি!'

রমেশবাবু আমার দিকে আর না-তাকাইয়া বেশভূষা সমাপন করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। আমি বাড়ি ফিরিয়া বাঁচিলাম।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে রমেশবাবুর স্ত্রী—সম্ভবত—সুন্দরী। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চকিতে একবার তাঁহার মুখখানা আমার চোখে পড়িয়াছিল। আর রমেশবাবুর ভগিনী যখন একবার মাত্র চক্ষু-রুন্মীলন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন সেই

ক্ষণিক দৃষ্টি তোমার চোখ দুইটির কথাই আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। ইহাদের মতো তুমিও কি একজন নারী নও? আজ সকালবেলাটায় যে-দুই নারীকে অবলম্বন করিয়া এই বিভ্রাট ঘটিয়া গেল—কে জানে?—তাহাদের জীবনেও হয়তো একদিন যৌবনের অমৃতপরশ লাগিয়াছিল—আট, দশ, বারো কিংবা পনেরো বছর আগে, অন্য দুটি তন্বী চঞ্চল তরুণী হয়তো একদিন দুর্নিবার হাস্যোচ্ছ্বাসে কোনো-এক প্রভাতকালে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তোমার মতোই।

আজ থেকে পাঁচ, সাত, দশ কিংবা বারো বছর পরের তোমাকে কল্পনা করিতেছি। তোমার কণ্ঠে আর অফুরন্ত আনন্দ ঝরে না, সংসারের কর্কশতায় তাহার অবসান ঘটিয়াছে। সেই শুভ্র সকাল-বেলাটি তোমার মনে কোনো চিহ্ন রাখে নাই: মঞ্জুশ্রীকে ঠাট্টা করিতে তুমি ভুলিয়া গিয়াছ: এখন পৃথিবীর যাবতীয় মঞ্জুশ্রীদের সন্তোষবিধানই তোমার দৈনন্দিন কর্তব্য। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে-ব্যক্তি তোমার চীৎকারে উত্যক্ত হইয়া ধুতির সঙ্গে টাই পরিয়াই আপিসের দিকে ছুটিবে, সে-ব্যক্তি আমি নই। তোমার যৌবনের একটি উজ্জ্বল শুভক্ষণ আমাকে দিয়াছিলে, তাহাই আমার যথেষ্ট, তাহাই আমার আজীবনের স্মৃতিমন্থন উপহার।

আবার আমার মন বাহিরের আকাশের মতোই নির্মল হইয়া উঠিল; যে-বিচ্ছেদকে অভিশাপ বলিয়া এতদিন জানিয়াছি, আজ তাহাকেই আশীর্বাদরূপে বরণ করিয়া লইলাম।

অভিনয় নয়

—কথাটা অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন ব'লেই তোমরা আজকাল মানতে চাও না, কেননা সেকালের অতি-আধুনিক ওয়াইল্ডকে উপহাস করাই একালের আধুনিকতার রীতি। কিন্তু সত্যি যে জীবনের চেয়ে আর্ট অনেক বড়ো, এ-বিষয়ে আমার অন্তত সন্দেহ নেই, কোনো সত্যিকার বুদ্ধিমান লোকেরই থাকা উচিত না।

আমি বললাম নিজেকে সত্যিকার বুদ্ধিমান কল্পনা ক'রে উৎফুল্ল হ'তে পারো, প্রতুল, কিন্তু তুমি ছাড়াও পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষ আছে, এবং তারা সবাই তোমার সঙ্গে একমত হবেই তার মানে নেই। কাযাকে ছেড়ে কিনা ছায়াকে—।

প্রতুল বাঁকা হেসে বললো, সে-কথাই যদি বলো, তবে তো সমস্ত সৃষ্টিটাকেই মায়া ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায়—বিধাতার ব্রহ্মাণ্ড থেকে শুরু ক'রে মানুষের সৃষ্টি আর্ট পর্যন্ত।

বিজন অসহিষ্ণু হ'য়ে বললো, আহা—সে-কথা হচ্ছে না।

এইবার প্রতুল পিঠ খাড়া ক'রে বসলো। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দু-জন এক দীর্ঘ বক্তৃতার জন্য তৈরি হলাম। বাক্‌যুদ্ধে প্রতুলের পটুতা ওয়াইল্ডের নায়কদেরই মতো।

—আর্ট যে জীবনের চেয়ে বড়ো, এর প্রমাণস্বরূপ ওয়াইল্ড যে-সব যুক্তিতর্কের প্রয়োগ করেছেন সে-সব তোমরা ভালোই জানো। বাহুল্যভয়ে পুনরাবৃত্তি করলাম না। আমি শুধু কয়েকটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হবো। 'হ্বের্টের' বুকে ক'রে যারা আত্মহত্যা করেছিলো তাদের প্রেত আমার সাক্ষী। উনিশ শতকে বায়রনিজম একটা ব্যাধির মতোই ইওরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—এবং সে-জন্য ডন জুয়ান স্বয়ং ততটা দায়ী নন, যতটা 'ডন জুয়ান' কাব্য। বায়রনকে

চর্মচক্ষে ক-জনই বা দেখতে পেয়েছে! কিন্তু তাঁর কাব্যে তিনি জীবনের যে-সহজ অথচ কৃত্রিম আদর্শ প্রচার করলেন, তা বিষের মতোই পশ্চিমী সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের জীবনটা কাদা, তাকে মূর্তি দেন—ঈশ্বর নন—কবিরা, শিল্পীরা। অনেকের জীবনের কর্দমভাব কখনো ঘোচে না, কবির পর কবি এসে পূর্ববর্তী প্রভাব মুছে দিয়ে নিজের চিহ্ন এঁকে দেন—অনেকের আবার একবার যে-চিহ্ন পড়ে, সারা জীবনে তার আর বদল হয় না। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা আজকাল প্রেমে পড়ছে। আমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুর্মারা প্রেমে পড়তেন না, বিয়ে করতেন, এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবনে—প্রেম ছিলো না তা নয়, কিন্তু আমাদের অর্থে ছিলো না। অথচ—আসলে—তাঁদের সঙ্গে আমাদের পোশাকিক এক-আধটু পার্থক্য ছাড়া এমন কী-বা তফাৎ? তাহ'লে ব্যাপারটা কী? লাগ বোধে না, কবি, কিন্তু ফরাশি-রুশ-নরোয়েজীয় নভেল-নাটকের ইংরেজি তর্জমা বাংলা দেশে যদি না ছড়াতো তাহ'লে একা রবীন্দ্রনাথের সাধ্য ছিলো না দেশের তরুণ-তরুণীদের এমন ক'রে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাই তো আজ 'তরুণী বসি' ভাবিয়া মরে,' এবং তরুণ কাঁপে পাণ্ডুজ্বরে (পাদপূরণ আমার)। আসলে আমরা সকলেই আঁদ্রে মোরোয়া বর্ণিত বালজাক-ভক্তের বিচিত্র এক-একটি সংস্করণ; জীবনের সব—বিশেষত প্রেমের—ব্যাপারে সাহিত্য-শিল্পীর কাছে পাঠ নিই; প্রত্যেক গল্পের নায়কের সঙ্গে নিজেকে, এবং নায়িকার সঙ্গে সমসাময়িক প্রিয়াকে মেলাবার চেষ্টা করি, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা নিজেদের জীবনে ঘটাতে চাই, এবং সব সময় চেতন-অচেতন-অবচেতন মনে কোনো-না-কোনো নায়কের নকল করে চলি। আসলে, জ্যান্ত নর-নারী সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের নানান অদল-বদল-করা, সাজগোজ-বদলানো, পাঁচমিশেলী ছায়া বই কিছু নয়। '*We* are the stuff that dreams are made on'—আমরা—রক্তমাংসের মানুষরাই; 'and our little life is rounded

with'—'a sleep' নয়, with আর্ট। মানুষের যথার্থ অস্তিত্ব ছিলো—ঐতিহাসিকরা যাকে প্রস্তরযুগ বলেন, সেই সময়ে। কিন্তু ক্রমেই আর্ট হ'য়ে উঠছে একমাত্র রিয়্যালিটি, এবং যাকে বাস্তব বলো, সেটা ফাঁকা।

আমি না-ব'লে পারলাম না, প্রতুল নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসে।

—তা বাসে, কিন্তু শুধু প্রতুল নয়। ইডিয়টকে নিরালায় নিয়ে উৎসাহ দাও, তারও মুখে ফোয়ারা ছুটছে দেখবে। কিন্তু আমার বক্তব্যটা তোমাদের মনে ধরলো না বুঝি ?

এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রতুল আমাদের কাছে চায়নি, এ ওর বাগ্মিতার ভঙ্গি মাত্র। চুপ ক'রেই ছিলাম আমরা, কিন্তু বিজনটা ফশ ক'রে ব'লে উঠলো, সূর্যের চেয়ে বাল্বের তাপ বেশি হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে সূর্যের চেয়ে বাল্ব বড়ো এ-কথা যে বলে, তাকে পাগল ছাড়া কী বলবো ?

সিগারেট মুখে তুলতে গিয়ে প্রতুল থামলো।—যুক্তির দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই উপমার সৃষ্টি। তাই কবিতায় উঠতে-বসতে উপমা চাই। কথাটা এই যে জীবন-রূপ কাদাকে আর্ট-রূপ কুমোরের চাকাই মূর্তি দেয়। বিশ্বাস যদি না করো, এর চমৎকার একটা উদাহরণও আমি দিতে পারি।

কথাসাহিত্যরসিক বিজন এবার উৎফুল্ল হ'য়ে বললো, একটু সবুর করো প্রতুল, তৈরি হ'য়ে নিই।

ব'লে সে কাঁধের তলায় কুশান চাপিয়ে দিব্যি আরামে গল্প শুনতে উন্মুখ হ'লো।

—খুব বেশি আশা কোরো না, বিজন, (প্রতুলের সিগারেট এইবার জ্বললো) এ-গল্পটা তেমন রসালো হবে না, কেননা villainy এর বিষয় নয়। শুনে বোধ হয় হতাশ হবে, কবি, এ-গল্পটা নিতান্তই মিলনান্ত—কী ক'রে আমি রমাকে বিয়ে করলাম, তারই ইতিহাস।

আমি বললাম, আমার মতে ইতিহাসটা পরে আরম্ভ হয়, তা তোমার পূর্বরাগটাও শুনি।

—হ্যাঁ, পূর্বরাগ। ভারি হাবুডুবু খেয়েছি হে। দিব্যি চ'লে-ফিরে ছিলুম, হঠাৎ রমা নামে কে একজন সাঁড়াশির মতো আটকে ফেললো আমাকে। তারপর ছ-মাস ধ'রে জ্বালা-যন্ত্রণা।

কেনই বা সেদিন ওভাবটুন হল-এ গিয়েছিলাম। কী-একটা বক্তৃতা ছিলো—সম্ভবত প্রাচ্য দেশে নারীজাগরণ সংক্রান্ত—বক্তা একজন জাপানি মেয়ে। আমার কোনো কাজ ছিলো না—কৌতূহল ছিলো।

বিজন বললো, নারী-জাগরণ বিষয়ে কৌতূহল, না—?

—নাঃ, এই নিরীহ কথারও যদি কদর্থ করো, তাহ'লে—

—আর করবো না। বলো এখন।

—সেখানে আমার পুরোনো বন্ধু সুব্রতর সঙ্গে দেখা। সুব্রতর মাসতুতো বোন রমা—সেই সূত্রে আলাপ হ'লো।

প্যাস্কেল নাকি বলেছেন যে ক্লিওপ্যাট্রার নাকটি আর-একটু ছোটো হ'লে পৃথিবীর ইতিহাস যেতো বদলে। তা ঠিক কিনা জানি না, কিন্তু এ-কথা বোধহয় সত্য যে গাড়িতে ওঠার আগে রমা যদি ফুটবোর্ডে এক পা রেখে একটু না দেরি করতো, তাহ'লে আমি আজকে এই গল্প বলার দায় থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেতাম।

পড়া তো গেলো প্রেমে। প্রেমাচরণের মামুলি প্রথা একে-একে শুরু হলো। সে-সবের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কেননা তোমাদের দু-জনেরই গোকুল নাগের 'পথিক' পড়া আছে। প্রথম-প্রথম সবই ভালো—যত ভালো হ'তে হয়—কিন্তু খানিকটা ঘনিষ্ঠ হ'তেই আমার মনে মাঝে-মাঝে বেসুর ঠেকলো।

এইবার গল্পের ক্লাইম্যাক্স আসছে ভেবে বিজন আরো একটু ঘন হ'য়ে বসলো। দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দুই কানে শুড়শুড়িও দিয়ে রাখলো। প্রতুলের একটি কথাও ও হারাতে চায় না;—কে জানে, হঠাৎ যদি কানের মধ্যে পিলপিল ক'রে উঠে রসভঙ্গ ঘটায়!

প্রতুল ব'লে চললো:

—মাস পাঁচেক কাটলো। প্রাত্যহিক যাতায়াত এবং নিবিড় আলাপনাদি সত্ত্বেও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, রমা সত্যি আমাকে ভালোবাসে কিনা। এখানে 'ভালোবাসা' শব্দটি আমি প্রচলিত, সর্ববাদীসম্মত অর্থে ব্যবহার করছি, যদিও ও-বস্তুটিতে আদৌ আমার আস্থা নেই। তবু, জানো তো—ঈভকে প্রথম দেখে সর্পবেশী শয়তানেরও হৃদয় কিঞ্চিৎ দ্রব হয়েছিলো; সে-অবস্থায় আমারও জানবার কৌতূহল হ'লো, আমি রমার পক্ষে না-হ'লেই-নয় প্রয়োজন কিনা।

সাইকলজির বই পড়েছিলাম, মনে গর্ব ছিলো মানবের—এবং মানবীর—মনের সবই আমি বুঝি। সে-দর্প চূর্ণ করলো রমা। বিশ্লেষণের অণুবীক্ষণে ওর মন ধরা দিলো না। হার মানতে হ'লো আমাকে, মগজের কসরতে ফেল হলাম।

Particular থেকে general-এ উপনীত হওয়া বিজ্ঞানসম্মত রীতি; কিন্তু particularগুলি যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তা'হ'লে সাধারণ সমাধানে কী ক'রে উপনীত হওয়া যায় বলতে পারো? দেখা হ'লেই রমা এমন উচ্ছ্বসিত যে এতক্ষণ ও আমারই প্রতীক্ষা করছিলো এ-কথাই বিশ্বাস করতে লোভ হ'তো আমার। অনর্গল কথা—সে-সব কথা অন্তরঙ্গ ভিন্ন কারো কাছে বললে নিজেরই কা'ছে হাস্যকর হ'তে হয়। টেনিস, পিয়ানো, বেড়ানো—সন্ধ্যার তারার নিচে, রজনীগন্ধার ঝোপের ধারে হাতে হাত রেখে ব'সে থাকা—একটা মুহূর্তকেও বিরস হ'তে দেবে না। আশ্চর্য ছিলো ওর উদ্ভাবনশক্তি। দিনের পর দিন সময় কাটাবার এমন বিচিত্র চমৎকার সব উপায় বের করতো যে এক-এক সময় আমার সন্দেহ হ'তো, রমা এগুলো আগে ভেবে-ভেবে সাজিয়ে রাখে। কিন্তু না—ও ছিলো প্রেমকলায় কারুশিল্পী; কবিদের যেমন কবিতা লেখার উপলক্ষ্যের অভাব হয় না, ওরও তেমনি প্রজাপতিপনার উপকরণের অকুলোন ঘটতো না কখনো। মনোহরণের বিস্তায় ও ছিলো আজন্মসিদ্ধা।

ওর কাছে বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে প্রতি রাত্রে আমি একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতাম। ওর জানলায় আলো জ্বলছে, কিন্তু ও আমাকে আর-একবার দেখার জন্য কখনো জানলায় এসে দাঁড়ায় না—এক দিনও না। আমি কল্পনা করতাম যে আমার টাটকা চুমো মুখে নিয়েই ও মায়ের কাছে রান্নার বিষয়ে লেসন নিচ্ছে, কিংবা বোনকে শেখাচ্ছে লজিক। এটাই বড়ো পীড়া দিতো আমাকে। উপস্থিত আপ্যায়ন মধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুপস্থিতিতে, বিরহে যে ভাব-রমণ (হেসো না বিজন, ওটা বৈষ্ণবকাব্যের পরিভাষা) সেটাকেই আমি প্রধান ব'লে গণ্য করি। মানসিক চর্বিতচর্বণই হৃদয়াবেগের যাথার্থ্যের প্রমাণ। দর্শনে অতদূর সদয় না-হ'য়ে অদর্শনে রমা আমার কথা চিন্তা করে, আমি যদি তার কোনো প্রমাণ পেতাম, তাহ'লে মুহূর্তের জন্যও কোনো দ্বিধা আমাকে আক্রমণ করতে পারতো না। প্রেমের প্রকৃত রাজ্য মানসলোকে, চিন্তার নেপথ্যেই তার সিংহাসন।

একদিন মনে হ'লো রমাকে হয়তো আমি উপযুক্ত অবসর দিচ্ছি না; ভালোরও অত্যন্ত বেশি ভালো নয়। হঠাৎ তাই যাওয়া-আসা বন্ধ ক'রে দিলাম। গুনে-গুনে সাত দিন গেলাম না,—আশা ছিলো, তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে রমার জিজ্ঞাসু চিঠি আসবে—যাবার আহ্বান—চাইকি, নিজেও এসে উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু সেই সাতদিন ক্রমাগত সিনেমা দেখে-দেখে চোখের মাথা খাওয়াই আমার সার হ'লো। স্বীকার করছি, বিজন, মনটা একটু ম্রিয়মাণ হ'লো আমার।

বিজন হাসলো।—বুঝেছি, সেই সময়েই শোপেনহাওয়ার পড়ছিলে—না?

—দ্যাখো, দু-শ্রেণীর মানুষ তাদের অবস্থা গোপন করতে পারে না: এক, মেয়েরা যখন হয় গর্ভিণী, আর পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে। দেখলে তো, অমিট্ রায়ের মতো ছেলেও—

বিজন প্রতুলের পায়ে সজোরে একটা লাথি মারলো।

—জানো বিজন, অবান্তর বিষয়েব অবতারণা এপিক কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ ?

—তোমার গল্প epicই বটে, ape-ic !

—এই অর্থে যে, আমাদের মধ্যে যে ape's blood আছে, তাদেব ক্রিয়াকলাপ নিয়েই আমার গল্প। আর সে-কথাই যদি তোলো, তাহ'লে শেক্সপীযবেব ট্র্যাজিডি—

বিজন হাব মেনে নব্ম সুরে বললো, বেহাই দাও দযা ক'বে। আপাতত তোমাব কমেডিটাই শুনি।

—হুঁ। কোন পর্যন্ত বলেছি ?

বিজন গড়গড় ক'বে ব'লে গেলো তুমি সাতদিন বমাব কাছে যাওনি, সেই সাত দিনে রমা তোমাব খোঁজখবব নেযনি, এবং সেইজন্য মন তোমাব ম্রিযমাণ।

—অথচ আট দিনেব দিন গেলাম যখন—আশ্চয। বমা তেমনি খুশি—উচ্ছ্বসিত—আবাব চা খাওযা, গান শোনা, বাগানে সন্ধ্যাছাযায হাতে হাত বেধে ব'সে থাকা—সবই হ'লো। কিন্তু একটিবার জিগেস কবলো না এ-কদিন কেন আসিনি—বিদায়েব সময জিগেস কবলো না আবাব কবে আসবো। (কখনোই করতো না।)

ধাঁধাঁয পড়লাম। সন্দেহ হ'তে লাগলো ওব খুশিটা আমাব কাবণে নয, কাবোব কাবণেই নয়। ওব মনেব ধর্মই প্রফুল্লতা, আমাকে উপলক্ষ্য ক'বে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র, তোমাকে উপলক্ষ্য ক'বেও পেতে পাবতো, বিজন। (বিজন নাসিকা সহযোগে বিশ্রী একটা শব্দ ক'বে উঠলো) আমি, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায নামক ভদ্র যুবকটি ওব কাছে অত্যাবশ্যক নই; আমাকে অবলম্বন কবে নিজেকে ও ফুটিয়ে তুলছে;—কিন্তু আমাব তাতে ভাবি তো এসে যায়!

এর দু-দিন পব আব-এক উপায় চেষ্টা কবলাম আমি। ওব সঙ্গে দেখা হবাব একটু পবেই, অন্য একটা কথাব মধ্যে হঠাৎ বললাম, 'আমাকে আজ এখনই যেতে হবে, রমা—জরুবি কাজ আছে।'

ব'লে অবশ্য তখনই উঠলাম না, কেননা রমা যে আমাকে এত শিগগির ছাড়বে না, সেটুকু অন্তত আশা ছিলো। কিন্তু—

—রমা কিছুই বললো না তো ?

—কিছুই না। শুধু তা-ই নয়, সুব্রতর সঙ্গে সোৎসাহে Dame Melbaর কণ্ঠস্বর নিয়ে আলাপ শুরু করলো।

উঠতে হ'লো আমাকে। সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে অনেক কথাই মনে পড়লো আমার। মনে পড়লো, চুমো খাবার সময় রমা ঠোঁট দুটি ফাঁক ক'রে এলিয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তার পরে অনেক লোকের মধ্যে এসেও আমার মুখের দিকে তাকাতে একটুও লাল হ'য়ে ওঠে না। একটা মধুর অপরাধের চেতনা ধরা পড়ে না ওর পা ফেলায়, কথা বলায়। সবই যেন সহজ, সাধারণ, প্রাত্যহিক— বিশেষের মর্যাদা তাতে বর্তায়নি। মনে হ'লো আমার অস্তিত্বটাকে ও যেন ধ'রেই নিয়েছে, আমি যে আছি, তার জন্য কোনো মূল্যই দিতে হবে না। এই taken for granted হওয়াটাই প্রেমের ক্ষেত্রে সবনেশে ঘটনা।

মনস্থির করলাম, এর একটা মীমাংসা করতেই হবে। রমার মন জানতেই হবে আমাকে—পাই বা না পাই।

আমি জিগেস করলাম, কিন্তু এই অনুসন্ধিৎসাই বা কেন। 'বাহু যদি তেমন ক'রে জড়ায় বাহুবন্ধ, আমি দুটি চক্ষু মুদে রইবো হ'য়ে অন্ধ।'

—কিন্তু মনের মধ্যে মনের কথা ধরতে যাওয়ারও আমার প্রয়োজন ছিলো। যদি কেউটে সাপও বেরোয়, তবু। রমাতে আমি এতই মজেছিলাম যে ওকে বিয়ে করবার কল্পনা বেশ ভালোই লাগছিলো ততদিনে। কিন্তু অভিপ্রায় ব্যক্ত করবার আগে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। সবচেয়ে আমার ভয় পাছে প্রস্তাব ক'রে প্রত্যাখ্যাত হই। দুঃখ পাবো ব'লে নয়, হাস্যকর হ'তে হবে ব'লে। আগে লক্ষ্য নির্ভুল ক'রে তবে ছুঁড়বো তীর। যদি বুঝি যে সুবিধে হবে না তাহ'লে হ্যামিল্টনের বাড়িতে ওর বিয়ের

উপহার পছন্দ ক'রে আসবো একদিন। কিন্তু সুবিধে হওয়াটাই আমার ইচ্ছে।

যত রকম কৌশল আমার জানা ছিলো একে-একে প্রযোগ করলাম—বিফল হ'লো সব। বিষম সমস্যা! রহস্যময়ী নারীর থিওরিতে বিশ্বাসও আরকি। দেদার নভেল পড়তে লাগলাম—যদি কোথাও কোনো পরামর্শ পাই। কিন্তু আশ্চর্য মনে হ'লো এই যে ঠিক তুলনীয় সমস্যা কোনো লেখক কোনোদিন ভাবেননি। এদিকে—সারাটা সময়—দেখা হ'লে রমা আমার কাছে অমৃত, এবং দেখা না-হ'লে আমি রমার কাছে মৃত—এই অবস্থাই চলতে লাগলো।

আমার বুদ্ধি, আমার বিদ্যা আমার চাতুর্য—কিছুই কোনো কাজে লাগলো না। নাজেহাল ক'রে ছাড়লে।

এই রকম মরীয়া অবস্থায় মনে আমার পাপবুদ্ধি ঢুকলে। Honesty আমার মনে হ'লে best policy হ'লোই না—তার চেয়েও বড়ো কথা কার্যসিদ্ধি। The end will justify the means. ফাঁকি দিয়ে রমাকে বিয়ে করা যায় না- ঠকিয়ে।

– মানে?

—মানে? ধরো, বাইরের কোনো প্রভাবে রমার মনটাকে যদি যথেষ্ট নরম ক'রে আনা যায়—এমন একটা দুর্বল মুহূর্তে যদি ওকে পাওয়া যায়, যখন ওর মনের প্রতিরোধের শক্তি ভেঙেছে—সেই মুহূর্তে আমার (for that matter, যে-কোনো সহনীয় পুরুষের) প্রস্তাব কি ও ফেরাতে পারবে? মনে হ'লো আমার যদি জয় হবার হয়, এই তার অনন্য পথ।

এই ফন্দি মাথায় আসার পর মানসিক অবস্থার উন্নতি হ'লো, শোপেনহাওয়ার পুরোনো বইয়ের দোকানে বেচে দিয়ে সেই টাকায় মার্কোভিচ ফুঁকলাম। কিন্তু ঠিক উপায়টা কী, কেমন করে রমার মনে বাঞ্ছনীয় প্রভাব ছড়াবো, কেমন ক'রে সেই দুর্লভ দুর্বল মুহূর্তটি হাতে পাবো, অনেক ভেবেও তার কূলকিনারা পেলাম না। মন

আবার ভাবি হ'য়ে উঠছিলো, এমন সময় হঠাৎ একদিনের ঘটনায় —দৈব ঘটনাই বলতে পারো—আমার উদ্দেশ্যসাধনের মসৃণ পথ স্পষ্ট আমি দেখতে পেলাম।

—কী, কী সে-ঘটনা? রুদ্ধস্বরে জিগেস ক'রলো বিজন।

পুড়ে-আসা সিগারেটের আগুনে নতুন একটা ধরিয়ে নিয়ে প্রতুল বলতে লাগলো:

—তোমরা বোধহয় জানো না যে নাট্যমন্দিরে 'সীতা'র প্রথম অভিনয়রজনীর দর্শকদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। এ-খবরও তোমাদের জানবার সুযোগ হয়নি যে শিশির ভাদুড়ী যখন অ্যামেচার, তখন থেকেই আমি তাঁর অভিনয়ের ভক্ত। সেই প্রথম রজনীর 'সীতা' দেখে—বলবো কী আমা-হেন পাষাণেরও গলায় যেন আলুর দম আটকেছিলো। রাত বারোটায় হেঁটে-হেঁটে যখন বাড়ি ফিরছি, আমার মাথায় এক আশ্চর্য প্ল্যান জন্মালো। নিরানব্বুইটি প্লট বাতিল হবার পর একশো বারের বার প্যারাডাইজ লস্ট-এর পরিকল্পনা পেয়ে মিল্টনও আমার মতন আনন্দিত বোধহয় হননি।

—শুনি, শুনি?

—সেই রাত্রে ঘুমোবার আগে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটা ভেবে ফেললাম—এঁকে ফেললাম বলতে পারো—থিয়েটারের পর কোন রাস্তা দিয়ে কোন রেস্তোরাঁয় যাবো, তা সুদ্ধু বাদ গেলো না—সম্পূর্ণ ম্যাপ মনে-মনে তৈরি। কলকাতার চাঁদের আলোকে বড়ো বেশি ভরসা নেই, তবু, পাঁজিতে দেখলাম, আগামী রোববার পড়েছে পূর্ণিমা। ভালোই হ'লো—চাঁদের আলো থাকলে কোনো ক্ষতি নেই বরং হঠাৎ কোনো কাজে লেগেও যেতে পারে।

পরের দিন রমাকে গিয়ে প্রথম যে কথা বললাম, তা হচ্ছে এই: 'দ্যাখো রমা, মানুষ অমর নয়।'

ভুরু বেঁকিয়ে বললো, 'মানে?'

'মানে আবার কী? তুমি যে তুমি, তুমিও ম'রে যাবে একদিন তা কখনো ভেবেছো?'

'হঠাৎ মোহমুদ্গর ?'

'মরতে হয় মরবে, তার উপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু মরার আগে—' (এখানে একটু pause)—'মরার আগে শিশির ভাদুড়ীর "সীতা" একবার দেখে এসো।'

রমা অবশ্য বলামাত্রই রাজি হ'লো, অত ভণিতার দরকার ছিলো না। রবিবারের বিকেলের পালায়। সঙ্গে যাতে আর কেউ যেতে না পারে (যেতে চাইলে আমার পক্ষে না-নিয়ে যাওয়া মুশকিল হ'তো), সে-জন্য অল্প একটু মিথ্যে বললাম—বেজায় ভিড়, টিকিট প্রায় নেই-ই, অনেক চেষ্টায় পাঁচ টাকার পিছনের দিকে দুটো পাওয়া গেছে, সুবিধে হ'লে আর-একদিন না-হয়—ইত্যাদি।

রবিবার এলো। সাজসজ্জার পারিপাট্যে রমা সেদিন নর্মা শীয়ারার, আর নিরন্তর চঞ্চলতায় বলতে পারো কন্সটান্স টালমাজ। ভবানীপুর থেকে নাট্যমন্দির পর্যন্ত সারাটা পথ—রমারা নতুন একটা গ্রামোফোন আনাচ্ছে—প্যারিসে তৈরি যন্ত্র—ইওরোপীয় সংগীতের বাছাই করা রেকর্ড—সারাটা পথ তার গল্প আমায় শুনতে হ'লো। রমা 'চেলো' শিখবে, তার মতে 'চেলো' হচ্ছে যন্ত্রের সেরা যন্ত্র। রমার কনভেন্টের সিস্টার কবে নাকি বলেছিলেন এমন চমৎকার সোপ্রানো কোনো বাঙালি মেয়ের গলায় তিনি শোনেননি; সুষমা (রমার ছোটো বোন) যদি একটু চেষ্টা করে—ওর সত্যি গানের gift ছিলো।...এই সব।

বলতে-বলতে বার-বার হাত তুলে খোঁপাটা দেখে নিচ্ছিলো, ফাঁকে-ফাঁকে মুখ দেখছিলো ব্যাগের আয়নায়, নাকের ডগায় কী সন্তর্পণেই ছোট্ট ভাঁজ-করা সুগন্ধি রুমালটি ছোঁয়াচ্ছিলো। ওর হাবভাব দেখে আমার পুরুষের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে জ'মে যেতে পারতো, যদি-না শিশির ভাদুড়ীর প্রতিভার উপর আমি নির্ভর করতে পারতাম।

নাট্যমন্দিরে নেমে আমি বললাম, 'বাঙালি ব্যাপার—তেমন punctual নয়। তোমাদের গাড়ি আর না-ই বা এলো। ফেরার সময় ট্যাক্সি—'

'My mistress bent that brow of hers' !

আরম্ভ হ'তে তখন অল্প দেরি—একটি সীট খালি নেই। রমা চেয়ারে ব'সেই চারদিকে তাকালো—যদি কোনো মুখ চোখে পড়ে। তারপর হঠাৎ বললো, 'তুমি হিপ্পোপটেমাস দেখেছো ?'

'না—হ্যাঁ।' Shocked হলাম। 'কেন বলো তো ?'

'সেদিন জু-তে গিয়ে ভাবছিলাম, হিপ্পোকে নিয়ে কেউ কেন কবিতা লেখে না ? ঈশ্বরের অমন চমৎকার বিলাসিতা! চরম কুশ্রীতার আর্ট।'

'জানো না বুঝি ? হিপ্পো আজকাল কবিতায় বেশ ফ্যাশনেবল। ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। পড়তে চাও ?'

'তুমি একটা লেখো না দেখি কেমন পারো।'

'আমি ? পারি না ভেবেছো ? শোনো তবে—'

হিপ্পোপটেমাস্—
লিপ্ত পটে মাস।

'মানে কী হ'লো ?'

'বুঝলে না ? হিপ্পোপটেমাস—পটে যেন মসী লেপন করা হয়েছে —এমনি কালো।'

'কিন্তু মসী কোথায় ? মাস যে।'

'ও-ই মসী। ওটা বাংলা কাগজের ছাপার ভুল।'

রমা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

এই অতীব silly ব্যাপার কতক্ষণ চলতো কে জানে—সুখের বিষয় সেই মুহূর্তে ঘণ্টা বাজলো,—প্রেক্ষাগৃহের • গুঞ্জন থামলো, উঠলো যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক চলছে। রমা প্রায় অনবরতই ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে কানের কাছে। সীতার অত মোটা হওয়া উচিত হয়নি, রামের পোশাকটি মানিয়েছে বেশ। আশ্চর্য, prompterদের গলা তো শোনা যাচ্ছে না। 'কানা' কেষ্ট কেন ? সত্যি চোখ নেই ? কিন্তু কী গলা!

আমি একবার বললুম, 'আঃ, একটু চুপ করো না !'

রমা চুপ ক'রে সোজা হ'য়ে বসলো ! কিন্তু চেয়ারে ব'সে কিছুতেই যেন আরাম পাচ্ছে না—একবার এদিকে ঝুঁকছে, একবার ওদিকে—উশখুশানির শেষ নেই। তারপর হঠাৎ···

'বইটা কার লেখা ?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। প্রথম অঙ্ক শেষ হ'লো।

তখন আমি বললাম, 'রমা, তোমার কথাগুলি কি এতই জরুরি ? আপাতত ঐ স্টেজের ওদেরই কথা বলতে দিলে ভালো হয় না ?'

'আচ্ছা আচ্ছা, এখন তো আর নাটক হচ্ছে না, এখন, এই যে—সুধীর !'

এগিয়ে এলো সুবেশ একটি যুবক। তারপর ডলি নাম্নী কোনো সদ্যবিবাহিতা যুবতীর বিষয়ে আমার পক্ষে গ্রীকভাষায় ওরা আলাপ করলে। 'কেমন লাগছে সীতা ?' 'তা মন্দ কী—' হাসি—চাউনি—অন্ধকার—ঘণ্টার শব্দ। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হ'লো।

'এই সুধীর ছেলেটা কী করেছিলো, জানো ? একবার ট্রেনে এক সাহেবকে—ছী ছি, এই নাকি ঊর্মিলা ? এ যে সীতার মেয়ে হ'তে পারে !'

অসম্ভব। নিরুপায় হ'য়ে পাথরের মতো মুখ ক'রে বসে থাকলাম। ওর যত খুশি বকুক। নিজেরই অজান্তে আমি নাটকে মগ্ন হয়েছিলাম, যতক্ষণে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'লো ততক্ষণে হঠাৎ বুঝলাম যে রমা অনেকক্ষণ একটিও কথা বলেনি। মনে আমার আশার ঢেউ দিলো।

সুধীর এসে জিগেস করলো, 'রমা, আইসক্রীম ?'

'না।'

'শুনেছো, পরেশ বিলেত যাচ্ছে।'

'পরেশ নন্দী ? ও তো কথা বলতেও শেখেনি এখনো।'

'বিলেতে গিয়ে শিখবে' ব'লে সুধীর নিজে গম্ভীর থেকে রমাকে হাসাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঠাট্টাটা তেমন জমলো না।

তৃতীয় অঙ্কে শম্বুক-বধ। তুঙ্গভদ্রাবমর্মভেদী চীৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে রমার গলা দিয়েও অস্ফুট একটি আওয়াজ বেরোলো ;—আমি তা শুনলাম।

আলো জ্বলতে দেখি, রমা মুখ ফিরিয়ে হাতের উপর মাথা রেখেছে। সুধীর দূর থেকে দেখে ফিরে গেলো। আমি জিগেস করলাম, 'কী হ'লো রমা ? শরীর খারাপ হ'লো ? বাড়ি যাবে ?'

রমা চোখ তুলে শুধু বললো, 'তুঙ্গভদ্রার কী চুল।' ব'লে হাসলো ; কিন্তু সে-হাসিতে আর কন্সটান্স টালমাজের হাসিতে অনেক তফাৎ।

চতুর্থ অঙ্কের সময় আমি একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, রমার বাঁ হাতের মুঠিতে রুমাল। তারপর আর তাকালাম না। ততক্ষণে প্রেক্ষাগৃহে মাঝে-মাঝেই গুমরে উঠছে চাপা কান্না, মেয়েদের নাক টানার আর পুরুষদের গলা খাঁকারির আওয়াজ দিচ্ছে। রাম আর লবে যখন দেখা, রমা তখন সামনে ঝুঁকে দু-হাতে আমার হাত আঁকড়ে ধরলো, একটু পরে মাথাটি এলিয়ে দিলো আমার কাঁধে। ঠিক আছে—সবই সুলক্ষণ। ও যাতে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হ'তে পারে সেই সুযোগ দেবার জন্য এর পর আলো জ্বলতেই আমি বাইরে চ'লে গেলাম—এলাম পঞ্চম অঙ্ক সুরু হবার পরে।

রমা তখন নিশ্বাসও ফেলছে না।

বহুদূর থেকে ভেসে-আসা শ্রীমতী প্রভার 'নাথ' উচ্চারণের সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ তিনঘণ্টার অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলো। আলো জ্বললো, মোহ ভাঙলো, শুরু হ'লো বাস্তবের কোলাহল। রমা কিন্তু মাথাই তুলছে না। ওকে ডাকতে হ'লো। উঠে দাঁড়াতে বেশ একটু সময় লাগলো ওর। লাল চোখ—কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই ওর চোখের দিকে তাকালাম না।

দরজার কাছে সুধীর। রমা তাকে দেখলোই না।

ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম দু-জনে। গাড়ি বেঁকলো গ্রে স্ট্রীটে।

রমা বসেছে। ওর খোঁপা গেছে আলগা হ'য়ে, হাত থেকে খ'সে পড়েছে রুমাল, কোনো দিকেই লক্ষ্য নেই। আশাতীত ফল পেয়েছি বুঝলাম, তবু—এখনো না, আর-একটু দেখা যাক।

সেনট্রাল অ্যাভিনিউ। হাওয়ার বন্যা। হ্যাঁ, কলকাতায় চাঁদের আলো আছে বইকি, কালো চুলেও ঝিলিক দেয়। চুপচাপ চলেছি দু-জনে, রমা বসেছে চোখ বুজে এলিয়ে—এই, এই হয়তো সময়। আমি তার কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, 'শীত করছে হাওয়ায়?'

রমা শুধু তাকালো একবার, কিছু বললো না। যেন কথা বলতে ভুলে গেছে।

তখন আমি—হেসো না বিজন—আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে ডাকলাম—'সীতা।' সঙ্গে-সঙ্গে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো।

ইজি-চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলো প্রতুল।—নাও, হ'লো তো! ওঃ, বকাতেও পারো তোমরা!

বিজন ব'লে উঠলো, বাঃ, হ'য়ে গেলো?

—আবার কী? রমা যে বর্তমানে আমার স্ত্রী, তা তো তোমরা জানোই।

—তবু ঘটনাবলী?

—ঘটনাবলী? পথে একবার ফার্পোতে নামলাম। রমাকে বললাম, 'তোমার খোঁপাটা ঠিক ক'রে নাও, আর মুখে একটু পাউডার বুলোও।' কফির পেয়ালায় রমা অনেকটা সজীব হ'লো। তখন আমি বললাম, 'একটা কথা বলবো, রমা?'

'কী, বলো।'

'মনে হচ্ছে—আজ মনে হচ্ছে—কোনোরকমে এমন যদি হ'তো যে তুমি আর আমি এক বাড়িতেই ফিরবো এখান থেকে।'

শুনে রমা গম্ভীর হ'লো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আজ তা সম্ভব নয়, কিন্তু কোনোদিন তো হবে।'

আমি করুণ স্বরে বললাম, 'কেমন ক'রে হবে বলো তো?'

এর উত্তরে রমা যে-কথা বলেছিলো, তা আমি কোনোদিন ভুলবো না। বলেছিলো, 'যেমন ক'রে রাম সীতার হয়েছিলো। কিন্তু তুমি আমাকে বনবাসে দিয়ো না কিন্তু কোনোদিন।'

পরের দিনই আংটি গড়াতে দিলাম।

—বিয়ে তো করলে ফাঁকি দিয়ে? কিন্তু তারপর? প্রশ্ন করলো তথ্যলিপ্সু বিজন।

প্রতুল ছোট্ট হাই তুললো।—তারপর কিছু নেই। বিয়েই যদি হ'তে পারলো, তাহ'লে আর ভাবনা কী? হাজার হোক, মেয়ে। জল। যে-পাত্রে রাখো, তারই আকৃতি নেবে, রং ধরবে। রমা এখনই নিজেকে সবচেয়ে ভাগ্যবতী স্ত্রী ভাবছে। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, বিজন, তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লেও সে ঠিক এই কথাই ভাবতো। ওহে কবি, একটু চায়ের কথা ব'লে দাও।

অতনু মিত্র সাবিত্রী বোস—আর বুলু

সুন্দর চেহারা আমাদের অতনু মিত্রর। ওর রূপ কানের কাছে চুপি-চুপি কথা কয় না, তারস্বরে চীৎকার করে—অন্যমনস্ক হ'তে দেয় না, অনেকের মধ্যে লক্ষ্য না-ক'রে উপায় রাখে না। বেচারার নিজের আর দোষ কী? বিধাতাই ওকে এমন ক'রে তৈরি করেছেন যে ওর কপালের উপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে 'আমার দিকে তাকাও' লেখা থাকলেও ক্ষতি ছিলো না। তাকাতে ওর দিকে হবেই।

মাজা গায়ের রং; ফর্শা বললে তার বর্ণনা হয় মাত্র, ব্যঞ্জনা হয় না। গ্রীক দেবতার মতো নাক; বড়ো, গভীর-কালো চোখ—আলস্যে বাসনায় টলটলে দুই চোখ, লম্বা, সরু পলকগুলির বেড়া দিয়ে যত্ন ক'রে ঘেরা। টশটশে ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে ঝকঝকে দাঁতের একটু আভাস দেয়; কপালটি শানের মতো পালিশ-করা—তাকে ললাটফলক বললে কবিত্ব হয় না; আর যখন তার পাৎলা নরম সিল্কের মতো চুলে—

কিন্তু এ-ই থাক। আপত্তি হ'তে পারে—পুরুষমানুষের চেহারা, তা যত ভালোই হোক ও নিয়ে অত ফ্যানানো কেন।—ঠিকই, হয়তো একটু বাড়াবাড়িই হয়েছে আমার; কিন্তু অতনুর এই সুন্দর চেহারা তাকে একবার যে-বিপদে ফেলেছিলো, তা-ই নিয়েই এই গল্প; বলা যেতে পারে, এই গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা। কেননা, তার এই অনুচর চেহারাটির জন্যই তো মেয়েরা সব পাগল হ'য়ে গেলো, এবং সব মেয়েরা পাগল হ'লো দেখেই না সাবিত্রী বোস পণ করলো অতনুকে জয় করা চাই; আর সাবিত্রীর হাতে ধরা দেবার পর হঠাৎ অন্যত্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার হ'লো ব'লেই তো অতনু পড়লো মুশকিলে, এবং অতনু মুশকিলে প'ড়ে আমাকে অনেক কথা ব'লে ফেলেছিলো; আর তাই না আমি এ-গল্প লিখতে পারছি।

গোড়ায় দেখা যাচ্ছে ওর চেহারা; মামুলি প্রথামতো তাই, গোড়াতেই শুরু করলাম।

সুকুমার ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, 'যেমন নাম তেমনি চেহারা! আহা আমার কিউপিড রে!'

সুনীল ঠাট্টা করতো, 'যেমন চেহারা, তেমন চরিত্র!' "কী করা হয়, মশাই?" "প্রেম।"'

সুনীল আমাদের আর্টিস্ট বন্ধু—চৌকোমুখো পুরুষ এঁকে বন্ধুমহলে নাম করেছে। ওর চোখের ভিতর মিকায়েলেঞ্জোলোর মতো লালচে ছিটে আছে ব'লে ওর ভারি দেমাক। আর সেইজন্য ওর মনে-মনে ধারণা ছবি আঁকায় ও প্রকাণ্ড কিছু হবেই। অতনুর চোখ যত সুন্দরই হোক, তাতে লালচে ছিটে-ফিটে কিছু নেই—সুনীল তাই কথায়-কথায় ওকে ঠোকে। সুনীল বুঝতেই পারে না অতনুর সঙ্গে মেয়েরা এত প্রেমে পড়ে কেন—খেয়ে-দেয়ে আর কি ওদের কাজ নেই? প্রেমে পড়া ব্যাপারটাই বাজে; কিন্তু এমন যদি হয় যে কোনো মেয়ের প্রেমে না-পড়লে চলছেই না, আসুক না সে সুনীলের কাছে! হ্যাঁ, অতনুর চেহারা ভালো হ'তে পারে, কিন্তু জিনিয়স···! ইজাডোরা ডানকান কেন বাংলা দেশে জন্মায়নি? সুনীল ব্যানার্জি কলালক্ষ্মীর উপাসক; অতনু মিত্রের মতো যারা শুধু এক আঁচলের জট ছাড়িয়ে আর-এক আঁচলে ছিটকে পড়ে, তাদের প্রতি অসীম ওর করুণা।

অথচ, দোষ বলতে অতনুর কিছু না, ওর চেহারাই ওর কাল হ'লো। কোনো মেয়েই ওকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি—এক অমিতা চন্দ ছাড়া। অমিতা চন্দর মনটা যেন নদীর স্রোত—সব-কিছুর উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, বাঁধা পড়ে না কোথাও। ওর হৃদয়টা তরল পদার্থ ব'লে ভাঙবার তার ভয় নেই। অতনু না-জেনেও কত মেয়েরই হৃদয় ভাঙলো এ-পর্যন্ত—টুকরো কাচের মতো এখনো হয়তো ছিটিয়ে আছে সে-সব—আমাদের অমিতা—ফুরফুরে অমিতা—শুধু বেঁচে গেলো।

ওর প্রতি স্ত্রীজাতির এই দুর্বলতায়, আর যা-ই হোক,—অতনু দুঃখে ম'রে যায় নি। অবশ্য এ-দুর্বলতা না-থাকলেও ও শুকিয়ে মরতো না। ওকে যারা শুধুই রমণীমোহন ব'লে জানে, তারা ওর কথা কিছুই জানে না। সুবিধে পেলে ও রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকে, দু-চার বার আমেরিকায় গিয়ে, বত্রিশ বছরে মরতে পারতো। কিন্তু সুবিধেই ও পেলো না ছাই। বলতে গেলে মেয়েদের হাওয়ায়-হাওয়ায় ও বড়ো হয়েছে। নিজের আকর্ষণশক্তির চেতনা ওর প্রথম যখন জাগলো, তখন ওর বয়স—কত আর? চোদ্দ কি পনেরো। সেই থেকে—বলা যায়—মেয়েরা ওকে মাথায় তুলে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই থেকে নারীসান্নিধ্যের মাখন খেয়ে অভ্যেস ওর। হ'তে-হ'তে এমন হয়েছে যে তা ছাড়া ওর চলেই না। অথচ মেয়েদের সঙ্গ ও উপভোগ করে না, শুধু সহ্য করে। এ ছাড়া ওর উপায় কী? একা মানুষ; বাধিত করতে হয় অনেককে। এদেরই মধ্যে যে-কোনো একটিকে ও ভালোবাসতে পারতো, কিন্তু আর-সবাই ছাড়বে কেন? এবং সবাই যখন ওর দিকেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন বিশেষ-একজনের দিকে বিশেষভাবে মন দেবার ওর সময় কোথায়? আসলে অতনুর কারবার হৃদয় নিয়ে নয়—তাতে অত টানা-হেঁচড়া সয় না—এমন কি ওর ধারণা যে হৃদয় জিনিষটা সভ্য মানুষের সর্বশেষ কুসংস্কার। সত্যি-সত্যি তা-ই ধারণা কিনা জানি না, মুখে অন্তত ও তা-ই বলে। মুখে ও অনেক কিছুই ব'লে বেড়ায়—বেড়াতো—যতদিন না পনেরো বছরের শ্যামল একটি মেয়ে—কিন্তু যখনকার যেটা।

আপাতত সাবিত্রী বোসের দিকে তাকানো যাক।

২

একদা এক শনিবারে গ্লোব সিনেমায় বড্ড ভিড়। সাবিত্রী বোস আর অমিতা চন্দ অনেক খুঁজেও পাশাপাশি জায়গা পেলো না। ফিরে যাওয়ার চাইতে—ওরা ভাবলো—বরং আলাদা ব'সেই দেখা

যাক। ঢুকলো যখন ছবি আরম্ভ হয়-হয়। যে যার জায়গায় বসতেই আলো নিবলো।

সাবিত্রী জানতো না যে ওর ঠিক পিছনেই অতনু মিত্র ব'সে আছে। অতনুকে ও চিনতো না তখনো। •তাছাড়া ও মন দিয়ে ছবিটাই দেখছিলো; আশে-পাশে তাকাবার ফুরশৎ ছিলো না।

অতনু কিন্তু ছবি দেখতে-দেখতে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়; গল্পটা বুঝতে পারে না; ঘরসুদ্ধ লোক যখন হেসে ওঠে ও চমকে পরদার দিকে তাকিয়ে হাসির কিছুই দেখতে পায় না। দেখতে পায় একটি পিঙ্গল-করা মাথার পিছন; দু-দিকের চুল ঘণ্টার মতো নেমে এসেছে; ঘাড়ের কাছে পুরুষের মতো ছাঁটা। ও যদি আস্তে, খু—ব আস্তে ঐ ঘাড়টিতে একবার হাত রাখে—রেখেই হাত তুলে আনে—তাহ'লে কি জানতে পারে মেয়েটি? ব'সে-ব'সে ঘাড়টির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ এই কথা ভাবলো অতনু, তারপর দৃঢ়ভাবে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে-মনে বললো, 'এইমাত্র কী সাংঘাতিক সংযম অভ্যাস করলাম, তা যদি জানতে, ঈশ্বর!'

এমনি ক'রে ইনটর্ভেল এলো।

তিন সারি চেয়ার পেরিয়ে অনেক চেষ্টায় এগিয়ে এলো অমিতা।

—'আরে, অতনু!'

'অমিতা! তোমার মতো cinema-hater—'

'সাবিত্রী নিয়ে এলো জোর ক'রে। ও, তোমাদের আলাপ নেই বুঝি? এই, সাবিত্রী!—'

সাবিত্রী হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিলো।

একটু পরে অতনু বললো সাবিত্রীকে: 'আমার সামনে আপনি ব'সে ছিলেন তাই ফিল্মটা আমি কিচ্ছু দেখতে পাইনি। গল্পটা কী বলুন তো?'

অমিতা বললো অতনুকে : 'আমার সঙ্গে জায়গা বদলাবে তুমি ? তুমিও ছবি দেখতে পাবে—আর আমিও সারাক্ষণ ছবি দেখার শাস্তি থেকে বাঁচবো।'

আর, এর উত্তরে, সাবিত্রী বললো অমিতাকে : 'থাক না। তুমি সারাক্ষণ বকবক করবে তো—ফিল্মটাই দেখতে দেবে না আমাকে !'

অমিতা দূরে থাকা সত্ত্বেও ইনটর্ভেলের পর সাবিত্রীর প্রায় সিনেমা দেখা হ'লোই না। না অতনুর। মাঝখান থেকে অমিতা বেচারা সিনেমা দেখে মরলো।

এই পর্যন্ত গল্পের ভূমিকা।

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় সাবিত্রীদের ড্রয়িংরুমে স্যুট-পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক পাইচারি করছিলেন। মুখে তাঁর পাইপ, দু-হাত ট্রাউজর্সের পকেটে। মাঝে-মাঝে হাত তুলে তিনি ঘড়ি দেখছেন আর ভুরু কুঁচকোচ্ছেন। প্রায় পনেরো মিনিট পাইচারির পর শ্রান্ত হ'য়ে তিনি বসতে যাবেন, এমন সময় সাবিত্রীর প্রবেশ। ভদ্রলোক না-ব'সে এগিয়ে গেলেন। সাবিত্রী বললো, 'বসুন।'

ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ না-নামিয়েই বললেন, 'সময় নেই। It's getting late for the theatre.'

সাবিত্রী বললো, 'বসুন।'

ভদ্রলোক মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, 'I say, it's getting late for the theatre. And you not yet dressed ! What the—'

সাবিত্রী বললো, 'Don't swear '

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে আধ ঘণ্টার উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে—অথচ not yet dressed ! By—'

সাবিত্রী বললো, 'Don't swear.'

ভদ্রলোক আগুন হ'য়ে বললেন, 'I'm not going to stand—'

সাবিত্রী মিষ্টি ক'রে বললো, 'Please sit down'

ভদ্রলোক বললেন, 'Hell! I'm off.'

সাবিত্রী বললো, 'Thank you.'

আর, একটু পরে টেলিফোন তুলে--'হ্যালো—that you?—এখন আসবে একবার? থিয়েটারে যেতাম, সরকারকে ভাগিয়ে দিয়েছি।—আসবে? That's all right. You'll find me ready.'

টেলিফোন রেখে সাবিত্রী গেলো নিজের ঘরে সাজতে।

পরের দিন সরকার এসে বললেন, 'সাবিত্রী, কাল তুমি থিয়েটারে গিয়েছিলে—with a young man who looked like a professional lover--'

সাবিত্রী বললো, 'Don t be ridiculous.'

সরকার গম্ভীর মুখে বললেন I demand an explanation.'

সাবিত্রী বললো 'It needs none.'

সরকার সাবিত্রীর হাত ধ'রে বললেন 'Darling, I love you to desperation.'

সাবিত্রী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'I don't mind.'

এর পরে কোনো ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারেন না; এবং সরকার যে ভদ্রলোক তা ইতিপূর্বে অনেক বারই বলা হয়েছে। এ-গল্পে এই ভদ্রলোকটিকে দ্বিতীয় বার দেখা যাবে না।

৩

অতনুর সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা লেগে সাবিত্রী প্রথমে ছিটকে পড়লো, তারপর যেন টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে গেলো চ'রদিকে, অতনুকেই ঘিরে-ঘিরে, ছড়িয়ে গিয়ে ঘিরে ধরলো তাকে, কুয়াশার মতো। অতনুকে কুয়াশার মতো জাপটে ধরেছে সাবিত্রী—আমাদের চোখে ঝাপসা দেখায়—অতনুকে দেখলে যেন চিনতে পারি না।

সাবিত্রীর বাপ ব্যারিস্টার, লান্সডাউন প্লেসে ওদের বাড়ি। ওর উপাসকের দল বলে যে ও বাংলার আগে ইংরিজি শেখে, এবং ইংরিজির চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ। ওর ফ্রেঞ্চ বিদ্যার পরিধি নির্ণয় আমার সাধ্যে কুলোবে না, তবে সুকুমারের মতামত এখানে লিপিবদ্ধ করলে অবান্তর হবে না। সাবিত্রীর কথাবার্তা—সুকুমার বলে—ইংরিজি বাংলার মিশোল হ'লেও ফরাশি ভাষায় ওর দখল—সুকুমার বলে—দুটি কথায় সীমাবদ্ধ: 'নেসপা ?' এবং 'ম শের' (কি মা শের)। ঐ দুটি শব্দের ও এত বেশি ব্যবহার করে যে তাকে অপব্যবহার বলা যায়। তবে, এটা ঠিক -সুকুমার বলে—যে ও-দুটো শব্দের মানে ও জানে।

কিন্তু সুকুমার কী-ই বা না বলে। সাধে কি আর সুনীল ওকে রসিকতার ফেরিওলা বলে।

এটা ঠিক, চালচলনে সাবিত্রী বোসের জুড়ি নেই। ওর মতো ঝকঝকে ফিনফিনে হালকা মাজাঘষা শরীর আর কোন মেয়ের ? ওর মতো ভুরু নাচাতে, ঠোঁট বাঁকাতে কাঁধ ঝাঁকাতে আর কোন মেয়ে জানে ? ও চলাফেরা বিলিতি ছাঁদে বাঁধা, প্রতি পদক্ষেপে ওর দোলা ;—তাতে ওর শরীরের নারীত্ব আরো পরিস্ফুট হ যে পথিক পুরুষের চিত্তবিভ্রম ঘটায়। একটু উঁচু ক'রে শাড়ি পরার ফ্যাশান ও-ই তো প্রবর্তন করে—এবং বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম চুল ছেঁটে ফ্যালেও সে—এই সাবিত্রী বোস। সে ১৯২৫ সনের কথা—ওর বয়েস তখন সবেমাত্র সতেরো। একদিন বিকেলে কলেজফেরতা মেয়েকে মা হঠাৎ চিনতে পারলেন না। চিনতে যখন পারলেন, মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হ'লো এ তাঁর মেয়ে না-হ লেই যেন ভালো ছিলো। এমনকি, সাবিত্রীর ব্যারিস্টার বাপেরও হঠাৎ এতটা মেমিয়ানা হজম হ'লো না। কিন্তু একমাস না যেতেই এমন হ'লো যে লম্বাচুলের মেয়েকে তাঁরা কল্পনাও আর করতে পারেন না। এরই নাম অভ্যেস।

সাবিত্রীকে শিঙ্গল মানিয়েছে, এ-কথা সুকুমারকেও মানতে হয়েছে। তেল-না-দেয়া বাদামি রঙের চুল দু-দিকে দিয়ে ঘন্টার মতো

নেমে এসে ওর মুখখানাকে ঘিরেছে—সুন্দর ছবির জুটেছে সুন্দর ফ্রেম। ওর চোখে নীলচে আভা, আর চোখের হাসি নীল জলে ঝলক-তোলা রোদের মতো। ওর ঠোঁট দুটি পরিপূর্ণ রক্তিম, সমস্ত দেহটি উজ্জ্বল উচ্চকিত, যেন উদ্ধত কৃষ্ণচূড়া চৈত্রের ম্লান আকাশের তলায়, ঘন সবুজ পল্লবের আড়ালে। ও যে বিশেষভাবে চোখে পড়বার মতো, তা ও নিজেও কখনো ভোলে না, অন্যদেরও কি ভুলতে দেয়?

এই সাবিত্রী বোস অতনুকে কুয়াশার মতো ঘিরে আছে; ওকে দেখলে যেন চেনাই আর যায় না। সত্যি বলতে কী, ওকে আর দেখাই যায় না বড়ো-একটা। আমার বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় যে-আড্ডা বসে, অতনু আজকাল প্রায়ই সেখানে অনুপস্থিত। কচিৎ যখন আসে ভাবখানা এমন যেন ম্যাকডনাল্ড সাহেব ওর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেবার দিনক্ষণ সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন—আমরা হতভাগারা এখনো তার কিছুই জানি না। আমাদের কোনো কথায় তার উৎসাহ নেই; ভিলমা ব্যাঙ্কি কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করলো, কাপাব্লাঙ্কার পর দাবা খেলায় পৃথিবী জয় করেছে কে-কে; বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের ঠিক সম্বন্ধ কী, 'যোগাযোগে' মধুসূদনের চাইতে কুমুর উপরেই কি রাগ ধরে বেশি?—এমনি সব জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'লেও ও আপন মনে ঝিমোতেই থাকে। ওর কানে যেন কোনো কথাই যায় না, কিংবা কানে গেলেও মগজ ইস্তক পৌঁছয় না। ফলে ও মাঝে-মাঝে যা দু-একটা কথা বলে, তা এমন অর্থহীন, অবান্তর হ'য়ে পড়ে যে সুকুমার বলতে বাধ্য হয়, 'গর্দভ।' ('গন্ধর্ব' নয়, গর্দভ।')

কিন্তু সাবিত্রী বোস যাকে কুয়াশার মতো ঘিরে আছে, তাকে গাল দেয়া বৃথা। পৌঁছবে না। সেই অন্তরঙ্গ আবরণ ভেদ ক'রে ওর চোখ অন্য কিছুই দেখতে পায় না, কান পায় না শুনতে। তাই তো সুকুমারের বিদ্রূপবাণ ও ঈষৎ হেসেই ফিরিয়ে দেয়—একটু বোকার মতো হাসি, তা ঠিক। না-হয় বড়ো জোর অলস

গলায় বলে, 'যা-যাঃ' ;—একটু বোকার মতো বলে, তা ঠিক। এমন পুরুষ কে কোথায় আছে যে প্রেমে পড়লে—কি যার প্রেম পেলে—একটু না বোকা হ'য়ে যায় ?

অতনুর সম্বন্ধে 'প্রেম পেলে' বলাই ভালো; কেননা, ও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে এমন সন্দেহ আমরা কেউ কখনো করিনি। ও সাবিত্রীকে সহ্য করে—এ পর্যন্ত। কিন্তু সাবিত্রীর মন রাখার জন্য ও যে কখনো একটু বেশি রাত জাগবে, কি ধুতির সঙ্গে শার্ট পরবে, কি দুপুর রোদে বাড়ি ছেড়ে বেরোবে, এমন ছেলেই অতনু মিত্র নয়। সাবিত্রীর গৌরব এটুকু যে ও অতনুকে সম্পূর্ণ দখল করতে পেরেছে—অতনুর গতিবিধি আজকাল একপথবর্তী। এই নিষ্ঠার পিছনে স্বাভাবিক ক্লান্তি কতটা আছে বা থাকতে পারে, এ-চিন্তা সাবিত্রীর মনে আসেনি। সাবিত্রী—হাজার হ'লেও—মেয়ে। ভালোবেসেই ওর সুখ, ওর সুখ আত্মসমর্পণে ; পিছন ফিরে তাকাবার ওর সময় কোথায়। সময় কোথায় ভাববার ?

তাই অতনুর সঙ্গে যখনই ওর দেখা হয়, ও প্রথমে অতনুর হাত ধরে, পরে সে-হাতের উপর একটু চাপ দেয়, পরে হাত ছেড়ে দিয়ে ওর (অতনুর) চোখে তাকায়, তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসে একটু, ওর চোখের নীল জলে রোদের মতো ঝিলিক তোলে হাসি। তারপর একবার মাথা ঝাঁকায়—দু-পাশের চুল সোনার ঘণ্টার মতো দুলে ওঠে, রুপোর ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে ওর মন।

ঘাসের উপর ছায়ার চলার মতো হালকা ওর ডাক : 'Prince Charming !'

অতনু অনেকটা কর্তব্যের খাতিরে সাড়া দেয়, 'Golden Guendolen ! (কেননা, অতনু সাবিত্রীকে বলেছে যে তার চুলের রং পাকা ধানের মতো, যদিও আসলে—কিন্তু কবিতার প্রাণ কি অতিরঞ্জন নয়, এবং প্রেমের প্রাণ কবিতা ?)

সাবিত্রী বলে, 'My own !' আর অতনু :

'Love !'

এমনি চলে খানিকক্ষণ প্রণয়বচনের বিনিময়, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যার কোনো মানে নেই।

তদন্তে সাবিত্রী বলে, (কোনো-এক দিনের কথাই ধরা যাক) 'বৃষ্টি হবে ব'লে মনে হচ্ছে, নেস্‌পা ?'

'বৃষ্টি অবশ্য হ'তে পারে,' অতনু জবাব দেয়, 'সত্যি বলতে কী, বৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব ; ক-দিন যা গরম যাচ্ছে, বৃষ্টি হওয়াই তো উচিত—হ'লেই বাঁচি আমরা।'

'কিন্তু—' সাবিত্রী হেসে ফ্যালে, 'কিন্তু, ম শের, বৃষ্টি, হলে আমরা কি বেরোতে পারবো,—আর না-পারলে ঘরে ব'সে আমরা করবো কী ?'

অতনু তার ইংরেজি পদ্যের পুঁজি ঘেঁটে, ইতিপূর্বে অন্যত্র যা আউড়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করে, "We are in love's hand to-day, where shall we go ?"'

সাবিত্রী লোরেটো হাউসে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছে মাছ যেন চেনা জলে ফিরে এলো এমনি ওর আরাম। নীল চোখ বড়ো ক'রে বলে, 'Charmant ! এই জন্যই তো Keats has always been my favourite। ভারি languid—নেস্‌পা ?'

'ডার্লিং', অতনু বলতে থাকে, 'কীটস যে তোমার প্রিয় কবি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই ; এবং কীটস যে languid, এ-কথাও হয়তো আরো অনেকে মানবে। যে-লাইনটি আমি এইমাত্র বললাম, তাতে এক-আধটু languorও হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু কীটস তা কোনো জন্মে লেখেননি। কে লিখেছিলেন, তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না, কিন্তু কীটস যে লেখেননি এটুকু তুমি জেনে রাখো।'

সাবিত্রী মুগ্ধ হ'য়ে বলে, 'How clever you are, mon cher ! কিন্তু বৃষ্টি যে এলো— what shall we do ?'

'বাজাতে পারো। গান করতে পারো। পিংপিং খেলতে পারো। নভেল পড়তে পারো। গল্প করতে পারো। চুপ ক'রে

ব'সে থাকতে পারো। যা তোমার খুশি। তুমি যা-ই করো, তোমাকে অ্যাডমায়ার করার লোকের অভাব হবে না—যতক্ষণ আমি আছি।'

এর উত্তরে সাবিত্রী শুধু বলে, 'Oh!' যে-কথার কিনা নানা রকম অর্থ হ'তে পারে। তারপর আবার অতনুর হাত নিজের হাতে নেয়—এবং তারপর যা হয়, তা আগেই বলা হয়েছে।

এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে ওর প্রতি সাবিত্রীর এই মনঃসংযোগে অতনু উৎফুল্ল, উল্লসিত, এমনকি, উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি। তা হ'লেও—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—ওর ঘুম ভাঙেনি, হৃদয় জাগেনি। হ'তে পারে, এই ওর জাগ্রত অবস্থা। ওর মধ্যে আমরা একটি জিনিশ বরাবর লক্ষ্য ক'রে এসেছি—মজ্জাগত আলস্য, উৎসাহের অভাব। পারস্য বেড়ালের মতো ও আরামপ্রিয়। ও চুমো খাওয়ার চাইতে ঘুমোতে ভালোবাসে। আহার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলে ওর মেজাজ ঠিক থাকে না। শারীরিক অসুবিধে সইতে পারে না একেবারেই। না-চাইতে ও এত পেয়েছে যে এখন কোনো চেষ্টা করতে হ'লে ও বোধহয় ম'রেই যাবে। নিতান্তই যা হাতের কাছে এসে ঠেকে, তা ও দয়া ক'রে মুখে তুলতে পারে, কিন্তু তার বেশি না। এ-ও ঠিক যে ওর হাতের কাছে যা-কিছু এসে ঠেকে, তা-ই পুরোপুরি মুখে তুলতে ওর সময়ে কুলোয় না—অন্বেষণ বা উপার্জন তো দূরের কথা। এই অতি-প্রাচুর্য ওকে ঢিলে, নরম ক'রে দিয়েছে। আবেগ নেই ওর মধ্যে, উত্তাপ নেই। ও ভদ্র, ও ঠাণ্ডা, ও মধুর। ওকে দিয়ে নেশা হয় না, আরাম হয়। পুরুষের চরিত্রে এটা মস্ত গলদ, কিন্তু মেয়েদের তা আবিষ্কার করতে এত সময় লাগে যে প্রায়ই তার আগেই অতনু স'রে পড়ে। আর মেয়েরা অত-শত বুঝতে চায় না; ওর চেহারা দেখেই ঝাঁপ দেয়, ওর চেহারাতেই ডোবে। ওর কাছে যা পায়, তা-ই কুড়িয়ে নেয় দু-হাতে—বিচার করে না, নিজের মন তৃপ্ত হ'লো কিনা, তাও ভেবে দ্যাখে না একবার। অতনুকে পেয়ে ওদের ভ্যানিটি ঠাণ্ডা

থাকে ; এবং মনের পূর্ণতার চাইতে ভ্যানিটির পরিতৃপ্তি যে ওদের কাছে বড়ো জিনিশ তা আর কে না জানে !

তাই তো গোড়াতেই বলা হয়েছে যে এ-গল্পের নায়ক অতনু নয়, অতনুর চেহারা।

৪

এখানে গল্পের দ্বিতীয় পর্বের শুরু,—কী ক'রে পনেরো বছরের একটি কালো মেয়ের প্রভাব সাবিত্রীরূপিণী কুহেলিকা ভেদ ক'রে আলোর মতো অতনুকে বিঁধলো—তারই ইতিহাস। এই ইতিহাস আমি শুনেছি অতনুর মুখে, আপনারাও তা-ই শুনবেন। একদিন হঠাৎ বিকেল তিনটে নাগাদ ও এসে উপস্থিত। এর আগে ক্রমান্বয়ে দশ-বারো দিন আমরা কেউ ওর দেখা পাইনি। আড্ডায় তো আসেইনি, ওর বাড়ি গিয়েও ফিরে এসেছি, টেলিফোনেও নিরাশ হয়েছি কয়েকবার। যাকগে—ও খারাপ নেই, এ-কথা যখন শুনিনি, তখন ভালোই আছে, সম্ভবত খুবই ভালো আছে, আমাদের অনেকের চাইতেই ওর ভালো থাকার কথা। অন্তত, যে-হতভাগ্য শুধু বন্ধুদের প্রেমোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করার জন্যই জন্মেছে, তার চেয়ে ও যে ভালো আছে, এ-কথা আমার নিজের খুব সহজেই বিশ্বাস হয়েছিলো।

অতনু ব'লে কেউ যে পৃথিবীতে আছে, বা কখনো ছিলো, তা প্রায় ভুলে এসেছি, এমন সময় একদিন শ্রীমান সশরীরে এসে উপস্থিত। তাও আবার জুন মাসের তিনটে বেলায়, কলকাতা যখন পাঁচ ঘণ্টার পুঞ্জিত গরমে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। একটু অবাকই হলাম। বললাম, 'তুমি তাহ'লে বেঁচে আছো? কলকাতাতেই আছো? বিয়ে কবে করলে? না কিএখনো করোনি? নেমন্তন্ন করতে এসেছো?'

অতনু পাখাটা আরো জোরে চালিয়ে দিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো খাটের উপর।

জিগেস করলাম, 'কবে বিয়ে ?'

অতনু বললো, 'সিগ্রেট দাও।'

জিগেস করলাম, 'ক-মিনিট থাকবে? চা খেয়ে যেতে পারবে তো ? না কি—'

অতনু বললো, 'দেশলাই দাও।'

তারপর সিগারেটটি ধরাবার আগে আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে-ঘোরাতে :

'বিভূতি, তোমার কাছে প্রভাত মুখুয্যের ছোটোগল্পের বই আছে ?'

আকাশ থেকে পড়লাম। প্রভাত মুখুয্যে! গল্পের বই! বাংলা বই! অতনু! শুনেছিলাম বটে, অতনু নাকি কবে একবার বাংলায় এম. এ. পাশ করেছিলো, কিন্তু ও যে বাংলা বই পড়ে, ওর সম্বন্ধে এ-হেন খাবাপ ধারণা করবার কোনো কারণ এ-অবধি ঘটেনি। বিশেষত আজকাল! সাবিত্রী বোস তো বাংলার আগে শেখে ইংরিজি, আর ইংরিজির চেয়ে ভালো জানে ফ্রেঞ্চ!

করুণ সুরে বললাম, 'জেনে-শুনে কেন লজ্জা দিচ্ছো, অতনু ? আমি যখন প্রথম গল্প পড়ার স্বাদ পাই, তখনই প্রভাত মুখুয্যে পড়েছি কিনা—এখনো মাথা কাটাতে পারিনি।'

'আছে, তাহ'ল ? গুড! আমাকে এক-এক ক'রে দিয়ো তো সবগুলি।'

'একবারেই নিয়ে যাও না সব!' উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম, 'এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলতে পারবে।'

মূর্খ আমি, ভেবেছিলাম এতদিনে অতনুর বুঝি মাতৃভাষার সাহিত্যের দিকে মন গেছে। প্রভাত মুখুয্যের গল্পের গুণ কোথায়, তা ওকে বুঝিয়ে ছাড়বো ভাবছি, এমন সময়, 'আমার জন্য বই চাচ্ছি না, বললো অতনু। 'মনসামঙ্গল পড়ার পর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বাংলা বই আর ছোঁবো না। ছুঁইওনি।'

আমি কুঁকড়ে এইটুকু হ'য়ে গেলাম। ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'কিন্তু সাবিত্রীর তো প্রভাত মুখুয্যে ভালো লাগবে না। বরং নরেশ সেনের সাইকো-ক্রিমিনলজিক্যাল উপন্যাস—'

অতনু বললো, 'চুপ করো। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছো নাকি? সাবিত্রী—' অতনু সিগারেটের ছাই ঝাড়লো—'সাবিত্রী languid সাহিত্য পছন্দ করে। নরেশ সেন কি languid?'

আমি বললাম, 'না। অন্তত এ-জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'তাছাড়া ওর সময় কোথায়? প্রয়োজনই বা কী? বদলেয়ারের নাম জানলেই যথেষ্ট।'

বদলেয়ারের আমি নাম পর্যন্তই জানি, তাই দ'মে গিয়ে শুধু বললাম, 'হুঁ।'

'বইগুলো,' অতনু বললো, আমার দরকার কেন জিগেস করলে না?'

আমার কাছ থেকে নিয়ে হারিয়ে ফেলবে আরকি। বুঝেছি, আমি আর বাংলা পড়ি, এ ও তোমার ইচ্ছে নয়,' ব'লে আমি বিমর্ষভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

অতনু ঘরের দেয়ালকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'বুলুকে পড়তে দেবো।'

ইহজীবনে এই প্রথম বুলু নাম আমার শ্রুতিগোচর হ'লো। এ-ব্যক্তি আবার কে? অতনুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই বললো, 'বুলু একটি মেয়ের নাম। ও আমাদের—'

কিন্তু এখানে অতনুর ঘরের কথা একটু ব'লে নিতে হয়।

পরিজনের মধ্যে অতনুর এক বিধবা মা। পূর্ববঙ্গে ওদের জমিদারি ছিলো এককালে—এতদিনে তলিয়ে গেছে পদ্মায়। থাকবার মধ্যে মুক্তারাম রো-তে বাড়ি—ওর ঠাকুরদার আমলের, আর ব্যাঙ্কে ওর বাবার কিছু সঞ্চয়, যা, কোনো ভাই-বোন না থাকায়, ওর কপালেই সব জুটেছে। বাড়িটা ওদের দুটি প্রাণীর পক্ষে নিতান্তই বড়ো, তাই ওরা বাধ্য হয়েছে নিচের তলাটা ভাড়া দিতে। অতনু তো অনেক সময়েই বাড়ি থাকে না, এবং সে-সময়টা ওর মা-কে যাতে একেবারে একা না থাকতে হয়, এ-ব্যবস্থার এ-ও একটা কারণ। ভাড়াটা নেহাৎ না-নিলে নয় ব'লেই নেয়; কোনো পরিবার যদি দয়া ক'রে

এমনি এসে থাকতো, তাহ'লেই অতনু সবচেয়ে খুশি হ'তো। ভাড়া নিতে আত্মসম্মানে লাগে ওর। কিন্তু অন্য লোকেরও তো আত্মসম্মান আছে। আব দযা ক'বে ওর দয়া গ্রহণ কবে, এমন লোক যারাও বা আছে, তাদেব বাড়িতে থাকতে দেখা যায না। ভাড়া, তাই, নিতেই হয়। এ পর্যন্তই জানতাম ; ওদেব নিচের তলায় কারা ছিলো বা আছে বা থাকবে, তা নিযে কখনো অনুসন্ধান করিনি। তাই, অতনু যখন বললো, 'বুলু একটি মেযের নাম, ও আমাদেব নিচেব তলায় থাকে,' তখন শুধু বলতে পাবলাম, 'তোমাদেব নিচেব তলায় থাকে ? কিন্তু এব কথা আগে তো কিছু শুনিনি।'

'এরা নতুন এসেছে। এই মাসখানেক। আগেকাব ভাড়াটেরা তো চ'লে গেছে কবেই।'

অতনুব মুখেব ভাব দেখে মনে হ'লো, ও যা বলছে, তা যে ওকে মানায না, ও তা জানে, এবং সে-জন্য ও লজ্জিত, আমাব কাছে মনে-মনে ক্ষমাপ্রার্থী। সিগাবেট ছুঁড়ে ফেলে হঠাৎ ও বলতে আবম্ভ কবলো :

'তোমবা হয়তো মনে কবো, বিভূতি মেযেদেব মন নিযে পিংপং খেলা আমাব নেশা। আমাব পক্ষে প্রতিবাদ কবা সম্ভব নয, কেননা facts বলতে যা বোঝায, তা আগাগোড়া আমাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। নয কি ?'

আমি খাটের কাছে চেযাব টেনে বললাম, 'তা দিচ্ছে।'

'কিন্তু তোমরা যখন আমাকে নিযে ঠাট্টা কবতে, ভুলে যেতে যে নেপথ্যে ব'সে আব-একজন আমাকে—কথা দিযে নয—ব্যথা দিযে বিদ্রূপ করবাব আযোজন কবছে—গ্রীকবা তাকে বলতো নেমেসিস। সম্প্রতি আমাব মন নিযেও খেলা শুরু হয়েছে—এবং সে-খেলা পিংপং নয। তাব চেয়ে মাবাত্মক।'

'তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও,' গম্ভীবভাবে বললাম, 'মেয়েদেব মন জানতে তোমার ঢেব দেরি। আমি বই-টই লিখে থাকি, নারীচরিত্রে আমার অন্তর্দৃষ্টি—' বিনয় ক'রেই বললাম,—'সাধারণেব

চাইতে একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়েরা যখন বলে, "কিছুতেই না," তার মানে, "এখনো না"; যখন বলে, "না," তার মানে, "হ'তে পারে"; যখন বলে, "হয়তো," তার মানে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এই মুহূর্তেই"। সাবিত্রী মুখেই "হ্যাঁ" বলেছে, সুতরাং তার মানে যে কতখানি, তা ভাবতে আমার সাহস হয় না। তবু তুমি নির্ভয় ?'

আমার আরো বলবার ছিলো, কিন্তু অতনুকে আমার কথার গভীরতা উপলব্ধি করবার সময় দেবো ব'লে যেই আমি চুপ করলাম, অমনি ও ফোঁশ ক'রে উঠলো, 'Shut up, fool!'

আমি একটু আহত হ'য়ে বললাম, 'আমার কথা যদি না-ই শুনতে চাও—'

অতনু বললো, 'যেন তুমিই আমার কথা শুনছো!'

আমি বললাম, 'শুনছি না? এতক্ষণ তবে করছিলাম কী?'

'এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে তোমার সাবিত্রী বোস আর নারীচরিত্র আর যত বাজের platitudes নিয়ে। Damn the whole lot! পৃথিবীতে যত রকম লোক আছে, তাদের মধ্যে লেখকরাই ভদ্রসমাজের যোগ্য নয়—ইডিয়টদের কাছে যে-কোনো কথাই তোলো, একটু পরেই ওরা ওদের এলাকায় এসে পৌঁছবে—character বা temperament বা illusion বা এমনি কোনো damned nonsense! কথা, খালি কথা!'

অতনুর পক্ষে এই উষ্মা স্বাভাবিক নয়। আরো অস্বাভাবিক 'damned lot'-এর মধ্যে সাবিত্রীকেও জড়ানো! সন্দেহ হ'লো। ঘোর সন্দেহ। প্রথমটায় বিশ্বাস করা অসম্ভব, পরে দুঃসাধ্য তার পরেও কঠিন।

কিন্তু একেই তো বলে নেমেসিস।

বুলুকে দেখে প্রথম মনে হয় না (অতনু বলতে লাগলো) যে ওর মধ্যে দেখার মতো কিছু আছে। মনে হয় ওর মতো মেয়ে যে-কোনো

সাধারণ বাঙালি ঘরে—কিংবা রান্নাঘরে—মুঠো-মুঠো দেখা যায়; তারা বড়ো হয়, তাদের বিয়ে হয়, তারা গোটাকয়েক শিশুর জন্ম দেয়, তারপর আর তাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু শোনা যায় না। উপরে ওঠার সময় ও আমার চোখে পড়েছে মাঝে-মাঝে; প্রথম-প্রথম এটা ওর পক্ষে বেজায় বেয়াদপি মনে হ'তো। মনে হ'তো ওকে বলি, 'আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবো, তুমি দয়া ক'রে পাশের ঘরে চ'লে যেয়ো; আমার চোখ তোমাকে দেখে পীড়িত হয়।'

অথচ জানতাম যে ওর মা ছিলেন আমার মা-র বাল্যসখী, এবং সেই কারণেই মা ওদের গরজ ক'রে নিচের তলায় আনিয়েছেন, যদিও ওর মা এখন বেঁচে নেই। আছেন ওর বাবা, যিনি কর্পোরেশনে চাকরি করেন—কী চাকরি, তা আমি ঠিক বলতে পারবো না—তবে চাকরি একটা করেন, এবং সেটা কলকাতার কর্পোরেশনেই, এটুকু আমি ঠিক জানি ব'লেই মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক দ্বিতীয় বার বিয়ে করেননি, তাই ঘর-সংসার দেখার জন্য তাঁর বিধবা দিদিকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আর আছে মেয়েটির এক ভাই, বড়ো ভাই, সাংঘাতিক বড়ো ভাই। সে দু-বার বি.-এস. সি. পাশ করার মহান এবং ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে এখন সকালে ডন করে আর বিকেলে বেহালা বাজায়। ওর মনের বাসনা মাইনিং শিখতে বিদেশে যাওয়া, কিন্তু বিধি এমনি বাম যে এই সামান্য অভিলাষও নেহাৎই অর্থাভাবে পূরণ হচ্ছে না। একে দিয়ে পরে আমাদের দরকার হ'তে পারে, তাই এর নাম ব'লে রাখি—অমূল্য। তোমাকে গোপনে বলছি, বিভূতি, আমার সন্দেহ হয়, অমূল্য ছোকরা অ্যানারকিস্ট দলের একজন। কেন, শুনবে? ও ডন করে আর বেহালা বাজায় ব'লে। ডন করাও ভালো, বেহালা বাজানোও ভালো, কিন্তু যে-লোক ডনও করে, আবার বেহালাও বাজায়, তার পকেটে না থাক পেটে বোমা নিশ্চয়ই আছে। পারতপক্ষে তার কাছে ঘেঁষো না। না তার ছোটো বোনের।

আমার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অসীম উদাসীনতা দেখিয়ে মা যা-হোক এদের নিয়ে মহানন্দে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

বিকেলে আমি বাড়ি থাকি না, আর সেই ফাঁকে মা বুলুকে উপরে ডেকে নানা রকম আদরে যত্নে পুরোনো বন্ধুতা সার্থক করেন। পিসিমাটিও জুটে গেছেন মা-র সঙ্গে; দু-জন সমবয়সী হিন্দু বিধবা একত্র হ'লে পারস্পরিক প্রীতিসঞ্চার হ'তে দু-দিনও লাগে না, তা তো জানোই।

রাত্রে আমি যখন খেতে বসি, মা বুলুর গল্প করেন। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজের, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। নবযৌবনা মেয়েদের বিষয়ে এই গতানুগতিক বর্ণনা শুনলেই আমার গা জ্বালা করে, তাই আমি গ্লাশের জলের মধ্যে তাকিয়ে সেখানে সাবিত্রীর ছবি দেখি। মা ব'লে যান, বরিশালে থাকতে বুলুর মা-র সঙ্গে কী-রকম ভাব ছিলো তাঁর—এক ইশকুলে পড়তেন তাঁরা, বুলুর মা ঐ বয়সেই চমৎকার রসগোল্লা তৈরি করতেন, এবং তা খেয়ে তাঁর বাবা (আমার মা-র বাবা) কী ব'লে প্রশংসা করতেন,—বুলুর মা-র বিয়ের রাত্তিরে তিনি (আমার মা) কী ভয়ানক কেঁদেছিলেন, বিয়ের পরেও বহুকাল তাঁরা পত্রবিনিময় করেছিলেন, এবং তাঁর বিয়ে হবার পর বাবা (আমার বাবা) সেই চিঠি নিয়ে কী-সব রসিকতা করেছিলেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি, আরো ইত্যাদি। প্রৌঢ়া মহিলাদের বাল্য-যৌবনের স্মৃতিকথা শুনলেই আমার হাই ওঠে, আমি তাই সাবিত্রীর মুখে শোনা হেরেদিয়ার সনেট আওড়াতে থাকি মনে-মনে। হ্যাঁ, সাবিত্রী সত্যি ফ্রেঞ্চ জানে;—অন্তত, মনে তো হয়।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই আমি চ'টে গেলাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'মা, তোমাকে একশো দিন না বলেছি আমার টেবিলে হাত দেবে না? অমন ক'রে গুছিয়ে রেখেছো কেন? এলোমেলো না-থাকলে আমি কিছু খুঁজে পাই না।'

মা বললেন, 'তোর টেবিলে আমি তো হাত দিইনি। সারা বিকেল নিচেই ছিলাম, সন্ধের পর এসে দেখি, টেবিলের শ্রী ফিরেছে। এ বুলুর কাজ না-হ'য়ে যায় না। দোষটাই বা কী হয়েছে, যার জন্য মেজাজ অমন তিরিক্ষি করতে হয়? ঘরের মধ্যে বারো মাস একটা আস্তাকুঁড় না-থাকলে তোর যদি নিশ্বাস ফেলার অসুবিধে হয়, তাহ'লে

বুলুকে না-হয় বারণ ক'রে দেবো।' 'হ্যাঁ, তা-ই দিয়ো!' ব'লে আমি রাগ দেখিয়ে বই-টই ছড়িয়ে দিলাম সারা টেবিলে। ওঃ—বড়ো যে অনুগ্রহ আমার উপর। লুকিয়ে এসে টেবিল গুছিয়ে দেয়া হয়! কোনদিন হয়তো ফুল-টুলই সাজিয়ে রাখবে। তাহ'লেই হয়েছে।

পরের দিনও বাড়ি ফিরে দেখি, সেই অবস্থা। শুধু টেবিল নয়, শেলফের বই, আলমারির কাচ—সব একবারে ফার্নিচারের দোকানের মতো ঝকঝক করছে। সারা ঘর এমন নিদারুণ পরিষ্কার যে সেটা হাসপাতাল বা বড়ো জোর হোটেল মনে হ'তে পারে—মানুষের বাস করার বাড়ি কিছুতেই না। এমন ঘরে নিশ্বাস নিতে সত্যি অসুবিধে হয় আমার।

আগুন হ'য়ে ডাকলাম, 'মা।'

মা এলেন।

ক্রোধের অতিশয্যে শুধু বলতে পারলাম, 'আবার।'

মা বললেন, 'আজও বুলু এসে গুছিয়ে গেছে।'

গুছিয়ে গেছে। উদ্ধার করেছে আমাকে।

—এ-সব কাজে ওর ভারি শখ; এসেই বললে, "কী নোংরা হ'য়ে আছে টেবিলটা। গুছিয়ে রাখবো, মাসিমা?" আমি কিছুতেই বারণ করতে পারলাম না, পারবোও না। করতে হয় তুমি নিজের মুখে কোরো।' ব'লে মা গম্ভীর হয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন।

মা যতই গম্ভীর হোন—আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—কালই আমি মেয়েটাকে দু-একটা কথা না-শুনিয়ে ছাড়ছি না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় রোজই তো দেখি ওকে—ওদের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকবারই দেখি। কী যে করে ও সেখানে দাঁড়িয়ে, ভগবান জানেন। এ ছাড়া বাড়িতে আর কি জায়গা নেই ওর দাঁড়াবার? যা-ই হোক, কাল ওকে···

কিন্তু এমনি আমার মন্দ বরাত, পরদিন সকালে যখন বেরোচ্ছি, ওকে দেখলাম না। তাতে রীতিমতো রাগ চড়লো। আজকেই ওর এমন কী কাজ পড়লো যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না?

আর আজই যদি না পারলো, তবে এ-ক'দিন রোজ দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কী? আর, মজা এই, যে তার পরেও বার দু-তিন যাওয়া-আসা করলাম, কিন্তু একবারও দেখতে পেলাম না ওকে। মনের ঝালে নিজের মনেই জ্বলতে লাগলাম।

সেদিন বিকেলেও সাবিত্রীর কাছে যাবো—কোনদিনই বা না যাই। কলেজ স্ট্রীটের মোড় অবধি হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি নেবো—পুরোনো বইয়ের দোকানে একটু থেমেছি, এমন সময় ছাত্রাবস্থার এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা। লোকটি একটি boor and bore and all that; পৃথিবীতে এ-শ্রেণীর লোকই বেশি; পথে-ঘাটে, ট্রেনে-স্টীমারে, হোটেলে-থিয়েটারে—সর্বত্র এর জাত-ভাই ওৎ পেতে আছে, সুবিধে পেলেই দুর্বহ ক'রে তুলবে তোমার জীবন। লোকটির নামও আমার মনে ছিলো না, কিন্তু সে শকুনির মতো ঝুপ ক'রে আমার ঘাড়ের উপর পড়লো, এবং কোনো ওজর-আপত্তি না-শুনে আমাকে টেনে নিয়ে গেলো দিলখোশ ক্যাবিনে। শেষ মুহূর্তে আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত আত্মীয়কে অবিলম্বে দেখতে যাওয়ার অনিবার্যতা বিষয়ে কী-সব বিড়বিড় করলাম—কিন্তু সে-সব তার কানেই বোধহয় ঢুকলো না—'মেনু' নির্বাচনে এমনি সে ব্যাপৃত ছিলো। নিরুপায় হ'য়ে চা খেতে হ'লো—অন্তত, খাওয়ার ভাণ করতে হ'লো—for old acquaintance' sake। আমি তো কষ্টেসৃষ্টে কয়েক চুমুক দিয়েই চুপ, কিন্তু লোকটা পট্যাটো চপ থেকে পুডিং পর্যন্ত কী যে খেলো আর না খেলো, তা জানি না। ভদ্রতার খাতিরে ব'সে থাকতে হ'লো আমাকে—শুনতে হ'লো তার সাহিত্যালাপ—সাহিত্যালাপ—ye gods! মুক্তি পেলাম সলিড চল্লিশ মিনিটের পর;—আর দু-মিনিট হ'লেই আমি বোধহয় চায়ের পেয়ালাতেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলতাম।

বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশে মেঘ করেছে। পুরোনো বইয়ের দোকানে ম্যানগানের কবিতার বই দেখে এসেছিলাম; কিনতে গিয়ে দেখি, পকেটে একটি পয়সা নেই। ব্যাগ নিয়েই বেরোইনি। ভাগ্যিশ

এখনই ধরা পড়লো! কিন্তু কী আপদ! একেই দেরি হ'য়ে গেছে, তার উপর আবার বাড়ি যেতে হবে। অদৃষ্টের উপর বড্ড রেগে গিয়ে হনহন ক'রে পা চালালাম—এদিকে বৃষ্টিও বুঝি এলো।

তুমি তো জানো, বিভূতি, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই সামনে আমাদের বারান্দা, সিঁড়ি পেরিয়ে ঘরে যেতে হয়। তিন লম্ফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ধাঁ ক'রে ঘরে ঢুকেই আমি যা দেখলাম, তাতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'লো। কিন্তু, মনে রেখো, তিন-চার সেকেণ্ডের বেশি দাঁড়িয়ে ছিলাম না। ঐ অল্প সময়ে আমি যা দেখে নিলাম, বিভূতি, তা তোমার কাছে বর্ণনা করতে অনেক বেশি সময় নেবে।

মেঝেতে ব'সে (মানে, মেঝের উপর—পাটি বা মাদুর কিছু না-বিছিয়ে) মা চুল বেঁধে দিচ্ছেন একটি মেয়ের। মেয়েটি বসেছে পা দুটি পাশাপাশি রেখে হাঁটু উঁচু ক'রে, হাঁটুর নিচে হাত দুটি এসে মিলেছে—আঙুলের সঙ্গে আঙুল জড়ানো। এক হাতে একটিমাত্র রুলি। কোলের উপর এলিয়ে স্তূপ হ'য়ে প'ড়ে আছে আঁচল। গায়ে পাৎলা শাদা ব্লাউজ, মাথাটি একটু পিছনে হেলানো ব'লে গলা আর থুৎনি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে। কালো চুল ছড়িয়ে আছে কোমর পর্যন্ত—ঘাড়ের কাছে একটি গোছায় আঁট ক'রে বাঁধা। সেখানটায় হাত রেখে মা উপর থেকে নিচের দিকে চিরুনি টানছেন। এত যে আমার চোখে পড়েছে, তখন তা বুঝতে পারিনি, পরে ভেবে-ভেবে মনে করেছি সব। তখন, হঠাৎ দেখামাত্র, আমার মনে পড়লো কার যেন আঁকা Circeর একটি ছবি, বসার ভঙ্গি সেই রকম, তেমনি ছিপছিপে শরীর, কালো চুল,—হেলানো মাথা—গলা, থুৎনি—থুৎনিতে এত রূপ থাকে কখনো আগে জানতাম না। রং কালো মেয়েটির; কালো, মানে নির্মল শ্যামল। মনে রেখো, বিভূতি, তিন কি চার সেকেণ্ড মাত্র আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেবে দেখছি, চারের চাইতে তিন সেকেণ্ডই সম্ভব।

আমাকে দেখে মা বললেন, 'কী রে? ফিরে এলি?'

আমি ঘরে গিয়ে দেরাজ টেনে টাকা নিলাম, দেরাজটা আর বন্ধ করারও সবুর সইলো না। বেরিয়ে আসতেই মা বললেন :

'এলিই যখন একটু না-হয় ব'সে যা। বৃষ্টি আসছে তো।'

'আসুক—আমার সময় নেই।'

বললাম কিন্তু একটু না-দাঁড়িয়েও পারলাম না, আড়চোখে আর-একবার না তাকিয়ে পারলাম না। এই ফাঁকেই আঁচল তুলেছে গায়ে, প্রায় চাদরের মতো জড়িয়ে নিয়েছে। এবার আর ওকে Circeর ছবির মতো লাগলো না কিন্তু মনে হ'লো ছবিটা অন্য রকমও আঁকা হ'তে পারতো।

কোনো মেয়ের দিকে তুমি যতই আড়চোখে তাকাও, কী ক'রে যেন সে বুঝেই ফেলে। বুলুও বুঝলো। এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলো যাতে ওর একটা কান এবং একটুখানি ঘাড়ের বেশি আমি আর দেখতে পেলাম না।

'এই আমাদের বুলু। ভারি দুষ্টু, টেবিল গোছায়। তা তোমার যা বলবার আছে এখন বলতে পারো ওকে। বুলু, অতনু তোকে বকবে।'

বুলু আমার দিকে একটুখানি তাকাতে গিয়েই এমন টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো যে বেচারার জন্য কষ্টই হ'লো আমার।

এ অবস্থায় কিছু না-বলা অস্বস্তিকর, তাই আমিও অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন আমার সময় নেই মা। বেরোচ্ছি—' ব'লে আমি আর-একবার পা বাড়ালাম, কিন্তু মা বললেন, 'ওরে, বৃষ্টি যে এসে গেলো!'

আর সত্যি ঠিক তখনই ঝুপঝুপ ক'রে বৃষ্টি নামলো। কিন্তু প্রিয়া যার উৎসুক হৃদয়ে প্রতীক্ষমানা, বৃষ্টিতে তার ভয় কিসের। একটু না-হয় ভিজবো—না-হয় ট্যাক্সি আনাই। তা-ই আনাবো কিনা ভাবতে লাগলাম, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। আশ্চর্য, শুধু ভাবলামই।

বুলু মৃদুস্বরে বললো, 'আজ আমি যাই, মাসিমা।'

'এই তো হ'য়ে গে'লো!' মা ক্ষিপ্র আঙুলে বিনুনি করতে লাগলেন।

বুলু আবার বললো, 'বাবা হয়তো আপিশ থেকে—'

মা ধমকালেন, 'চুপ কর তো।'

এদিকে বৃষ্টির মনে বৃষ্টি হচ্ছেই।

আমাব দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন মা, আমার তেমন ভালো লাগলো না হাসিটা। বললেন, বুলু, শোন, টেবিলে বইপত্র ছত্রখান হ'যে ছড়িযে না-থাকলে অতনু কিছু খুঁজে পায় না—'

আমি ডাকলাম, 'মা!'

'তোর হয়তো বিশ্বাস হ'লো না শুনে, কিন্তু সত্যি নাকি তা-ই। তাই তো আমি কক্‌খনো ওর টেবিল গোছাতে যাই না।'

এবার আবো লাল হ'লো বুলু।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—'না, না, তেমন কিছু না—ভালোই তো —মানে, মাঝে-মাঝে গোছানো টেবিল মন্দ কী এমন।'

'ও, এখন ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে!' মা হাসলেন। 'না বে, বুলু, তুই ওর টেবিলে আব হাতই দিসনে; ও-সব ভদ্রতাব কথায় বিশ্বাস কী। পবে আমাব উপর তম্বি না করেছে তো কী বললাম!'

'আমি আগে জানলে—'

কিন্তু বুলুব কথায় তক্ষুনি আমি বাধা দিলাম। 'সত্যি মা— মিছিমিছি একজনকে—'

মা বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওবে, জলটা বুঝি ধবলো। তুই না কোথায যাচ্ছিলি?'

যাচ্ছিলাম? কোথায়? হ্যাঁ, সাবিত্রীর কাছে। হঠাৎ—এক মুহূর্তের জন্য—মনে হ'লো যেন সাবিত্রীকে দশ লক্ষ বছর ধ'রে দেখছি, এখন একটু বিরাম চাই। মনে বেখো, বিভূতি, মুহূর্তের জন্যই ও-কথা মনে হ'লো আমার; তারপরেই সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু বৃষ্টিটারও কী মাথা-খারাপ! হুশ ক'রে থেমেই যদি যাবে, ঝুম ক'রে নামলোই বা কেন। আশ্চর্য! এত অল্প

সময়ে বৃষ্টি থামতে আর আমি দেখেছি ব'লে মনে পড়লো না। আর তাছাড়া, বেশ খানিকটা বৃষ্টি হ'লে বাঁচতো সবাই—যা গরম যাচ্ছে ক-দিন! এতে আমার অবশ্য ব্যক্তিগত সুবিধে হ'লো, কিন্তু মেঘের মতো মহানুভবের তো সকলের কথাই ভাবা উচিত? এ-রকম ফাজিল বৃষ্টিতে রাগ হয় না?

সাবিত্রী সেদিন কথার ফাঁকে-ফাঁকে বারে-বারেই বলছিলো, 'But you aren't listening, mon cher!' ওর সব কথার মধ্যে—আমি যে কিছু শুনছি না, ওর এই অভিযোগই আমি বার-বার শুনছিলাম। আশ্চর্য!

এক হিশেবে, (অতনু ব'লে চললো) বুলুর মতো মেয়ে যে আমাকে অভিভূত করবে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক, এমনকি, অনিবার্য। দু-পক্ষে যখন টগ-অব-ওঅর চলতে থাকে, তখন খানিকক্ষণ খুব জোরে টেনে রেখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বিপক্ষ দ্বিগুণ বেগে উল্টো দিকে ছিটকে পড়েই। যারা বাঙালি ঘরের সাধারণ মেয়ে দেখে অভ্যস্ত, তাদের কাছে বুলুর কোনো আকর্ষণ নেই। তারা সত্যি বিশ্বাস করে যে যে-কোনো রান্নাঘরে মুঠো-মুঠো রত্নর দেখা মেলে। বোকারা এটাও বোঝে না যে তা-ই যদি হ'তো, তাহ'লে আমরা সে-সব রান্নাঘরেরই স্যাৎসেতে মেঝেতে কৌচার খুঁট বিছিয়ে শুয়ে পড়তাম। আর নড়তাম না।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে-রকম মেয়েদের সঙ্গে আমার মেলামেশা, যাদের প্রতিনিধি—এবং যোগ্য প্রতিনিধি—সাবিত্রী বোস, তাদের সঙ্গে বুলুর কিছুই মিল নেই। তাই সে আমার কাছে এসেছে অপরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে, অভিনবত্বের কৌতূহল নিয়ে। ও অন্য দেশের—এমনকি, অন্য গ্রহের—মানুষ; ওর চালচলন আমি ঠিক বুঝি না। ওর চোখ যে-ভাষা বলে, তা কোনোকালে হয়তো জানতাম, কিন্তু অনভ্যাসে ভুলে গেছি। ওর সঙ্গে যে-খেলা খেলতে হবে, তার নিয়ম-কানুন জানা নেই আমার, তাই ভয় করে পাছে

ভুল করি। তাই তো, ও হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যার মুখের দিকে একবারেই সোজা তাকাতে পারিনি—প্রথমটায় কোথায় যেন বেধেছে। ও হচ্ছে প্রথম মেয়ে, যাকে চোখে দেখলে আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করেছে—সত্যি করেছে। উপন্যাসের বাইরেও যে কোথাও বুক টিপটিপ করে তা আমি এই প্রথম জানলাম।

বুলু হচ্ছে প্রথম মেয়ে, (অতন্ত ব'লে চললো), যাকে আমি মনে-মনে আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করেছি। কথাটা কবিত্ব হ'লেও সত্য। মানে, সাবিত্রী বোস (প্রতিনিধি হিশেবে) কিছুতেই তারার সঙ্গে উপমেয় নয় ; কারণ, আকাশের তারার চাইতে ও অনেক বেশি উজ্জ্বল। ও তার সার্চলাইট ; ওর আলো ঘুরে-ঘুরে চারদিক থেকে পড়বে তোমার উপর ; ওর দীপ্তি তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে—তোমার মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, হৃদয়ের হৃদয়ের মধ্যে। সম্পূর্ণ ক'রে দেখে নেবে তোমাকে, বুঝে নেবে, কিছুই তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তোমার চোখ দেবে ধাঁধিয়ে, স্বাভাবিক দৃষ্টি নেবে হরণ ক'রে—অন্য দিকে তাকালে তুমি অনেকক্ষণ আর-কিছুই দেখতে পাবে না। সাবিত্রী রাতকে দিন ক'রে দেয়, দুই হাতে অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে নিয়ে চলে—কোথায় লাগে ওর কাছে আকাশের তারা।

কিন্তু বুলুকে যেদিন তুমি দেখতে পাবে—সত্যি দেখতে পাবে—তোমার জীবনের সে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার। সেদিন তুমি মনে-মনে বলবে, এ-মেয়েটি আকাশের তারা, সন্ধ্যার তারা, সন্ধ্যাতারা। তেমনি নরম এর আলো—ঘুমের মতো, মোমের আলোর মতো নরম। তেমনি ঠাণ্ডা দেখলেই সন্ধ্যার শিশির মনে পড়ে। প্রায় তেমনি সুদূর। ওকে কোনোদিন হয়তো হাতের মুঠোয় পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভব ব'লেও বিশ্বাস যেন হয় না। ও কোনো প্রশ্ন করে না, শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। ওকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, শুধু চোখ ভ'রে দেখতে হয়। কবিরা যে তারা বলতেই প্রিয়া বোঝেন, আর প্রিয়া বলতেই তারা, তার অর্থ আজ বুঝতে পারছি।

তুমি এ-সব কথা বলতে কিনা, বিভূতি, তা তুমিই জানো, কিন্তু আমি বলেছিলাম। ওকে দেখার পর থেকে একটি কবিতা বার-বার মনে পড়েছে আমার, সেই একটি তারার একটিমাত্র কবিতা—

> What matter to me if their star is a world ? •
> Mine has opened its soul to me , therefore I love it.

৫

চায়ের পরে আমি বললাম, 'হায় অতনু তোমার কপালে এ-ও ছিলো।'

অতনু ফ্যাকাশে হেসে বললো, 'এ আর কী ? শোনোই।'

শুনলাম। আপনারাও শুনুন।

তারার উপমা মনে রেখো, বিভূতি, (অতনু বলতে লাগলো , কাজে লাগবে। তারাকে শুধু দেখেই তৃপ্তি ; ওকেও চোখে দেখবো, এর বেশি উচ্চাভিলাষ আমার প্রথমটায় হয়নি। ওকে চোখে দেখছি একটা অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ওর দিকে তাকালে শরীর তোমার শীতল হবে, বিভূতি।

তাই যতবার সম্ভব দেখবার চেষ্টা চলতে লাগলো। ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ, কাজে ততটা নয়। সাধারণ বাঙালি ঘরের কাণ্ড-কারখানা তো জানো না, বিভূতি—না, তুমি তো জানোই ; জানোই তো, ওদের মনে সন্দেহ আছে যে মেয়েরা কর্পূর, বাইরে একটু রেখেছো কি একদম উবে যাবে। আমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিয়ে জয়ী হ'তে শিখেছি, কিন্তু এখানে তা কোনো কাজেই লাগে না, কারণ বাধা আসে অন্য দিক থেকে। ও-দিক থেকে আদৌ যে বাধা আসে, এবং সে-বাধা যে এই ধরনের হয়, এতদিন আমি তা জানতাম না। প্রায় বিপদে পড়লাম।

সারা বাড়িতে শুধু একটি জায়গা আছে, যা দুই পরিবারের এলাকার মধ্যেই পড়ে ; সিঁড়ির গোড়া থেকে বাইরের দরজা পর্যন্ত প্যাসেজটুকু। ওখান দিয়ে যেতে ওদের দরজা পেরোতে হয়, এবং আগেই বলেছি, সেই দরজার কাছে বুলুকে প্রায়ই দেখা যায়। এখন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'লো দিনের মধ্যে অগুনতিবার সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করা—মানে, বাইরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে আসা। মিছিমিছি এতবার যাওয়া-আসা ভালো দেখায় না (দেখতে পাচ্ছো, বিভূতি, কোনটা ভালো দেখায় কিংবা দেখায় না, সে-বিষয়ে আমার টনটনে জ্ঞান হয়েছে আজকাল), তাই আমি গলির মোড়ের মুদি-দোকান থেকে এটা-ওটা নিজের হাতেই আনতে লাগলাম। মা তো অবাক!

মা আরো অবাক হলেন, যেদিন আমি খড়ম প'রে বাড়িতে চলাফেরা শুরু করলাম। মা-কে বললাম, 'আমার এক বন্ধুর খড়মের ফ্যাক্টরি আছে। সে উপহার দিলো—দেখি প'রে।'

মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খড়মের ফ্যাক্টরি!'

'মানে, দোকান আরকি।' ব'লে আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিলাম।

ফ্যাক্টরিই হোক আর দোকানই হোক, খড়ম পরা আমার সমানে চলতে লাগলো। অত্যধিক উৎসাহে খটখট করতে-করতে নিচে নামি। আগে থেকে নোটিস দিই—বুঝতেই তো পারছো। এবং এ-কৌশল কাজেও লেগেছে। কোনোবারই কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করার ক্লেশ বৃথা যায় না। বুলু ঠিক দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়—চোখোচোখি হয়—আমার বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে। আমি তোমাকে বলতে পারি, বিভূতি, বুলু খড়মের খটাখটের জন্য কান পেতে থাকে। ও যদি স্কচ মেয়ে হ'তো, তাহ'লে হয়তো গুনগুন ক'রে গান গাইতো :

> Tho' father and mither and a' should' gae mad,
> O whistle, and I'll come to ye, my lad

আমাদেব দেশে এ-উদ্দেশ্যে শিষ দেযা রীতিবিরুদ্ধ, তাই খড়মেব শবণ নিতে হ'লো। তাছাডা, শিষ দিতে আমি পাবিও না।

এত সব কাণ্ড-কাবখানা কবতে হ'লো, সহজভাবে মেলামেশা কবা সম্ভব নয ব'লে। বিকেলে যে ওকে আমাদেব ঘবে স্বচ্ছন্দে যেতে দেযা হয, তাব কাবণই এই যে আমি তখন বাইবে থাকি। দু-একদিন বাড়ি থেকে না-বেবিযে দেখেছি, বিভূতি, বুলু আসেনি, কি এসেই চ'লে গেছে—এবং মা-ও নিচে গেছেন সঙ্গে। তখন বাধ্য হ'যে আমাকে বেবিযে পডতে হয, বাধ্য হ'য়েই যেতে হয সাবিত্রীব কাছে।

ক্রমে আমি উপলব্ধি কবলাম যে আকাশেব তারার সঙ্গে হযতো বুলুব কিছু পার্থক্য আছেও বা। ওকে চোখে দেখাই কম কথা নয, কিন্তু ওব সঙ্গে আলাপ কবা তা—হযতো—হযতো তাব অর্থ আবো অনেক বেশি। দৃষ্টিবিনিময়ে তবু কিছু শান্তি ছিলো, কিন্তু বাণীবিনিমযের বাসনা হৃদয়ে যখন বলবতী হ'লো, তখনই সম্যকরূপে বিপন্ন হলাম।

একদিন আমি সকাল থেকে গ্রামোফোন চালাতে লাগলাম। প্রতি মুহূর্তে আশা কবছি, এখনই বুলু এসে পড়বে, হঠাৎ মনে হ'লো যে নিচে থেকেও তো গ্রামোফোন শোনা যায। নিশ্বাস ফেলে শেষ না-হ'তেই বেকর্ড তুলে নিলাম। এখানটায তুমি সত্যিই বলতে পাবো, বিভূতি, 'হায অতনু, তোমাব কপালে এ-ও ছিলো!'

বেবোবার মুখে, কি বাড়ি ফিরে উপবে যাবার আগে, একটু দাঁড়িযে ওব সঙ্গে আলাপেবও চেষ্টা কবেছি দু-চাব বাব—কী আলাপ, তা আব না-ই শুনলে, বিভূতি। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই—যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হযেছেন সেই অ্যানাবকিস্ট দাদা—এসে এক গাল হেসে আমাব সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিযেছেন। আর আলাপও কি যেমন-তেমন! ব্রডকাস্টিং-এ সভ্যতাব কতখানি উন্নতি হয়েছে—অবশ্য যদি একে উন্নতি বলা যায; মুসোলিনিব সঙ্গে নেপোলিয়নেব

তুলনামূলক সমালোচনা ; নেপচুনের আলো পৃথিবীতে প্রায় পৌছয় ক-বছরে (বা ক-শো, বা ক-হাজার বছরে—সংখ্যাটা আমার ঠিক মনে নেই।)···হে ঈশ্বর!

ছোকরার এ-সব সদালাপের কারণ যে আমার প্রতি দুর্নিবার প্রীতি নয়, তা অবশ্য বোঝা শক্ত নয়। বুঝলে, বিভূতি, আমার এই চেহারা আমার কাল হ'লো। এই চেহারা নিয়ে অ্যানারকিস্ট ছোকরারও ভয় আছে। অবশ্য এও সম্ভব, বুলু যেপ্রথম থেকেই দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো, তাও আমার চেহারাটাই দেখতে, আমাকে দেখতে নয়। আপাতত তাতে আমার সুবিধেই হ'লো, তবু মরার পর কখনো যদি স্বর্গে যাই, এবং সেখানে যদি ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎটা হ'য়েই যায়, তাহ'লে আমার চেহারা নিয়ে এমন বিশ্রী বাড়াবাড়ি করার জন্য খুব একচোট ঝগড়া ক'রে নেবো প্রথমেই। চেহারাটা সাধারণরকম হওয়াই ভালো, তাহ'লে ভালোবাসা একেবারে সোজাসুজি পৌছয়—অবশ্য, তোমার মতো অতটা সাধারণ না-হ'লেও আমার আপত্তি নেই, বিভূতি।

এতদিনের মধ্যে আজ সকালবেলা ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হ'লো—মানে, আলাপ বলা যায়, এমন। আশ্চর্যের বিষয়, ও নিজেই এসেছিলো। ওর সংকোচ কমেছে ; কথায়-কথায় আর লাল হ'য়ে ওঠে না। বরং, কথায়-কথায় হাসে। কখনো বা চেঁচিয়েও হাসে। ওর এই উচ্চহাসি আমি মুখস্থ ক'রে রেখেছি, ইচ্ছে করলেই শুনতে পাই। অমন হাসি জীবনে তুমি শোনোনি, বিভূতি।

এসে জিগেস করলো, 'আপনার কাছে কোনো বই আছে?'

ওকে দেখে হঠাৎ আমি কথা বলতে পারলাম না ; কিন্তু একটু পরেই আত্মস্থ হ'য়ে বললাম, 'বই ছাড়া কিছুই নেই, বলতে পারো। তুমি তো দেখেছো।'

'দেখেছি। কিন্তু ইংরেজি তো। কোনো বাংলা বই নেই—যা পড়া যায়?'

হঠাৎ মাতৃভাষার প্রতি অসীম মমতা অনুভব করলাম। সত্যি, আমরা যদি বাংলা বই না কিনি, কে কিনবে? আর লোকেরা বই না-কিনলে লেখকদেরই বা চলবে কেমন ক'রে।

উঠে শেলফের দিকে গেলাম। 'খুঁজে দেখি।'

বুলু বললো, 'আমি অনেক খুঁজেছি, নেই। একখানাও নেই।

আমি বললাম, 'তুমি চাও? পড়তে চাও?'

'খুব।'

আমি হঠাৎ জিগেস করলাম, 'অমূল্যবাবু কোথায়?' জিগেস করাটা বেখাপ্পা হ'লো বোধহয়।

'দাদা ব্যারাকপুরে বেড়াতে গেছেন। ও-বেলা ফিরবেন।'

ও, তাই।—যাক!

বুলু টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমিও টেবিলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।—'বোসো।'

'না, বসবো না।'

'বোসো না!'

'না—এক্ষুনি যেতে হবে। পিসিমা—'

'থাক, না-ই বসলে। আচ্ছা, স্কুলে পড়ো না তুমি?'

'আগে পড়তাম। তারপর মা—'

'বুঝেছি। তোমাকে ঘরের কাজকর্ম করতে হয় বুঝি খুব?'

'খুব আর কী—পিসিমাই করেন।'

'রান্না করো?'

'রাত্তিরে করি মাঝে-মাঝে; পিসিমা বিধবামানুষ—'

'বুঝেছি। ভালো রান্না করো?'

'আপনি জানলেন কী ক'রে?'

'জানি না ব'লেই তো জিগেস করছি।'

বুলু লজ্জা পেয়ে চুপ করলো।

কথা বলায় আমার নৈপুণ্য লক্ষ্য কোরো, বিভূতি। পাছে বুলু

এখনই চ'লে যায়, আমি চট ক'রে আবার কথা পাড়লাম।—'স্কুলে পড়তে ইচ্ছে করে না তোমার ?'

'খুব।'

'স্কুলে না-প'ড়লেও অনেক কিছু শেখা যায়। যায় না ?'

'খুব।'

'খুব' কথাটাব অতি-ব্যবহার লক্ষ্য কোবো, বিভূতি। ওর মুখে কথাটাব মানে অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু তা বুঝতে হ'লে আবার ওব মুখেই শুনতে হয।

'তুমি শেলাই জানো নিশ্চয়ই ?'

'শেলাই কে না জানে !'

'ছবি আঁকতে ?' (আমাব বাক্‌নৈপুণ্য লক্ষ্য কোরো, বিভূতি, একটু ফাঁক যেতে দিচ্ছি না।)

'না।'

'একটুও না ?'

'একটুও না।'

'আমার আলমারিতে যে-সব ছবিব বই আছে, দেখেছো ?'

'দু-একটা দেখেছিলাম একদিন।'

'কেমন লাগে তোমার ?'

'বড়ো বেশি—' বুলু হঠাৎ থেমে গেলো।

'বুঝেছি।' (আশা করি, বিভূতি, তুমিও বুঝেছো।)

বুলু ছেঁড়া জায়গায় চমৎকাব তালি দিলো, 'ছবি খুব ভালো, কিন্তু গল্পের বই আবো ভালো।'

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, 'যাঁরা ছবি আঁকেন, বই লেখেন, তাঁদের কী অদ্ভুত ক্ষমতা ভাবতে পাবো ? আচ্ছা বুলু, কোনো দেবতা যদি তোমাকে একটি—শুধু একটি—বব দিতে চান, তাহ'লে তুমি কী চাও ?'

বুলু মাথা নিচু ক'রে চুপ।

'এমন-কোনো সাংঘাতিক ইচ্ছে নেই তোমার ?'

বুলু এবার পালানো জবাব দিলো, 'কোনো দেবতা আসবেনও না, বর চাইতেও হবে না।'

'কিন্তু তবু—ধরো যদি আসেন।'

এমন সময় নিচে থেকে পিসিমার ডাক এলো—'বুলু!'

'আমি যাই—' বুলু ত্রস্ত হ'লো।

'আচ্ছা, এসো। তোমার জন্য বিকেলে বই নিয়ে আসবো আমি।'

আর এইজন্যই বিভূতি, তোমার কাছে আমার আসা। একবার ভাবলাম, বই কিনেই দিই, কিন্তু আনকোরা নতুন বই দেখে পাছে কেউ কিছু—বুঝলে না? সমীচীনতার জ্ঞান আমার বড়োই টনটনে কিনা আজকাল। এক-একখানা ক'রে দেবো, প্রত্যেকটি বই দিতে এবং ফেরৎ নিতে—বুঝলে না? দাও বই। যাই।

আমি বললাম, 'বই দিচ্ছি, কিন্তু সাবিত্রী?'

অতনু বললো, 'সাবিত্রীকে বলেছি, আমি বাংলা শব্দতত্ত্ব নিয়ে বই লিখছি—চাইকি এর জোরে পি-এইচ. ডি.টাও পেয়ে যেতে পারি। তাই অত ঘন-ঘন দেখাশোনা আর সম্ভব হবে না। করুণ ক'রেই বলেছি কথাটা। বিকেলে বাড়ি থেকে না-বেরোতে পারলেই বাঁচি, কিন্তু একেবারে ঘরে ব'সে থাকাটাও আশোভন, তাই গোলদিঘির দিকে একটু ঘোরাঘুরি ক'রে সন্ধে উৎরোতেই ফিরে আসি। এসে বইপত্র ছড়িয়ে গম্ভীর মুখে বসি। পি-এইচ. ডি-র কথাটা মা-কেও বলতে হয়েছে কিনা।'

আজকাল অতনুর দেখা প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে; দু-তিন দিন পর-পরই একখানা বই ফিরিয়ে দিয়ে আর-একখানা নিয়ে যায় এসে; বেজায় খুশি। অজস্র কথা বলে; কেউ যখন আশা করে না, ঠিক সেই সময়ে অদ্ভুত সব ঠাট্টা করে, সুকুমারের সঙ্গে রসিকতায় টেক্কা দেয়। বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই আড্ডা আমাদের জমাট। ওর মধ্যে এই চাঞ্চল্য একেবারে

অপূর্ব। ওর নদীতে এতকাল স্রোত ছিলো না; কিন্তু হঠাৎ আকাশের সব কোণ থেকে জেগে উঠেছে হাওয়া, তাই তো জলে এত ঢেউ।

৬

বুলুর সঙ্গে অতনুর আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। কোনো দেবতা এসে যদি ওকে একটিমাত্র বর দিতে চান, তা'হ'লে বুলু কী চাইবে, তা ও মনে-মনে ঠিক ক'রে ফেলেছে। এখন দেবতাটি এলেই হয়।

সুবিধে পেলেই বুলু উপরে এসে অতনুর সঙ্গে খানিক গল্প ক'রে যায়। সুবিধে পেলেই—মানে, ওর অ্যানারকিস্ট দাদা (অবশ্য ভদ্রলোক আসলে অ্যানারকিস্ট না-ও হ'তে পারেন, কিন্তু হ'তেও তো পারেন—কে জানে?) বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই। দাদাকে ওর বড়ো ভয়। এতেই বোঝা যায়, কোনটা ভালো দেখায় আর কোনটা দেখায় না, এ-বিষয়ে ওরও কম টনটনে জ্ঞান নয়। আমরা যদি পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করতাম, তা'হ'লে বলতাম যে বুলুর মনেও যে পাপ আছে, এ-ই তার প্রমাণ।

বুলু সবে যৌবনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে; এখন পর্যন্ত ও শিখেছে শুধু অনুভব করতে, বিশ্লেষণ করতে শেখেনি। ও যাকে ভালোবাসবে, তাকে শুধু ভালোই বাসবে, যাচাই করবে না; দূর থেকে পুজো করবে, কাছে এসে পরখ করবে না। তাই তো অতনুকে ও প্রথম যেদিন দেখলো, বুকের মধ্যে ওর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠে বললো, 'কী সুন্দর!' তাই তো, অতনু প্রথম যেদিন কথা বললো ওর সঙ্গে, ওর বুকের মধ্যে পাখি উঠলো গান ক'রে, আর সেই পাখির গান শুনে-শুনে রাত ওর ভোর হ'য়ে গেলো, সারা রাত ঘুম এলো না।

একদিন অতনু জিগেস করলো, 'বুলু, তুমি চা খাও?'

'খুব!'—একটু থতমত খেয়ে—'খুব খেতাম।'

'এখন ?'

'এখন ছেড়ে দিয়েছি। আর তো কেউ খায় না। মা খুব চা খেতেন কিনা—'

'বুঝেছি। তোমার দাদাও খান না চা ?' (অতনু এক ফাঁকে ওর দাদার কথা পাড়বেই।)

'দাদা ? চা খাবেন!' বুলু এমনভাবে চুপ করলো যেন এর চেয়ে আজগুবি, অসম্ভব কথা আর-কিছু হ'তে পারে না।

'চা না-খেয়ে কষ্ট হয় না তোমার ?'

'প্রথমে হ'তো। এখন না খাওয়াই অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'

'তুমি আজ বিকেলে আমার সঙ্গে এসে চা খেয়ো।'

'একদিন চা খেয়ে আর কী হবে।'

'তবে রোজই খেয়ো।'

'তা নয়। আমি বলছিলাম, অভ্যেস যখন গেছে, তখন দু-একদিনের জন্য আর—'

'দু-একদিন কেন ? বললাম যে, রোজই খেয়ো।'

'রোজ ? রোজ হ'লেই বা ক-দিন আর ?' কথাটা ব'লে ফেলেই বুলু লজ্জা পেলো।

অতনু সেটা লক্ষ্য না-করার ভাণ ক'রে বললো, 'যে-ক'দিন হয়। আজ আসবে বিকেলে ?'

বুলু চুপ।

'কেউ বকবে তোমাকে এলে ?'

'বকবে কেন ? কক্‌খনো না!' বুলুর প্রতিবাদের তীব্রতাই ওকে ধরিয়ে দিলে। যেন ওর কথাই বিশ্বাস করেছে, এই ভাবে অতনু বললো, 'তাহ'লে আসবে না কেন ?'

বুলু একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আচ্ছা, আসবো।'

এলোও। এসে নিজেই তৈরি করলো চা। অতনুর টী-সেট-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো; অতনু চায়ে মাত্র এক চামচে চিনি খায় দেখে ঘোরতর বিস্ময় প্রকাশ করলো; কিন্তু টেবিলে বসতে

রাজি হ'লো না কিছুতেই। তা না-ই বা হ'লো, বারান্দায় মাদুরে ব'সেই ওদের চমৎকার টী-পার্টি হ'লো সেদিন।

যাবার সময় অতনু বললো, 'কাল এসো আবার। আসবে তো?

বুলু তখন রাজি হ'লো বটে, কিন্তু পরদিন চায়ের সময়ে আর এলো না। এলো যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা, অতনু বিমর্ষ চিত্তে ভাবছে—এখন আর না-বেরোলেই চলছে না।

দেখা হ'তেই অতনু বললো, 'এই বুঝি তোমার কথা?'

'অনেকদিন পর চা খেয়ে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়নি,' গড়গড় ক'রে জবাব দিলো বুলু। 'আর চা খাবো না।'

অতনু মনে-মনে বললো, 'এই চমৎকার মিথ্যেটা বুলু কিছুতেই এক্ষুনি বানায়নি, আগে থেকে তৈরি ক'রেই এসেছিলো।'

একটু পরেই বুলু চ'লে গেলো। অতনু রাস্তায় বেরিয়ে ভাবলো, 'যা-ই বলো, মোটর চাপা পড়া ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ না।'

৭

এদিকে, সাবিত্রী বোস গা এলিয়ে চুপ ক'রে থাকবে, এমন মেয়েই সে নয়। অতনুর শব্দতত্ত্ব নিয়ে বই লেখার উপন্যাস তাকে মুহূর্তের জন্যও ভোলাতে পারবে, এমন মেয়েও সে নয়। অতনুকে সাবিত্রী চেনে; সাবিত্রী জানে, অতনুকে সব সময় আঁকড়ে ধ'রে না-রাখলে হঠাৎ কখন ফশকে যায় কিছুই তার ঠিক নেই।

একদা এই সাবিত্রী বোস প্রাগৈতিহাসিকে অরণ্যের পথে তার পুরুষকে পরস্ত্রীর সঙ্গে পদচারণা করতে দেখে নিঃশব্দে তার গুহা থেকে বেরিয়ে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে শত্রুকে হত্যা করেছিলো। কিন্তু এখন আর তার সে-দিন নেই। এখন তার মুখে কথা ফুটেছে। এখন সে ইংরেজি বলে, ফ্রেঞ্চ কবিতা আওড়ায়। এখন সে—শুধু যে নখ কাটে তা নয়, নখ কাটার পিছনে বিস্তর সময় এবং অর্থ ব্যয় করে। এখন মনের ভাব গোপন করার কৌশল সে শিখেছে।

এখন আর ঈর্ষার প্রথম উদ্রেকের সঙ্গে-সঙ্গেই সে মারতে ছোটে না। এখন তার সবুর সয়। একদিন, দু-দিন, তিন দিন, এক সপ্তাহেরও সবুর সয়।

কিন্তু অষ্টম দিনেও অতনু যখন আবির্ভূত হ'লো না, তখন সাবিত্রী বোস ধৈর্য হারালো। হয়তো একবার তার মনে হ'লো—'থাকগে, আমার কী গরজ—!' কিন্তু আজকালকার সাবিত্রী বোস অভিমানের ধার ধারে না; অভিমান ভারি মেয়েলি! অতনুকে কেউ যদি হাতে-পায়ে বেঁধে হিড়হিড় ক'রে তার কাছে টেনে আনে, তাহ'লে সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে তার জুতোর চোখা ডগাটা দিয়ে অতনুর চোখা নাকটাকে ঠুকে দেয়। কিন্তু অভিমান—ছোঃ!

তাই সে টেলিফোন তুলে···

এটা হচ্ছে বুলুর চা খাওয়ার দু-দিন পরের কথা। সময়, সন্ধ্যা—যখন অতনু নিতান্তই মুখরক্ষার জন্য গোলদিঘির ধারে একটু ঘুরে বেড়ায়। বুলু অতনুর মা-র কাছে ব'সে গল্প করছে, এমন সময় টেলিফোন বাজলো।

অতনুর মা বললেন, 'বুলু, দেখে আয় তো, কে। ব'লে দিস, অতনু বাড়ি নেই। ওকে কিছু বলতে হবে কিনা জিগেস করিস।'

টেলিফোনে কথা বলা বুলুর অভ্যেস নেই; একটু ভয়ে-ভয়েই সে যন্ত্রটা তুলে খুব আস্তে বললো, 'কে আপনি?' তক্ষুনি জবাব শুনলো, 'অতনু?' গলাটা মেয়েলি।

এবার পরিষ্কার গলায় বুলু বললো, 'না।' তারের অন্য প্রান্তে সাবিত্রী চমকে উঠলো। গলাটা মেয়েলি।

'অতনুবাবুকে আমার দরকার। তাঁকে একটু ডেকে দেবেন দয়া ক'রে?'

'তিনি বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'তা তো বলতে পারবো না।'

'কখন ফিরবেন?'

'একটু পরেই।'

'একটু পরেই? ঠিক জানেন?'

বুলু ঠিকই জানতো, কিন্তু নিজের অজান্তেই সাবধান হ'যে পড়লো।

'না, ঠিক জানি না।'

'আপনি কি অতনুবাবুর মা?'

'না।'

'তাঁব কোনো আত্মীয?'

'না।' বুলুর গলা মীইযে এলো।

'তা-ও না? আপনি তবে কে?'

বুলুব ইচ্ছে হ'লো, টেলিফোন ছেড়ে-ছুড়ে পালায। দিশেহাবা হয়ে ব'লে ফেললো, 'আমি কেউ নই।'

বুলু এবার রুপোর ঘণ্টাব মতো অল্প একটু হাসি শুনতে পেলো।

'That's funny. That's almost the funniest thing I've ever been told. Do you mind if I repeat the question?

বুলু অথই জলে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলো।

একটু পরে: 'ও, আপনি ইংবিজি বোঝেন না?' আবাব একটু ধারালো হাসি তলোযাবেব ডগাব মতো বুলুকে বিঁধলো। বুলু কথা বলবে কী, তার মুখ এমন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো যেন অসংখ্য আলপিন ফুটছে।

আবাব প্রশ্ন হ'লো, 'কে আপনি?'

বুলু যদি এখন শুধু ব'লে দেয় যে সে আব অতনু এক বাড়িতে থাকে না, তাহ'লেই গোল অনেকটা চুকে যায, কিন্তু তাব অচেতন মেয়ে-মন প্রতিহিংসাব এমন সুযোগ কি ছাড়তে পাবে? হঠাৎ

কেমন ক'রে সাহস পেলো সে, প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে বললো :

'আমি কে, তা আপনার না-জানলেও চলবে।'

তারের ওপারে সাবিত্রী ঠোঁট কামড়ালো।

বুলু কর্তব্য সমাপন করলো, 'অতনুবাবু এলে তাঁকে কিছু বলতে হবে ?'

'বলবেন যে সাবিত্রী বোস তাঁকে ডেকেছিলো। সা-বি-ত্রী—মনে থাকবে নামটা ? আর-কিছু বলতে হবে না।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে সাবিত্রী দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'So !'

একটু পরে আবার বললো, 'And with a girl who doesn't understand a word of Englsh ! What *taste* !'

একবার সাবিত্রী ভাবলো, অতনুকে আবার ডেকে—কিন্তু না, not yet। আর, মুখোমুখি কথা না-বললে কোনো কাজ হবে না। কিন্তু অতনু—what a doddering ass he's making of himself ! মুচকি হাসলো সাবিত্রী। লোকে শুনলেই বা ভাববে কী ? এ-সংকট থেকে অতনুকে উদ্ধার করা চাই--অতনুরই ভালোর জন্য। সাবিত্রীই উদ্ধার করবে।

যেন এই উদ্ধারকার্যে সাবিত্রীব নিজের কোনো গরজ নেই, যেন এ-ঝঞ্ঝাট না-জুটলেই সে বেঁচে যেতো, নেহাৎ একটু পরোপকার না-করলেই নয়,—এমনি ক্লান্তভাবে সোফায ডুবে সে বই খুললো। একটু পরেই বইখানা খ'সে পড়লো তার হাত থেকে। 'সাবিত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকালকার সাবিত্রীদের সবুর সয়।—

অতনুর মা-র প্রশ্নের উত্তরে বুলু ঢোঁক গিলে বললো, 'কে একজন—একজন বন্ধু—নাম-টাম তো বললো না।'

'কিছু বলতে বললো ?'

'না।'

বুলুর বুকের উপর গন্ধমাদন চেপে বসেছে।

এ-সব কথা হচ্ছিলো বুলুর মা-র ঘরে ব'সে, তাই অতনু যখন একটু পরেই বাড়ি এলো, কাউকে দেখতে না-পেয়ে চ'লে গেলো নিজের ঘরে। বুলু কি আসেনি? এসে ফিরে গেছে? সে কী করবে এখন? আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, হঠাৎ আয়নায় ছায়া পড়লো। অতনু চমকে ফিরে তাকালো; বুলুর মুখ কাগজের মতো শাদা।

'আপনি এসেছেন!' বলতে বুলুর গলা কেঁপে গেলো।

'কী বুলু, কী হয়েছে?'

'এইমাত্র সাবিত্রী বোস টেলিফোনে ডেকেছিলেন আপনাকে। সা-বি-ত্রী। নামটা ঠিক মনে আছে তো?'

অতনু বুঝলো, বুলু চেষ্টা ক'রে কান্না চেপে আছে। সে-ও চেষ্টা ক'রে হাসি টানলো মুখে, সহজ সুরে বললো, 'ও, সাবিত্রী। তা আর-কিছু বললে?'

'বললেন—আর-কিছু বলতে হবে না।' বুলুর দু-চোখে জল এলো এবার।

অতনু জীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু তাদের কারো চোখে জল দ্যাখেনি। কবিতার বাইরেও যে অশ্রু ঝরে, এটাও অতনু এই প্রথম জানলো। তাই, সে কী করবে, কী বলবে, কিছুই যেন ভেবে পেলো না। তাই, এ-অবস্থায় যে-কথা তার কক্ষনো বলা উচিত ছিলো না, সে ঠিক সেই কথাই, ব'লে ফেললো—'বুলু, তুমি কাঁদছো!'

ব'লেই বুলুর দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু কোথায় বুলু? দরজার বাইরে মুহূর্তের জন্য অতনু দেখলো তার বেগনি রঙের আঁচল। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'বুলু!'

ভাববার সময় নেই। এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে সে ছুটে নামলো বুলুর পিছনে সিঁড়ি দিয়ে। নিচে এসে যখন থামলো, তার মুখ গরম, নিশ্বাস পড়ছে জোরে। বুলু অদৃশ্য, সামনে দাঁড়িয়ে আছে অমূল্য।

অমূল্য অমায়িক হেসে বললো, 'কী খবর, অতনুবাবু? এত তাড়া?'

অতনু (হায় অতনু!) কপালের ঘাম মুছে বললো, 'ভারি গরম।'

'সে-কথা আর বলবেন না, মশাই;—গরমে আলুসেদ্ধ হ'য়ে গেলাম। দেখছেন এবারকার মনসুনের কাণ্ডটা! যেন বৃষ্টির জল পুঁজি ক'রে ও লাট হবে—টিপে-টিপে খরচ করছে। বেলজিয়মে, জানেন, এক বৈজ্ঞানিক বৃষ্টি তৈরি করেছেন। Manufatcured rain! ভাবতে পারেন! আশ্চর্য শক্তি, মশাই, বিজ্ঞানের!'

অতনু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বললো, 'আশ্চর্য!'

অমূল্য প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলো, 'শিক্ষা, অতনুবাবু, শিক্ষা! যে-দেশে শিক্ষা নেই, তার কখনো কিছু হবে না, এ আমি আপনাকে এক কলমে লিখে দিতে পারি। আমাদের দেশের নেতারা কবে যে এটা বুঝবেন, তা-ই ভাবি। এই ধরুন, আমরা যে মেয়েদের তেমন লেখাপড়া শেখাচ্ছি না, এতে কি দেশের মঙ্গল হচ্ছে? আমি বলবো, কক্ষনো না। আমি, মশাই, ফীমেল এডুকেশনের ঘোর পক্ষপাতী। স্কুলের ডিবেটিং ক্লবে এ নিয়ে এমন-সব বক্তৃতা দিয়েছি যে—বুঝলেন, মশাই—হেডমাস্টার থেকে দরোয়ান পর্যন্ত থ হ'য়ে শুনতো সবাই। তবে বলতে পারেন, আমার মতামত যদি এতই অপ-টু-ডেট, বোনটাকে কেন স্কুলে পড়াচ্ছি না? আহা—আপনি না বলতে পারেন, আপনি সব দিক বোঝেন-সোঝেন,—কিন্তু বাইরের দশজন বলতে ছাড়বে কেন?—"কই, মুখে যে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা করো, ইদিকে নিজের বোনেরই তো শিক্ষার ব্যবস্থা করছো না!" একেবারে যে করিনি, তা নয়। স্কুলে ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু—আপনি ঘরের লোকের মতোই, আপনাকে বলতে বাধা নেই—মা মারা গেলেন, সংসার চালায় কে? তাই ছাড়িয়ে আনতে হ'লো। তবে বলতে পারেন—আহা-হা, আপনি না-হয় বলবেন না, কিন্তু বাইরের লোকে বলতে ছাড়বে কেন? মাস্টার রেখে ঘরেও তো পড়ানো যায়! যায় বইকি। নিশ্চয়ই! আর মাস্টারও

কি রাখিনি কখনো ? তাও একবার রেখেছিলাম। কিন্তু এমন বিশ্রী কাণ্ড হ'লো, মশাই, যে কী বলবো !'

'মাস্টারটা মূর্খ ছিলো বুঝি ?'

'শুনুন তাহ'লে। আপনি ঘরের লোকের মতো, আপনাকে বলতে বাধা নেই। মাস্টার তো রাখলাম—বি. এ. পাশ ছোকরা ; সপ্তাহে চার দিন—কুড়ি টাকা। প্রথম এক সপ্তাহ পড়িয়েই মাস্টার রোববার ছাড়া রোজ আসা ধরলো। বললে—"অনেক শেখাতে হবে, চার দিনে কুলোবে না।" আমি বললাম, "বিলক্ষণ। তবে টাকা কিন্তু কুড়িতেই কুলোনো চাই।" মাস্টার সাধুতার অবতার সেজে বললো, "ও-কথা তুলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।" তখনই সন্দেহ হ'লো আমার। পরের দিন মাস্টার যখন এলো, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটু পরে উঁকি দিয়ে দেখি, বুলুর হাত থেকে বই নিতে গিয়ে মাস্টার বইটা না-নিয়ে ধরেছে প্রায় হাতটাই। বুলু অবশ্য স'রে বসলো তখনই, কিন্তু আমি কি ওকে ছাড়ি ! তক্ষুনি ঘরে ঢুকে "You bloody swine !" ' (চীৎকার ক'রে) 'ব'লে সোনাচাঁদ মাস্টারের গালে' (আস্তিন গুটিয়ে) 'এমন এক চড় বসালাম' (সঙ্গে-সঙ্গে অমূল্য এক বিশাল চড়ের অভিনয় করলো ; তার হাতের পাঞ্জা অতনুর গালের একটু মাত্র দূরে এসে থামলো ;—অতনু সভয়ে হ'টে গেলো পিছনে) 'যে সে চেয়ারসুদ্ধু উল্টিয়ে মেঝেয় প'ড়ে চিৎপাত। কোন ধানে কত চাল, বাছাধনকে টের পাইয়ে দিলাম ! হাঃ-হাঃ-হাঃ।'

অতনুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার ক'রে হাসতে লাগলো অমূল্য। অতনু আরো একটু পিছনে হটলো।—

সে-রাতটা নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে কাটলো অতনুর। একবার দেখলো, তার মা পাগল হ'য়ে গিয়ে তাকে কামড়াতে আসছেন ; একবার দেখলো, এক গালের দাড়ি কামিয়ে সে চৌরঙ্গি দিয়ে হাঁটছে, আর প্রত্যেক দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে একবার ক'রে ; একবার দেখলো, একলা এক সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে

ভিজছে আর কাঁচা চিংড়ি মাছ চিবিয়ে খাচ্ছে। এমনি আরো অনেক। ভোরের দিকে (যা আর কখনো হয়নি) তার ঘুম ভেঙে গেলো। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। উঠে এক গ্লাশ জল খেয়ে সে আবার শুলো। এবার সত্যি-সত্যি ঘুমুলো।

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। উঠেই প্রথম কথা মনে হ'লো, 'বুলুকে আর দেখবো না।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, ন-টা প্রায় বাজে। বাজুক, আজ তার ওঠার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু একটু পরে চাকর এলো চা আর খবর-কাগজ নিয়ে। উঠে বসতে হ'লো বিছানায়। চায়ে চুমুক দিয়ে কাগজ খুলতে যাবে, এমন সময় আবার তার মনে পড়লো, 'বুলুকে আর দেখবো না।' কাগজ প'ড়ে থাকলো, চা ঠাণ্ডা হ'লো।

এমন সময় বাড়ির সামনে মস্ত ঝকঝকে গাড়ি থামলো, আর তা থেকে নামলো এক ঝকঝকে মেয়ে। সাবিত্রী বাড়িতে ঢুকে প্রথম যার দেখা পেলো, সে বুলু। অতনুর বাড়িতে যে অন্য ভাড়াটে আছে, এটা সাবিত্রী জানতো না, আর একটু আগেই রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলো ব'লে বুলুর হাতে মশলার দাগ লেগে ছিলো। সাবিত্রী তাকে বাড়ির ঝি ভেবে জিগেস করলো, 'সাহেব আছেন?'

বুলু বুঝতে না-পেরে তাকিয়ে থাকলো।

'অতনুবাবু আছেন?'

হঠাৎ এর মুখে অতনুর নাম শুনে বুলু একটু লাল হ'লো। তার লাল হওয়াটা সাবিত্রীর চোখ এড়ালো না। এক সঙ্গে দু-জনেরই মনে পড়লো কালকের টেলিফোনের কথা। একসঙ্গেই দু-জনে দু-জনকে চিনলো।

বুলু আঙুল দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে অদৃশ্য হ'লো। আর সাবিত্রী দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'So!'

স্ত্রীকণ্ঠ শুনে কৌতূহলী হ'য়ে অন্যেরাও এলেন—বুলুর দাদা, পিসিমা, বাবা। কিন্তু সাবিত্রী তাঁদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না-ক'রে গটগট ক'রে উঠে গেলো উপরে।

বুলুর বাবা বললেন, 'ভারি পাখোয়াজ মেয়ে তো! কে?'

পিসিমা সাবিত্রীকে দেখে এমন চকচকালেন যে কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

অমূল্য মনে-মনে বললো, 'বেশ বেশ। চিরকালই আমি ফীমেল এমানসিপেশনের পক্ষপাতী।' বিলিতি নাচের খেলো সুর শিষ দিতে-দিতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে।

অতনুর মা হাঁটুতে কাগজ রেখে চিঠি লিখছিলেন; সাবিত্রীকে দেখে লেখা থামিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সাবিত্রী সোজা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।—'Hullo, mater! Oh, I'm sorry, what I mean is—মানে, আপনি অতনুর মা তো?'

'আমি তো তোমাকে—ঠিক চিনতে পারছি না।'

'নাম শুনলেই চিনবেন। আমি সাবিত্রী। সাবিত্রী বোস,' ব'লে সাবিত্রী অতনুর মা-র মুখে পরিচয়ের আলো দেখবার আশায় একটু অপেক্ষা করলো। কিন্তু তাঁর মুখ যে-তিমিরে সেই তিমিরে। মনের অলিগলি ঘুরেও তিনি সাবিত্রী বোসের নাম খুঁজে পেলেন না। আবার তার মুখের দিকে তাকালেন। চোখ বড়ো ক'রে সাবিত্রী বললো, 'অতনুর মুখে আমার নাম শোনেননি কখনো?'

এই প্রশ্নের কী উত্তর দিলে নিষ্ঠুর হবে না, অতনুর মা ঠিক ভেবে পেলেন না। তখন সাবিত্রী বললো, 'অতনুকে একটু ডেকে দেবেন দয়া ক'রে?'

কিন্তু ডাকতে হ'লো না, অতনু তখনই সেই ঘরে এসে অদৃষ্টের মুখোমুখি দাঁড়ালো। মুখ তার ফ্যাকাশে, বিশৃঙ্খল চুল, গায়ের জামাটা আধ-ময়লা।

অতনু প্রথমে বললো, 'মা, তোমার স্নানের বেলা হ'লো।'

মা তখনই উঠলেন। দরজা দিয়ে বেরোতে তাঁর যেটুকু সময় লাগলো, সেটুকুও অপেক্ষা না-ক'রে সাবিত্রী অতনুর কাঁধে হাত রেখে ডাকলো, 'অতনু।'

অতনু স'রে এসে বললো, 'কী খবর?'

'তোমার কী খবর ?' জবাব দিলো সাবিত্রী।

মুহূর্তের জন্য হিংস্র প্রতিকূলতায় চোখোচোখি হ'লো দু-জনের। মুহূর্তের জন্য অতনুর ইচ্ছা হ'লো সাবিত্রীর রং-মাখা গাল এক চড়ে আরো লাল ক'রে দেয়; মুহূর্তের জন্য সাবিত্রীর ইচ্ছা হ'লো, অতনুর ঘাড়ের নরম মাংসে ঘ্যাঁক ক'রে বসিয়ে দেয় কামড়। এই সাংঘাতিক মুহূর্ত তারা দু-জনেই নিরাপদে উৎরোলো—ধন্যবাদ আমাদের সভ্যতাকে।

পরের মুহূর্তেই হঠাৎ তার মধুরতম নারীত্বে গ'লে গেলো সাবিত্রী। লাস্য ফুটলো তার চোখে, কোমল সুরে বললো, 'অতনু, আমার উপর রাগ করেছো ?'

'না,' ব'লে অতনু যেন ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়লো।

সাবিত্রী দাঁড়ালো অতনুর পিছনে, সরু-সরু আঙুলে তার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বললো, 'না ? সত্যি বলো অতনু, তুমি কি রাগ করোনি ? করেছো, করেছো—এ আমি তোমার মুখ না-দেখেও বুঝতে পারছি। কেন ? কী করেছি আমি ?'

অতনু মাথা ঝেঁকে বললো, 'অসহ্য !' কথাটা এতক্ষণ মনে-মনে ভাবছিলো সে, বলতে চায়নি, বলবে ভাবেনি, হঠাৎ অতর্কিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মুহূর্তে সাবিত্রীর শরীরের, স্বরের সব তরল উষ্ণতা বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে জ'মে গেলো। ঘুরে দাঁড়ালো অতনুর মুখোমুখি, চাপা গলায় বললো, 'অতনু, you are an ass !'

অতনু বিনীতভাবে বললো, 'হ্যাঁ, আমি তা-ই। তার চেয়েও বাজে। নয়তো তোমাকে সহ্য করি !'

সাবিত্রীর গালের রাসায়নিক রক্তিমার উপর দিয়েও ফুটে উঠলো অপমানের লাল রং। কিন্তু সে হিস্টিরিয়ার ধার ধারে না—ওটা ভারি মেয়েলি। আশ্চর্য তার সংযম—ধীরে-ধীরে ব্যাগ খুলে সে মুখে একটু পাউডর লাগালো। তারপর এতক্ষণে একটা মনের কথা বললো, 'অতনু, এখন আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম।'

অতনু একটু হেসে বললো, 'মেলোড্রামাটিক সিনেমা দেখার এ-ই হচ্ছে ফল।'

সাবিত্রীও হাসলো।—'আর সেন্টিমেন্টাল সিনেমা দেখার ফল কী? কাঁচা শৈশবকে sweet sixteen বলা, মূর্খতাকে পবিত্রতা ব'লে ভুল করা, বোকামিকে artlessness ভেবে নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া—কী বলো?'

অতনু বললো, 'তুমি কিছুই জানো না, সাবিত্রী; তুমি চুপ করো।'

'জানি না? সবই জানি আমি। কানেও শুনলাম, আর এখন চোখেও দেখলাম আসবার সময়। আর আমি ভেবেছিলাম ঝি!' সাবিত্রী ছোট্ট ক'রে হেসে উঠলো।

ব্যথায় নীল হ'য়ে গেলো অতনুর মুখ। অস্ফুটে বললো, 'চুপ করো, সাবিত্রী!'

তবু সাবিত্রী মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলো, 'And a girl who doesn't understand a word of English! What *taste*!'

অতনু প্রার্থনার সুরে ডাকলো, 'সাবিত্রী!'

'তোমার latestটিকে আর-একবার দেখবার ইচ্ছে ছিলো, অতনু। সে-সৌভাগ্য হবে কি?'

অতনু নীরব।

'ভয় নেই তোমার, আমি ছোটো মেয়েদের কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাই না। Really, কোথায় খুঁজে পেলে বলো তো!'

অতনু ভাবলো পালা তো ফুরোলোই, এখন যদি সে একটি কথাও আর না বলে, তাতেই বা লাভ কী। যা হয়েছে হ'য়েই গেছে। তাই সে আরম্ভ করলো, 'বুলু—'

'বুলু বুঝি নাম? বেশ নাম তো! বেশ homely—না?'

'—নিচে যে-ভদ্রলোক থাকেন, বুলু তাঁর মেয়ে।'

'নিচে আবার অন্য কেউ থাকেন? আমি তো জানতাম না—তাই ভেবেছিলাম—very sorry to have hurt your feelings, mon

cher—কিন্তু—' বুলুর ময়লা শাড়ি মনে ক'রে সাবিত্রী হেসে উঠলো। একটু পরে বললো :

'Tired হ'তে কত দেরি, অতনু?'

অতনু হঠাৎ উত্তেজনায় ব'লে উঠলো, 'I'm thoroughly, *thoroughly* tired of you. Please leave me alone.'

সাবিত্রী রাগলো না। বুঝলো, তার জয় এবার আসন্ন। এই উত্তেজনা দেখিয়েই অতনু তার হার মেনে নিয়েছে। সাবিত্রী এখন নিশ্চিন্ত। কাল, না পরশু—এ-ই শুধু প্রশ্ন এখন। তাই সে মধুর হেসে বললো, 'আচ্ছা, যাই তাহ'লে। কিন্তু আমাকে একটু এগিয়ে দেবে না, অতনু?'

অতনু ভাবলো, সমুদ্রে যার শয়ন, শিশিরে তার ভয় কিসের? সাবিত্রীর সঙ্গে নিচে এলো সে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বুলুর বাবা ভাবলেন—ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে। অমূল্য নাচের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে বেরিয়ে এলো। বুলু রান্নাঘরে।

সাবিত্রী সবাইকে শুনিয়ে বললো, 'Good-bye, darling, good-bye.'

অমূল্য একগাল হেসে এগিয়ে এলো। 'ইনি কে, অতনুবাবু? ভারি অপ-টু-ডেট তো।'

'হ্যাঁ, খুব।' ব'লে অতনু উপরে চ'লে গেলো।

রাত্রে অতনুর খাবার সময় মা বললেন, 'সবার চোখে তো আর সব ভালো দেখায় না, অতনু;—আজ সারাদিন ওদের মুখে এ ছাড়া কথা নেই। বুলুর পিসিমা তো মুখের উপরেই বললেন, "ছেলেকে শুধু পাশ করালেই চলে না, দিদি। পাশ করলেই ছেলে মানুষ হয় না।" আর সত্যিও, এ-সব মেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি—'

অতনু বললো, 'হুঁ।'

'আমি আর কী বলবো, বল? চুপ ক'রে কথা শুনতে হ'লো। তা বুলুকে ওরা এখানে আর কিছুতেই রাখবে না। কালই দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে এক বুড়ি ঠানদির কাছে।

ওর বাবা বলেছেন—যেমন ক'রে হোক, এই শ্রাবণের মধ্যেই বিয়ে দেবেন মেয়ের।'

অতনু বললো, 'হুঁ।'

'মেয়েটার উপর আমার মায়া পড়েছিলো, অতনু—কষ্ট হচ্ছে ওর জন্য। ওর দোষের মধ্যে তো এ-ই যে ও মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে! আজ সারাদিন কী কান্না বেচারার! মা না থাকার এ-ই তো কষ্ট, অতনু, মেয়ের দুঃখ কি বাপে-ভাইতে বোঝে? আজ ওর মা থাকলে কি আর ওকে চ'লে যেতে হ'তো এখান থেকে। তোরই অবিবেচনার জন্য এই শাস্তি হ'লো ওর—এটা ভেবে আরো আমার খারাপ লাগছে। আমি কত বোঝালাম ওর পিসিকে, কিন্তু—ও কী, হ'য়ে গেলো খাওয়া?'

'হ্যাঁ, মা, খিদে নেই আজ।...আর শোনো, ওদের কালই নোটিস দিয়ে দাও একমাসের। আর আমাদের ভাড়াটে রেখে কাজ নেই,' ব'লে অতনু ঢকঢক জল খেয়ে উঠে পড়লো।

পরদিন দুপুর। বুলু এখনই চ'লে যাবে। অমূল্য গাড়ি ডাকতে গেছে—সে-ই তাকে নিয়ে যাবে। বুলু বাক্স গুছিয়ে তৈরি। মনের দুঃখে অতনুর মা নিচে নামেননি। বুলুর পিসিমা বললেন, 'একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে আয়। কিন্তু—'

বুলু বুঝে নিলো কথাটা, ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

মাসিমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুলু বেরিয়ে এলো। মাসিমা তাকে বলেছেন, 'এসো,' ভালো ক'রে তার দিকে তাকাননি। আর দু-একটা কথাও তো তিনি বলতে পারতেন। কিন্তু মাসিমা যে চোখের জল লুকোবার জন্যই মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, কান্নায় গলা আটকে ছিলো ব'লেই কথা বলতে পারেননি, তা বুলু জানলো না, বুঝলো না, ভাবতে পারলো না।

কিন্তু চ'লে যেতে-যেতে বুলু থামলো। হঠাৎ চোখে পড়লো অতনুর ঘরের পরদা-ঢাকা দরজা। তাকালো একবার; ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। কাছে গেলো, দরজার বাইরে দাঁড়ালো একটু। পরদাটা

একটুখানি তুলে সে কি উঁকি দিতেও পারে না একবার? আজই তো শেষ। আর কোনোদিন—কোনোদিন—

একটু সরালো পরদাটা। অতনু ঘুমোচ্ছে, পাশে প'ড়ে আছে পাতা-খোলা বই। একবার যাওয়া যায় না? গিয়েই চ'লে আসবে, শুধু কাছে দাঁড়িয়ে দেখবে একবার। আর কোনোদিন—না, কোনোদিন না। আজই শেষ।

হঠাৎ যেন ফুলের গন্ধে অতনুর ঘুম হালকা হ'লো। না—ফুলের গন্ধ না, মেয়েলি প্রসাধনের, প্রসাধনেরও না, যেন দেহেরই গন্ধ—দেহেরও না, মনের—স্ত্রী-সত্তার চিরন্তন সৌরভ যেন।

চোখ মেলে বুলুকে দেখে কিছুই বুঝতে পারলো না অতনু, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো।

বুলু বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

যেন স্বপ্নের মধ্যে বুলুর একটি হাত অতনু টেনে নিলো নিজের হাতে, চেপে ধরলো মুখের উপর, মনে-মনে বললো, 'বুলু, যেয়ো না। এখানে থাকো। আমার কাছে থাকো।'

তারপর তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়লো।...

চারটের সময় ঘুম ভাঙলো অতনুর। জেগে উঠেই ভারি ভালো লাগলো—শরীর ঝরঝরে, মনে যেন খুশি আর ধরে না। মনে পড়লো দুপুরবেলার স্বপ্ন, মধুর একটি স্বপ্ন দেখেছে আজ। কে একটি মেয়ে, বুলুর মতো—না কি বুলুই?—কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো যেন—তারপর—তারপর থেকেই খুশি আর ধরে না? বেচারা বুলু—জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলো, যাবার সময় দেখাও হ'লো না। ভালোই—হয়তো কেঁদে ফেলতো দেখা হ'লে—তার চেয়ে স্বপ্নই ভালো।

আজ তার মন খুব ভালো—এই উপলক্ষ্যে সে আজ বিলেতি বেশ পরবে, দিনটিকে একটুখানি বিশেষত্ব দেবার জন্য। সযত্নে সে পরিপাটি বেশভূষা করলো;—টাই আর মোজার রং ম্যাচ করাতে পনেরো মিনিট সময় কাটালো। তারপর চা খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে,

হেরেদিয়ার সনেট আওড়াতে-আওড়াতে রাস্তায় বেরোলো। শিষ দিতে পারলে শিষই দিতো।

সাবিত্রীর মুখের কাছে মুখ নিয়েই অতনু যেন চমকে স'রে এলো।

'What's that, darling ?'

'সুন্দর গন্ধ তো—ফুলের মতো !' ব'লেই একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো অতনু। ফুলের ? না, প্রসাধনের—না, প্রসাধনেরও না—অন্য কিছুর, অন্য কারো—খুব চেনা গন্ধ তার--এই গন্ধই কি সে স্বপ্নে আজ পেয়েছিলো ? কী যেন মনে পড়লো অতনুর, কিন্তু ভালো ক'রে মনেও পড়লো না।

সাবিত্রী বললো, 'কবিরা যা-ই লিখুন, আমাদের মুখে সত্যি-সত্যি ফুল ফোটে না, তা তো জানো। ওটা নতুন একটা পাউডর—প্যারিসের লেটেস্ট একেবারে—অনেক খুঁজে কাল পেয়েছি। You don't like it ?' ব'লে সাবিত্রী কাছে এসে তার সুগন্ধি মুখটি উঁচু করলো।

'Don't like it ? I adore it, darling.'

চুম্বন সমাপ্ত হ'লো। সেই সঙ্গে আমাদের গল্প।

এমিলিয়ার প্রেম

আশ্চর্য, এমিলিয়ার জীবনে যে প্রেম আসবে—তার বয়স যখন উনতিরিশ, জীবনে যখন সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে যে রংদার একটু তুচ্ছতা ছাড়া জীবনের আর কিছুই তাকে দেবার নেই। যখন তার চাইতে দশ কিংবা বারো বছরের ছোটো-ছোটো মেয়েরা তার দিকে শ্রদ্ধার চোখে, কৌতূহলের চোখে তাকাতে আরম্ভ করেছে।—হয়তো ঈষৎ করুণার চোখেও।

কেননা, সে প্রায় সেই অবস্থায় এসে পৌঁচেছিলো মেয়েরা যখন বিবাহিতব্যতার শেষ সীমা পেরিয়ে যায়। ফিকে হ'য়ে আসছিলো তার রং, অচিরেই সে স্মৃতিমাত্রে পরিণত হবে। এককালে সে ছিলো আগুন। যুবকরা মরতে চেয়েছে তার জন্য। সুন্দরী ব'লে খ্যাতি ছিলো—কিন্তু শুধুই সুন্দরী ব'লে নয়। মনোহর তার রুচি, তার ভঙ্গি, তার বলা, কিংবা না-বলা—সব জড়িয়ে অপরূপ তার ব্যক্তিত্ব। রূপের অর্থে ছাড়াও সৌন্দর্য ছিলো তার। এবং মেয়েদের মধ্যে তা বিরল। আর তাই ঘিরে থাকতো পুরুষরা। বেশির ভাগ তারা সেই গোষ্ঠীর, সমাজের পিরামিডের ছোট্ট সরু চুড়োয় যারা অধিষ্ঠিত। বাইরে থেকে ধূমকেতুর মতো মাঝে-মাঝে ছিটকে পড়ছে দু-একজন—কোনো সরকারি চাকুরে, রাজনীতির নায়ক, হয়তো কোনো দরিদ্র সাহিত্যিক। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছিলো এমিলিয়াকে লক্ষ্য ক'রেই, যখন বারো, বছর আগে, এক লম্বাচুল রোগা চেহারার যুবক তার চোখের নেশায় মজেছিলো। অজ্ঞাত সেই কবিকে সত্যি বলতে সে-ই এনে দিয়েছিলো যশ। কিন্তু সে-যশ কবি বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি; তার অল্প পরেই হাসপাতালে তার মৃত্যু হ'লো। অনেকদিন ধ'রেই সে ক্ষ'য়ে যাচ্ছিলো যক্ষ্মায়।

আর এখন—এখন যুবকরা তাকে প্রায় সম্মান ক'রে কথা বলে। আড়ালে কথা বলে তার অতীত নিয়ে। সামনে করে অত্যধিক স্তুতি। তার এতটুকু কোনো কাজে লাগতে পারলে ধন্য হয় যেন। ধন্য হয়—সত্যি। যে-খেলা তারা সবেমাত্র শুরু করতে যাচ্ছে, তাতে এই মহিলা প্রবীণ প্রতিষ্ঠায় সমাসীন, এই চিন্তা খানিকটা মহিমা দিতো তাকে—সেই যুবকদের চোখে। যে-মন্দিরের প্রাঙ্গণে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনো, এমিলিয়া সেখানে দেবীর মতো মাননীয়া।

তবু—সেইজন্যই—একটু দূরে-দূরে থাকতো তারা। এমিলিয়ার মনে হ'তো যেন শূন্য হ'য়ে আসছে চারদিক। যেন জীবনের উপর মুঠি তার শিথিল হ'যে এলো। এক-এক সময় নিঃসঙ্গ লাগতো নিজেকে। শেষ হ'য়ে এলো, মনে হয। পুরুষের জগৎ, অন্তত। এখন আর কেউ তার প্রেমে পড়বে এটা প্রায অভাবনীয়। কৌতূহলে প্রেমের উন্মেষ, তার রাজধানী রহস্যে। আর তার বিষয়ে সবাই যেন সমস্তই জেনে ফেলেছে। তার হাতের তাস দেখে ফেলেছে সবাই। কোনো যুবক যখন ঠাণ্ডা মেজাজে নিজের কোনো তুচ্ছ প্রণযের কাহিনী তাকে শোনাতো, হঠাৎ তার মনে হ'তো সে দেউলে হ'য়ে গেছে।

প্রেম? হ্যাঁ, প্রেমের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। প্রেমে পড়া? তাও সে পড়েছে কযেকবার। না-প'ড়ে উপায আছে? এমন একা লাগে জীবনে! আর পুরুষরা—এমন কাঙাল ওরা, এমন নাছোড! প্রেমে প'ড়ে সুখী হযনি সে? তাও হয়েছিলো—অন্তত তখন মনে হয়েছিলো তা-ই। নিজেকে দরাজ হাতে দিযেছিলো সে, ঝলমল ক'রে জ্বলেছিলো আগুন—কবে একদিন নিবেও গিয়েছিলো। কে জানে কখন, কে অত হিশেব রাখে। কিন্তু প্রত্যেক বার প্রথম থেকেই সে বুঝেছিলো এটা শেষ হবারই জন্য। তাতে সে দুঃখ করেনি—বরং আরাম পেয়েছিলো মনে-মনে। আ, প্রেম পর্যন্ত সাধারণ। ভালোই; স্মৃতির ভার বইতে হবে না, চিহ্ন থাকবে না কিছুরই, জীবনের খাতা পরিষ্কার। শেষ পর্যন্ত এটাই কি সবচেয়ে আরামের নয় যে কিছুরই কোনো মানে হয না—সব, সব অর্থহীন!

তাই তার নিঃসঙ্গতা নিবিড় হ'য়ে উঠতে লাগলো। মাঝে-মাঝে অত্যন্ত অসুখী হ'তে পারতো সে, যদি না জানতো যে জীবনটা কান্নাকাটিরও যোগ্য নয়। কী হবে মন-খারাপ ক'রে? কী হবে ভেবে? যেতে দাও, হ'তে দাও। কিন্তু এমন একা!

আর এই সময়েই ভাস্কর রায়ের সঙ্গে তার দেখা। প্রথম দেখা হয় গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক নাচের রাত্রে। মিসেস চমলি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলাপ হবার অনেক আগেই এলিমিয়া লক্ষ্য করেছিলো ভাস্করকে। তাদের চোখ মিলেছিলো; সেই দীর্ঘ কৃশকায় মূর্তি আকর্ষণ করেছিলো চুম্বকের মতো। অলক্ষ্য বিদ্যুৎস্রোতের মতো দু-জনেব মধ্যে—এই আকর্ষণ।

মিসেস চমলি তাদের একা ফেলে নাচের জন্য উঠে গেলেন। কোণের টেবিলে শ্যাম্পেনে একটু-একটু চুমুক দিতে-দিতে তারা আলাপ করছিলো। ইটালি। দু-জনের মধ্যে এই একটা মস্ত মিল: ইটালি। ভাস্কর বারো বছব ইওরোপে কাটিয়ে এই দেশে ফিরলো। বেশির ভাগ ছিলো ইটালিতে। সে ছবি আঁকে, ইটালি তার তীর্থ। আব এমিলিয়ার জন্ম হযেছিলো ইটালিতে, পিসাতে—তার বাবা অবিশ্রান্ত বেড়াতেন—তাব দশ বছর বয়সে তারা শেষ যেবার ইটালিতে যায়, তাব স্পষ্ট মনে পড়ে। ঈজিয়ান সমুদ্রের নীল জল এখনো তাব চোখের সামনে কাঁপে। 'আ,' অর্ধনিমীলিত চোখে সে বলেছিলো, 'যদি ওখানে ফিবে যেতে পারতাম! ইটালি আমার মনের দেশ।'

'আব আমাব। কিন্তু আপনারা চ'লে এলেন কেন?'

'বাবা চ'লে এলেন। ব্যবসা আর ভালো লাগছিলো না তাঁর। যত অল্প সময়ে যত বেশি অর্থ তিনি চেয়েছিলেন, তা ঠিক হচ্ছিলো না। ইওরোপে গিয়েছিলেন এক মাড়োয়ারির এজেণ্ট হ'য়ে। চামড়া। আরো কী-সব ছিলো। থাকতে হ'তো লণ্ডনে, কিন্তু সুযোগ পেলেই ঘুরে বেড়াতেন। অশান্ত ছিলো তাঁর আত্মা।'

'আর আপনার—আপনার আত্মাও কি অশান্ত নয়?'

'ছিলো।'

'ছিলো?'

এমিলিয়া ভান করেছিলো যেন কথাটা শোনেনি।—'বাবা প্রথমে একাই গিয়েছিলেন, কিন্তু ছ-মাস পর দেশে এসেছিলেন মাকে নিয়ে যেতে। মা যেতে চাননি প্রথমটায়। তাঁর বাবা ছিলেন দিশি রাজ্যের মন্ত্রী—ছেলেবেলা থেকে তাঁর জীবন আরামের ঢিমে লয়ে কেটেছিলো। একটু চিড় ছিলো না কোথাও। মা পরিবর্তন ভালোবাসতেন না। কল্পনাশক্তি ছিলো না তাঁর।'

'তাহ'লে তিনি সুখী—জীবন ভ'রে সুখী?'

ক্ষীণ হেসেছিলো এমিলিয়া।—'কিন্তু সে-সময়টায় সুখী ছিলেন না। ইওরোপে ভালো লাগেনি তাঁর। তিনি ছিলেন বিশ্রামে ভরা মানুষ। উজ্জ্ব তাঁর চোখ, ঘুমে ভরা। এখন সেই ঘুমের ভাব আরো গভীর। দেখলে আপনার পোর্ট্রেট আঁকার ইচ্ছে হবে।'

'আপনার চোখ কিন্তু অন্য রকম।'

'কী-রকম বলুন তো?'

'ধারালো চোখ, তলোয়ারের মতো।'

'আ!' মুহূর্তের জন্য এমিলিয়ার চোখ বুজে এসেছিলো। 'না—সে-সময়টা আমার মা-র ভালো কাটেনি—ইওরোপের শহর থেকে শহরে, সমুদ্রতীর থেকে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ানো। বাবা ভালোবাসতেন ইটালি; ইচ্ছে করেছিলেন আমার জন্ম সে-দেশে হোক। তাই কয়েক মাস আগে থেকেই পিসাতে একটা ভিলা নিয়েছিলেন।' মরবার আগের বছর শেলি যে-বাড়িতে ছিলেন, তারই কাছাকাছি। বাবার কবিতা পড়ার শখ ছিলো, এপিসাইকিডিয়ন পড়েছিলেন। আমার নাম রেখেছিলেন এমিলিয়া।'

'এমিলিয়া!' নামটি আস্তে একবার উচ্চারণ করেছিলো ভাস্কর। 'আপনার বাবার কথা আরো বলুন।'

'বাবা ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন, অর্থোপার্জনে মন্দ, উপার্জন আশানুরূপ হচ্ছে না ব'লে। ফিরে এলেন দেশে। চেষ্টা করলেন স্টক এক্সচেঞ্জে

ভাগ্য ফেরাতে। কিছুদিন খুব বর্ষণ হলো। তারপর মন্দা। লোকশান। বাবা রাগে কালো হ'য়ে গেলেন, জেদ চ'ড়ে গেলো তাঁর।'

'লোকশান হ'তেই থাকলো?'

'সবই হয়তো যেতো, কিন্তু বাবা তার আগেই হঠাৎ মারা গেলেন। আমার আশা ছিলো কোনোদিন আবার ইওরোপে ফিরে যাবো—ইটালিতে—সে-আশা ডুবলো। আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালো লাগলো; আপনি আমার মনে ইটালিকে ফিরিয়ে আনলেন—আনবেন।'

নাচের এক পাক শেষ হ'লো, মিসেস চমলি ফিরে এলেন। মিস্টর রয় একটু নাচবেন না একবার? না কি ব'সে-ব'সে দেখতেই বেশি ভালো লাগে? কিন্তু মিস্টর রয় এত সুন্দর নাচেন! তিনি কি বলতে পারেন প্যারিসে এখন নতুন নাচ কী চলছে? আলাপ সাধারণ স্তরে নেমে এলো। এমিলিয়া খুব কমই কথা বললো।

আর তারপর—পনেরো দিনের মধ্যেই তাদের প্রণয়ের উন্মীলন। সেটা যেন অনিবার্য, যেন তাদের নিয়তি। দু-জনেই যেন অনেক দিনের হারানো কিছু খুঁজে পেয়েছে, এমনি হিংস্র আবেগে পরস্পরকে দখল করলো তারা। তাদের জীবনে আর-কিছুই যেন থাকলো না—এই প্রেম ছাড়া। তবু তাদের সাবধানতার সীমা ছিলো না। না, সুনামের জন্য নয়। জীবনের সেই জুজুর ভয় এমিলিয়া কাটিয়ে উঠেছিলো অনেক আগেই। অন্য কিছু। যেন আরতির ধোঁয়া উঠছে মন্দিরে। কেউ দেখে ফেললে অশুদ্ধ হবে। গোপন রাখা চাই। এ নিয়ে মুখের কথার দরকার হ'লো না। উভয়েরই রক্ত যেন একই সঙ্গে কথা ক'য়ে উঠলো: গোপন রাখা চাই।

সপ্তাহে তিন দিন, চার দিন—কখনো আরো ঘন-ঘন তারা মিলিত হ'তো; দীর্ঘ সময়, ক্ষণিক সময়, দীর্ঘ ক্ষণিক উন্মাদনা যাপন করতো—যেন সময়হীনতায়, যেন চিরন্তনতায়। ভাস্কর ফ্ল্যাট নিয়েছিলো ক্যামাক স্ট্রীটে। গাছে আর নির্জনতায় ঘেরা বাড়ি। ঘরকন্নার ভার নিয়েছিলো এক আধা-ইংরেজ স্ত্রীলোক। ছোটো বসবার ঘরে

পুষ্পিত বিলাসিতা, লম্বা আয়না, নরম ডিভানে ডুবে গিয়ে সারা বেলা শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দেয়া। বাঘের চামড়া, কাশ্মীরের গালিচা—পায়ের তলায় উষ্ণ আর নরম। আধো-আলোয় আবছা-দেখানো ছোটো-ছোটো ব্রোঞ্জের মূর্তি। পাশে শোবার ঘর—দক্ষিণ-খোলা বড়ো ঘর, আসবাবপত্রও কম, বসবার ঘর থেকে হঠাৎ এসে ফাঁকা লাগে, কিন্তু তখনই চোখে পড়ে প্রকাণ্ড জোড়াখাট—আবলুশ কালো রঙের, শক্ত ভারি অনাধুনিক, দেখতে যেন পাথর কুঁদে তৈরি। চারটে পায়ায় চারটে বিকট গার্গয়ল মুখ বসানো। তাদের চোখ ট্যারা, ডিমের মতো উঁচু কপাল। 'শয়তানকে তাড়াবার জন্য', ভাস্কর হেসে বলতো, 'ঘুমের মধ্যে যে-শয়তান হানা দেয় তাকে ভয় পাওয়াবার জন্য।' আর বিছানায় শুয়ে, মধুর ক্লান্তিতে গ'লে যেতে-যেতে, ভাস্করের চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে এমিলিয়া বলেছে, 'গার্গয়লরা হাসছে। আর বোধহয় শয়তান লুকিয়ে আছে খাটের নিচে কোথাও।' 'থাক—মেঝে থেকে এতটা উঁচু—কোনো অসুবিধে হবে না তার।' তারপর একসঙ্গে তারা হেসেছে।

ভাস্করের স্টুডিও তেতলায়—আধখানা ঘরে। কাঠ আর কাচ দিয়ে সে নিজে এটা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলো। ফাঁকা মেঝে, দু-একটা চেয়ার। একটা আরামচেয়ার—মডেলের বিশ্রামের জন্য। নিজে সে কাজের সময় বিশ্রাম করে না, রং-লাগা হাত দুটো পিঠের পিছনে মুড়ে পাইচারি ক'রে বেড়ায়। যেন অস্থির লাগছে, শেষ না-হ'লে শান্তি নেই। তবু প্রায়ই তার শেষ হ'তো না ছবি, স্টুডিওতে অর্ধ-কৃত, প্রায়-সমাপ্ত, সদ্য-আরম্ভ-করা কাজের ছড়াছড়ি। স্ত্রীলোক, চাঁদের মতো চ্যাপটা হাতে সুগোল বুকের সমস্তটা ঢাকতে পারেনি; বুড়ো পুরুষ, চোখের শাদা আলুসেদ্ধর মতো বেরিয়ে আসছে; ভিখিরির মিছিল—ক্ষুধিত, অশুভ সব মুখ, মোটা, রূঢ় কয়েকটা মাত্র রেখায় আঁকা। তার ছবি ঠিক 'স্বাভাবিক' হ'তো না—বোধহয় খাটের পায়ায় গার্গয়লদের প্রভাবে। অসমাপ্ত ব'লে গ্রোটেস্ক ভাবটা আরো পরিস্ফুট হ'তো। কখনো এমন আঁকতো যেন নরক থেকে উঠে

এসেছে শয়তানের বাচ্চা। 'শয়তানই রাজা তোমার', এমিলিয়া হেসে বলেছে। কিন্তু ইটালির স্কেচ ছিলো কয়েকটা—ফ্লরেন্স, ভেনিস, আর্নোর রুপোলি জলে কালো ছায়া, মেদিচিদের প্রাসাদ জ্যোৎস্নায় আর স্মৃতিতে নিঃঝুম। সে-সব দেখে এমিলিয়া বলতো, 'এই তোমার সবচেয়ে ভালো কাজ।'

'তখন আমার প্রতিভা ছিলো!' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে ভাস্কর।

'ছিলো?' তাদের প্রথম আলাপের কথা স্মরণ ক'রে এমিলিয়া প্রতিধ্বনি করেছে।

'দুঃখ করি না। সৌন্দর্যকে তো পেয়েছি। প্রতিভা—কিংবা সৌন্দর্য—এ-দুয়ের একটা থাকলেই বাঁচা সার্থক। দুটোই যদি হারাতে হয় তবেই মৃত্যু।'

'আমি কি এতই সুন্দর? বলো—সত্যি বলো!'

'কী ক'রে হ'লে?'

'তোমারই জন্য—কারো মিয়ো, তোমারই জন্য।'

সেই ফ্ল্যাটে এমিলিয়া আসতো—তার শরীর বিদ্যুৎময়, তার হৃৎপিণ্ড উন্মাদের মতো স্পন্দমান। বাইরে তারা যেতো না। মিসেস কার্সন ককটেল দিয়ে যেতো, তারপর ধীরে, মৃদু স্বরে, অলস, অন্তহীন কথা ব'লে যেতো দু-জনে। দিনের আলো ঝাপসা হ'য়ে আসতো তাদের চোখে—মিসেস কার্সন ককটেল বানাতো ভালো—বিকেলেই যেন গোধূলি নামতো ঘরে।

কেউ জানলো না। বাড়িতে—এমিলিয়া কোনোদিন বেরোচ্ছে শাড়ি কিনতে, কোনোদিন ডেন্টিস্টের কাছে, কোনোদিন বা ডগ-শো; আজ নবাবজাদি বিনি মমতাজের সঙ্গে গঙ্গায় বেড়ানো; কাল পেলিটিতে পার্টি—এক মার্কিন ভারতবান্ধবীর উপলক্ষ্যে; পরের দিন অ্যাসেমব্লিতে উত্থাপিত হিন্দু মেয়েদের সম্পত্তিবিষয়ক বিলের আলোচনার জন্য নিউ এম্পায়ারে মহিলা-সম্মেলন—লাটপত্নী উপস্থিত থাকবেন। মিসেস চ্যাটার্জি শুনে যেতেন; কিছু বলতেন না। শুনতেন কিনা তা-ই বা কে জানে—তাঁর আর কৌতূহল ছিলো না

মেয়ের বিয়েয়ে। তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে, হয়তো জীবনেই ক্লান্ত হয়েছিলেন ; ঘুমে ভ'রে আসছিলেন তিনি।

প্রকাশ্যে, অন্য লোকের সাক্ষাতে, দু-জনের যখন দেখা হ'তো তখন নাগরিকতার নিখুঁত সৌজন্যে আলাপ চালাতো তারা। আর্ট নিয়ে কথা হ'তো। ফ্লরেন্স নিয়ে। ব্রাউনিং নিয়ে। তাদের কথাবার্তা এমন সহজ, অনাড়ষ্ট যে কেউ কিছু সন্দেহ করতো না।

তাদের এই ভালোবাসায় একটা অদ্ভুত দ্বীপান্তর-সৌরভ ছিলো। দু-জনেরই বয়স হয়েছে। অনেক দেখেছ—জেনেছে। এমিলিয়াব চোখে সেই জানাব ঝিলিমিলি। ভাস্করের নিবিড়তম চুম্বনেও সেই আলো একেবারে নিবে যেতো না। তবু—এমিলিয়া চাইতো সে-আলো নিবে যাক, আরো অন্ধ হোক চুম্বন, অন্ধ হ'য়ে যাক চোখ। আ—এত দেখবার পর অন্ধ হ'য়ে যাওযা—তাব মতো ভালো আর কী ?

আর ভাস্কর—তার পাৎলা ব্রাউন মুখে ছোটো-ছোটো সূক্ষ্ম বেথা—সময়ের স্বাক্ষর—এত নবম, এত সূক্ষ্ম, সময যেন আদর ক'রে হাত বুলিয়ে গেছে। অনেক দেশেব অনেক সূর্যে ঝুনো তাব মুখ। বয়স পঁয়ত্রিশ পার। বিত্ত ছিলো বাপেব, জীবনেব নোঙব ছিলো না। ভেসে-ভেসে বেড়িয়েছে পৃথিবী ভ'রে, দেখেছে জীবন যা দেশে-দেশে বিচিত্র, শেষ পর্যন্ত সবখানেই এক। গন্দোলায শুযে ভেনিসের আশ্চর্য সন্ধ্যায় মিশে গেছে, টিবোলেব বসগুন্দিন শোষণ কবেছে বক্তে। গভীর রাত্রে সীনের অদৃশ্য কালো জলেব দিকে তাকিযে ঝাঁপিযে পড়তে চেয়েছে, মরতে চেয়েছে। দীর্ঘ বিকেল ভ'বে স্প্যানিশ রোদ পুইয়েছে, টিকটিকির মতো অলস। রুমানিযায গিযেছিলো একবাব—রাস্তার একটা মেযেকে কুড়িয়ে পেযেছিলো। গোল আর কালো তার চোখ। মাতৃভাষা ছাড়া কোনো ভাষাই বলতে পারে না, কথা বলার উপায় ছিলো না তাই। ভাস্কব তাব নামটা পর্যন্ত কুড়োতে পারেনি। একটু মজারই হয়েছিলো ব্যাপাবটা।

তারপর—সব দেশ ঘুরে দেশে ফিবে আসা। ঘুরে বেড়িয়ে কী হবে আর, জীবন সবখানেই একরকম। কিন্তু কে জানতো—দেশে,

এই কলকাতার শহরেই, তার জন্য অপেক্ষা করছে—পৃথিবী ভ'রে যা সে খুঁজেছে, খুঁজে পায়নি, যা পাওয়া যায় না ব'লে নিজেকে প্রায় বিশ্বাস করিয়েছিলো।

পার্ক স্ট্রীটের পূর্ব প্রান্তে এমিলিয়ারা থাকে,—মরবার আগের বছর হঠাৎ মিস্টর চ্যাটার্জি বাড়িটা কিনেছিলেন। বড়ো বাড়ি—পুরোনো ধরনের। বড়ো-বড়ো ঘর—ক্লান্ত, ঘুমন্ত যেন। ঠিক তার মা-র মতো—এমিলিয়ার জীবন যা হ'তে যাচ্ছিলো, তারই মতো। বাড়িটা ভালো লাগতো না তার। ভাস্করের বসবার ঘরে সেই উষ্ণ অলীক গোধূলি—কী মুক্তি! দশ মিনিটের হাঁটা পথের ব্যবধান। এমিলিয়া হেঁটেই আসতো। দ্রুত, একটু চকিত পদক্ষেপে হাঁটতো সে—যেন পালাচ্ছে। মাঝে-মাঝে চোরা চোখে তাকাতো ডাইনে-বাঁয়ে, হঠাৎ থেমে যেতো কখনো বা—যেন কোনো চিন্তার আঘাতে। ঠোঁট নড়তো একটু। তারপর আবার চলতো আগের চাইতে শক্ত পায়ে।

একদিন—এক বাড়ে পুরো দলটি ফিরপোয় সমবেত, রঞ্জনপুরের রানীর নিমন্ত্রণে। জমকালো ব্যাপার। রেশমের খশখশানি। হিরে-মুক্তোর ঝলমলানি। আলো-দিয়ে-বোনা সান্ধ্য গাউন হার মেনেছে সাপের মতো পেঁচিয়ে ওঠা স্বপ্নের মতো জড়িয়ে-ধরা শাড়ির কাছে। কথার সাত, হাসির, আর শ্যাম্পেনের। কিন্তু দশটা বাজতেই এমিলিয়া উঠে দাঁড়ালো। তাকে যেতে হবে এখন। তার শরীর যেন কেমন করছে, মাথা ধরেছে মনে হয়।

প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠলো। রঙ্গিণী সেন ইংরিজিতে বললো, 'মাই ডিয়ার, তোমার হয়েছে কী?'

বিনায়ক, রানীর ভ্রাতুষ্পুত্র, তার দিকে দৃষ্টি ছুঁড়লো:

'Stay a moment longer, can't you?'

'I'm sorry,' এমিলিয়া মৃদুস্বরে বললো, 'I am sorry'—মৃদু, মধুর—যেমন শোভন। এগিয়ে গেলো রানীর কাছে বিদায় নিতে। বেরোবার পথে দরজার কাছে ভাস্কর। মাথা একটু নিচু

ক'রে ইংরিজিতে বললো : 'আমি কি আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে পারি ?'

বাইরে, তারা ট্যাক্সি নিলো। রাত্রি শিরশির করছে হাওয়ায়। ট্যাক্সির সেই ধাবমান অন্ধকারে, এমিলিয়া ভাস্করের মুখ তার মুখের কাছে টেনে আনলো। তার চোখের মধ্যে একটু তাকিয়ে থেকে বললো :

'তোমাকে ভালোবাসি—তোমাকে ভালোবাসি।'

'এমিলি !'

'তুমি বলো—বলো যে আমাকে ভালোবাসো !'

'জানো না ? জানো না তুমি ?'

'তবু বলো ! আবার বলো !'

'লক্ষ বার, লক্ষ বার, এমিলি—তবু কি কিছু বলা হয় !'

'আ—এ-কথা বলবার জন্য, মনামি, এই নাও।'

আর চুম্বনের পরে :

'সুখী ? তুমি এখন সুখী ?' ভাস্কর জিগেস করলো।

সুখে মুহ্যমান, রুদ্ধশ্বাস, এমিলিয়া জবাব দিলো :

'সুখী, সুখী, সুখে আমি পাগল হ'যে যাবো, ভাস্কর !' তারপর, তার কাঁধের উপর মুখ চেপে ধ'রে :

'এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ? কোথায় ছিলে তুমি এত দিন ?'

গলা ভেঙে এলো তার। সূক্ষ্ম, চেতনাময় অঙ্গুলিবৃন্তে তার চুলের সিঁথি অনুভব করতে-করতে ভাস্কর বললো : 'চুপ করো, চুপ করো।'

একটি সুখে-ভরা মুহূর্ত, এমিলিয়া স্তব্ধ হ'যে থাকলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো তারপর, মুখ তুলে, সামনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত চাপা গলায় বললো :

'এর আগে কেন তুমি এলে না ? যদি তুমি জানতে ! তুমি যদি জানতে কী একা আমি ছিলাম, যতদিন তুমি আসোনি !'

'জানি, জানি ! আমিও একা ছিলাম।'

'আমি ম'রে যাচ্ছিলাম। মনে হ'তো ম'রে যাচ্ছি। মনে-মনে ভাবতাম, মৃত্যু কেমন। মৃত্যু সঙ্গাহীন। কিন্তু জীবনও তো তা-ই।'

শিউরে উঠলো ভাস্কর—যেন হঠাৎ, প্রিয়তমার কথায়, মৃত্যুর হিম হাত ছুঁয়ে গেলো তাকে। 'থাক, থাক, ও-সব কথা এখন আর কেন?'

'তুমি এলে। তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচালে। প্রাণ দিলে আমাকে। আমি কখনো ভাবিনি—কখনো ভাবিনি, জীবনে এত থাকতে পারে। কারো মিথ্যা, কারো মিথ্যা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো—সত্যি? বলো, বলো!' তারপর, ভাস্করের ঠোঁট যেই কথা বলতে খুলছে, তার শরীরের উপর নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে এমিলিয়া ব'লে উঠলো :

'জানি, জানি; কিন্তু আরো, ভাস্কর আরো। আরো, আরো, আরো। ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমি-যে ম'রে যাচ্ছি। কারো মিথ্যা, যে-মুহূর্তে তুমি আমাকে আর ভালোবাসবে না, সে-মুহূর্তে আমি ম'রে যাবো।'

ভাস্কর দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'ও-কথা বোলো না, ও কথা বোলো না, ও-কথা বলতে নেই।'

পরে, ভাস্করের বসবার ঘরের আলো-ঠিকরে-পড়া লম্বা আয়নায় এমিলিয়া যখন তার প্রসাধনের শেষ খুঁটিনাটি সেরে নিচ্ছে, একটু দূরে ডিভানে ব'সে সিগারেট খেতে-খেতে তার ছায়ার দিকে তাকিয়ে ভাস্কর বললো :

'এখনই যাবে?'

'যেতে হবে, মনামি।'

'আর দশ মিনিট থাকতে পারো না—পাঁচ মিনিট—দু-মিনিট?'

'মনামি, বারোটা বাজলো।'

'মোটে বারোটা।

'কিন্তু যেতে তো হবে, মনামি।'

সিগারেট দুমড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো ভাস্কর। এমিলিয়া আয়নায় দেখলো সে তার দিকেই আসছে। আর, একটু পরে—সে তার

দুই বাহু অনুভব করলো তাকে ঘিরে। ফিরে তাকিয়ে হাসলো সে, চোখ বুজলো।

তারপর ভাস্করকে ঠেলে দিলো দূরে। দু-হাত সোজা বাড়িয়ে দূরে ঠেলে রাখলো তাকে, চোখে হেসে বললো :

'তাহ'লে—গুড নাইট।'

'না, *good* night নয়। কথাটা ভাস্করের অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো তখন ; ওটা যে শেলি থেকে চুরি করা, তা জানতেই পারলো না।

'আচ্ছা—অ রেভয়া তাহ'লে, অ রেভয়া,' ব'লে এমিলিয়া একটু থামলো, তারপর হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভাস্করের বুকের উপর ; তার সবটুকু শক্তি দিয়ে তাকে চেপে ধ'রে বলতে লাগলো, 'কী বোকা ! আমি কী বোকা ! এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন আমিই তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই !'

সূক্ষ্ম, অন্তরঙ্গ আদরে তাকে শান্ত ক'রে ভাস্কর জিগেস করলো :

'কাল কখন ?'

'কাল তো পারবো না আসতে,' হঠাৎ ব'লে ফেললো এমিলিয়া।

সঙ্গে-সঙ্গে কঠিন হ'য়ে গেলো ভাস্কর। এমিলিয়ার কাঁধের উপর আঙুলের প্রান্ত তার স্তব্ধ হলো। দ্রুত চোখে এমিলিয়া তাকালো তার দিকে—'কী হ'লো ?' প্রায় আর্ত স্বরে সে ব'লে উঠলো, 'কী হ'লো ?'

তাকে ছেড়ে একটু দূরে স'রে গেলো ভাস্কর।—'কাল আসবে না ?'

ও, এই ! এমিলিয়ার বুক থেকে ভার নামলো যেন। একটু হেসে বললো, 'কাল না-হয় না-ই এলাম। কী হয়েছে তাতে ?'

'না। আসতে হবে তোমাকে,' ভাস্কর অন্ধভাবে বললো। 'আমি তোমাকে চাই।'

তার কণ্ঠস্বরে কী-একটা ছিলো, যা মোহের মতো, বিষের মতো এমিলিয়ার রক্তের স্রোতে ছড়ালো। 'কেন তুমি এমন ক'রে আমাকে চাও ?' মুগ্ধের মতো বললো সে, 'কেন তুমি এত বেশি

ক'রে আমাকে চাও? কী আমি?—আমার কী আছে? আমি কী দিতে পারি তোমাকে?'

'আমি তোমাকে চাই। যা-কিছু তুমি—সব! তোমার সব! সব তোমাকে দিতে হবে।'

'কিন্তু আমি কি—'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' এমিলিয়ার কথার উপর ভাস্করের গম্ভীর স্বর নেমে এলো—যেন কোনো পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ—'আমি তোমাকে চাই। তুমি যখন কাছে থাকো না, প্রতি মুহূর্ত যন্ত্রণা দেয় আমাকে। যন্ত্রণার মতো তুমি তখন। তোমার একটি মুহূর্তও ছাড়তে পারি না আমি। কত সময় তুমি কাটাও—তুচ্ছ কথায়—অর্থহীন কাজে—এব সঙ্গে আব ওব সঙ্গে। ওদেব সঙ্গে তুমি কেন? ওবা তোমার কে? ওবা তোমার কী বোঝে? ওরা তো তোমাকে ভালোবাসে না। তবে—কেন এই নিজের অপব্যয? কেন জীবন নষ্ট কবা? তোমাব জীবনেব কতটুকু আমি পাই, পেতে পাবি? ভাবলে পাগল হ'তে হয, এমিলি। তুমি যদি আমাব স্ত্রী হ'তে—বিবাহিত স্ত্রী—তাহ'লেও তোমাব কতটুকু আমি পেতাম!'

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো এমিলিযা। ভাস্কব আবাব বললো—বন্যাব মতো কথা এলো তার মুখে—'তোমাকে ভালোবাসি, এমিলি! আব-কেউ কখনো এমন ভালোবাসবে না তোমাকে। আমি তোমাকে চাই। আব কেউ কখনো এমন ক'বে চাইবে না তোমাকে। তোমাকে চাওযাব ধাবে বক্ত আমাব শুকিয়ে যাচ্ছে। কেন তুমি আমাকে যন্ত্রণা দাও? এমিলি, আমাকে জানতে দাও, আমাকে বলতে দাও তুমি আমার।'

আর হঠাৎ—সেই তার সর্পিল শাড়ি আর ছিবেব ঝিলিমিলি আর আশ্চর্য উজ্জ্বল চুলের রাশি নিয়ে এমিলিয়া হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো, ভাস্কবেব পায়ের কাছে ভেঙে পড়লো। দুই দীর্ঘ শুভ্র বাহু সে বাড়িয়ে দিলো তার জানুর দিকে। স্তম্ভিত, ভাস্কর তাকিয়ে থাকলো। এমিলিয়ার বাহু শিথিল হ'য়ে এলিয়ে পড়লো, আলো লেগে ঝলসে

উঠলো ছিবে। মুখ তুলে তাকালো তাব প্রেমিকের দিকে, আস্তে-আস্তে বললো :

'ক্ষমা কবো—ক্ষমা কবো আমাকে। কী ক'বে কথা বলতে হয়, আমি জানি না। আমি কেমন ক'বে বোঝাবো যে আমি তোমার—তোমার!' বলতে-বলতে হাতেব মুঠো শক্ত ক'রে শূন্যে আঘাত করতে লাগলো সে। 'আমি তোমাব—তা ছাড়া আব কাবো নই। আমাব সব তোমাব—সব—সব। তুমি আমাকে নাও। আমাকে নিযে যা খুশি কবো তুমি। তুমি আমাকে যা বলবে তা-ই কববো। আমি আমাব হৃৎপিণ্ড উপড়ে ছিঁড়ে আনবো—তুমি যদি তা-ই চাও। শুধু—তুমি আমায কষ্ট দিয়ো না। অমন ক'বে তাকিয়ো না আমাব দিকে। আমাকে দোষী কোবো না তোমাব চোখে। আমাকে ভালোবেসো।'

বলতে-বলতে তাব চোখ জলে ভ'বে উঠলো। আব ভাস্কব এলো এগিযে—দুই হাতে ধ'বে তুললো তাকে, বসালো ডিভানে, তাব পাশে; তাকে আচ্ছন্ন মূর্ছিত ক'বে দিলো নিষ্ঠুব ক্ষুধিত চুম্বনে-চুম্বনে। আব, যখন ঝড কেটে গিযে শান্ত-সোনালি সুখ আঙুবেব মতো নিটোল হযে ফ'লে উঠেছে, যখন এমিলিযা দ্বিতীয বাব স্রস্ত চুল ঠিক কবতে আযনাব কাছে উঠে যাচ্ছে—

'কাল এসো,' ভাস্কব তখন বললো, 'বিকেল ঠিক দুটোয।'

'আড়াইটে, মনামি।'

'না, দুটো।'

'মনামি—'

'বেশ—দুটো পনেবো। আব যেন দেবি না হয।'

এমিলিযা মৃদুস্ববে হেসে উঠলো।—'তুমি আমাকে এতই ভালোবাসো? সত্যি?'

কাটলো দু-মাস। এলো শীত। শীত শুরু হ'লো ঠাণ্ডা বৃষ্টিব পশলা নিয়ে। আব তাবপব—আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য, অপরূপ। বাংলাব এই শীত—বিশ্ব যেন নীল আকাশ সোনালি বোদ্দুবে ভ'বে গেছে।

মিরাকল, মনে হয়। পুজোর ছুটির তন্দ্রা থেকে কলকাতা জেগে উঠেছে। ভাইসরয় এসেছেন। আসছে মার্কিন ট্যুরিস্টরা। প্যারিস থেকে এসেছে এক নাচের দল, চ্যাপলিনের নতুন ছবি কা'ল খুলবে, সিবিল থর্নডাইক আসছেন শিগগিরই--এবারকার সীজনটা খুব ব্রাইট —সবাই বলছে।

পুজোটা তারা কাটিয়েছিলো মুসৌরিতে। এমিলিয়া গিয়েছিলো আগে, দলের লোকের সঙ্গে। দু-দিন পরে, ভাস্কর। দেখা হ'তে বিস্মিত হবার ভান করতে হ'লো। দু-জনে ছিলো একই হোটেলে : এমিলিয়াই পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়ে রেখেছিলো—দলের কেউ তা জানতো না। ভাস্কর এসেই যে ঠিক এমিলিয়ার পাশের ঘরটা পেয়ে গেলো, এই দৈব ঘটনাকে সন্দেহের চোখে দেখেনি তারা। তারা কিছুই সন্দেহ করে'ন, সে-রকম কিছু মনেই হয়নি তাদের ; এমিলিয়াকে তারা ধ'রে নিয়েছিলো সন্দেহের অতীত ব'লে। সীজরের স্ত্রীর অর্থে নয় অবশ্য। সন্দেহের কারণ হবার ক্ষমতা এমিলিয়ার আর আছে কিনা, সে-বিষয়েই সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলো তারা।

কিন্তু মুসৌরি তারা উপভোগ করেনি। এত বেশি লোক চারিদিকে। আর হোটেলের নির্বোধ আমোদের রুটিন। ইচ্ছে না-থাকলেও যোগ দিতে হয়, দু-দিনেই ক্লান্ত লাগে। এমিলিয়ার নিশ্বাস পড়েছিলো—ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের কথা ভেবে। কলকাতা থেকে না-বেরোলেই ভালো হ'তো—একবার তাদের মনে হয়েছিলো। কেউ সেখানে নেই এখন—চমৎকার হ'তো। মানুষ এমন ভুলও করে!

যাক—আবার কলকাতা। কলকাতা—কলকাতায় শীত। রোজ ঘুম থেকে উঠে সকালের রোদের দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া মনে-মনে বলে :

'আজকের দিনটি এমন সুন্দর—সে আমাকে ভালোবাসে ব'লে।'

এক রাত্রে তারা এম্পায়ারে গেলো প্যারিসের নাচ দেখতে। নিচু জাতের নাচ—বৈদেশিক কাটতির জন্য বানানো। ভাস্কর কোনো-

রকমে ব'সে থাকলো নেহাৎই ভদ্রতা ক'রে ; নেহাৎই বেরোতে হ'লে অনেকগুলি পা মাড়াবার আশঙ্কা আছে ব'লে তারা ব'সেই থাকলো শেষ পর্যন্ত।

বেরিয়ে এসে ভিড়ের মধ্যে রাস্তা পার হচ্ছে, এমন সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলের ব্যিফে থেকে বেরিয়ে এলেন ড্রেস-স্যুট পরা বাঙালি এক ভদ্রলোক। তাদের দু-জনকে লক্ষ্য করলেন ইনি, থমকে দাঁড়ালেন, একটু ইতস্তত করলেন। এমিলিয়া তাকাচ্ছিলো ট্যাক্সির আশায়—হঠাৎ দেখতে পেলো ভদ্রলোককে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ একটু ফ্যাকাশে হ'লো।

ভদ্রলোক হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।—'কী সৌভাগ্য, এমিলি!'

ভাস্কর এঁকে লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ, গলা শুনে ফিরে তাকালো। এমিলিয়া তাড়াতাড়ি বললো, 'ইনি প্রদোষ ঘোষ, আর ইনি—ইনি ভাস্কর রায়।'

অভিবাদনাদির বিনিময় হ'লো। ভাস্কর স্থির চোখে প্রদোষ ঘোষকে দেখছিলো যেন মনে-মনে মাপ নিচ্ছে লোকটার। অত্যন্ত স্পষ্টত সুপুরুষ। মুখে স্বাস্থ্যের রক্তিমা। সরল প্রফুল্ল মুখের ভাব—একেবারে জাত-অপটিমিস্ট। সেই জাতের মানুষ, যারা কখনো দুশ্চিন্তা করে না, জীবন যাদের নিরাশ করে না কখনো। যে-ভাবেই হোক, বেঁচে থেকেই এরা সুখ পায়—এবং অন্যকেও তা বুঝতে দেয় সহজেই।

'এমিলি!' প্রদোষ অকৃত্রিম খুশিতে হাতে হাত ঘষলো। 'কেমন আছো? কেমন ছিলে? কতদিন পর দেখা, বলো তো!'

এমিলিয়া ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'কবে এলে কলকাতায়?'

'এই তো দিন দুই—ক্রিসমাস করতে এলাম।' নিজেকে ঠাট্টা করবার ধরনে প্রদোষ হেসে উঠলো।

'কোথায় না আছো আজকাল—লক্ষ্ণৌ?' এমিলিয়া জানতো, ইচ্ছে ক'রে ভুল বললো।

'ম্যাড্রাস—ম্যাড্রাসে ঠেলেছে। লক্ষ্ণৌ ছিলাম গেলো বছর।

ম্যাড্রাসে লোকে বলে চিরবসন্ত। চমৎকার শহর, সবাই বলে। আমার কিন্তু মন বসে না। আমার মন প'ড়ে থাকে কলকাতায়।'

স্বচ্ছ, সরল চোখে প্রদোষ এমিলিয়ার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকলো। 'এখানে এসেই তোমার কথা মনে পড়েছে। শিগগিরই যেতাম তোমাদের বাড়িতে—আগেই দেখা হ'য়ে গেলো। বলতেই হয় আমার ভাগ্য ভালো।'

সুখে, আত্মপ্রসাদে প্রদোষ একটু স্ফীত হ'লো; এইমাত্র উৎকৃষ্ট ডিনার খেয়ে সে বেরিয়েছে।

এমিলিয়া ভদ্রতার সুরে বললো, 'আচ্ছা—যেযো একদিন—'

'নিশ্চয়ই! তোমাব মা-র সঙ্গেও দেখা কবতে হয় একবার। কেমন আছেন তিনি?'

'As usual.'

'আব তুমি —কিন্তু জিগেস ক'বে কী হবে, চোখেই তো দেখছি। Younger every year! সিক্রেটটা কী বলো তো?'

'ম্যাড্রাসেব জলবায়ু দেখছি ফ্রিভলিটিব মস্ত সহায়ক।'

প্রদোষ মাত্রা ছাড়িয়ে হেসে উঠলো। 'তা ফ্রিভলিটি বাদ দিলে জীবনে আব থাকলো কী বলো তো?

'তোমাব স্ত্রীবও কি তা-ই মত?

'আমাব স্ত্রী? তাঁব মতে জীবনটা একটা সুগম্ভীর হিশেবের খাতা। মেযেদেব আত্মা নেই, এমিলি। অবশ্য তোমাকে বাদ দিয়ে বলছি,' দাঁত দেখিয়ে হাসলো প্রদোষ।

'তোমাব সৌজন্যের সীমা নেই।—ট্যাক্সি!'

ট্যাক্সি কাছে এলো। 'গুড-নাইট।' 'আচ্ছা—' প্রদোষ স'রে দাঁড়ালো। তোমাদেব আর ধ'রে রাখবো না। আবার দেখা হবে।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট, মিস্টর বয়।'

'গুড-নাইট' নির্জীব স্বরে সাড়া দিলো ভাস্কর। এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি সে, দাঁড়িয়ে ছিলো আধাআধি পিঠ ফিরিয়ে এমন

একটা ভঙ্গিতে যাতে ঠিক অভদ্রতা না হয়, অথচ নিজের বিচ্ছিন্নতা বেশ বুঝিয়ে দেয়া যায়।

ট্যাক্সিতেও একটুক্ষণ সে কথা বললো না, রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর হঠাৎ এমিলিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগেস করলো:

'লোকটা কে?'

এমিলিয়া তখনই জবাব দিলো, 'তেমন কেউ নয়। চেনা।'

'অনেকদিনের চেনা মনে হ'লো?'

'হ্যাঁ, এককালে দেখাশোনা ছিলো।'

'এক কালে—কবে?'

'কবে? এই বছর তিনেক আগেও আসতো মাঝে-মাঝে। মা ওকে পছন্দ করতেন একটু, আমারও বন্ধু-মতো ছিলো। একটু বোকা, কিন্তু এমনিতে মন্দ না।

কথাগুলি ব'লে এমিলিয়া নিশ্বাস ছাড়লো। স্বীকার ক'রে বাঁচলো যেন। সে গোপন করেনি—না, কিছুই গোপন করেনি। যেটুকু মিথ্যা বলেছে তা না-বললেই নয়। তার—আর ভাস্করের ভালোর জন্যই তা দরকার। আর মিথ্যাও তো না, সে যা বলেছে তা-ই তো সত্য। সে যা বলেছে, তার বেশি প্রদোষ আর কী—কী ছিলো তার কাছে? এই প্রদোষকে সে যে কোনোদিন—ওঃ, এ-কথা কি ভাবাও যায় এখন? কী ক'রে, কী ক'রে সে পেরেছিলো? কিন্তু সে নয়—সে নয়। অন্য-কোনো মেয়ে, যে প্রদোষের সঙ্গে—অন্য-কোনো মেয়ে—সে-মেয়ে এখন মৃত। ভাস্কর তাকে নতুন জন্ম দিয়েছে। সে নতুন, সে অন্য একজন। যে-অতীত তার নিজের নয়, তা নিয়ে তার কিসের ভাবনা? কেন সে মনে করতে যাবে? কী ক'রেই বা মনে করতে পারবে? ও-সমস্তই অন্য একজনের জীবনের কথা, যা সে একবার শুনেছিলো, আর শুনেই ভুলে গিয়েছিলো।

তারপর, ভাস্করের ফ্ল্যাটে ফিরে, এমিলিয়া যখন তার জুতো আর কোট খুলে রেখেছে, আর ভাস্কর সিল্কের পাজামার উপর জড়িয়ে

নিয়েছে হলদে-কালো ড্রেসিং গাউন; যখন বসবার ঘরের ডিভানে তারা বসেছে পাশাপাশি, সীলস্কিন রগ-এ পা জড়িয়ে, আর মিসেস কার্সন সামনে দুটো গেলাশ আর আধ বোতল পুরোনো ব্র্যাণ্ডি রেখে গেছে; যখন বাইরের শীতের পরে নিবিড় হ'য়ে এসেছে আরামের উষ্ণতা; যখন রাত্রি আর নীরবতা ছাড়া কোনোখানে কিছু নেই; তখন এমিলিয়া বললো, ভাস্করের গালের উপর সস্নেহে গাল রেখে:

'মনামি, কী হয়েছে তোমার? কথা বলো!'

ভাস্কর মুখ ফিরিয়ে তার চোখের দিকে তাকালো, দীর্ঘ এক মুহূর্ত ভ'রে। সবল, উজ্জ্বল চোখ; কোনো দ্বিধা নেই। তারপর প্রিয়ার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলো:

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

এমিলিয়া উত্তর দিলো, সহজভাবে—'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না।' তারপর এক মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ পরে: 'তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি।'

ভাস্কর চমকে উঠলো একটু। একটু যেন ম্লান হ'লো তার মুখ। এমিলিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, 'সত্যি?'

নিশ্বাস পড়লো এমিলিয়ার। 'কত সত্য, তুমি যদি জানতে!'

মধু-রঙের মদিরার পাত্র ভাস্কর এমিলিয়ার হাতে তুলে দিলো। ঠোঁট ছুঁইয়েই নামিয়ে রাখলো এমিলিয়া। কিছু তার ভালো লাগছিলো না। মনে তার উদ্বেগ, তার প্রেমিকের মুখে ছায়া পড়েছে। হাতে গ্লাশ নিয়ে ভাস্করও চুপ। তারপর হঠাৎ:

'ঐ লোকটা—সে তোমার বন্ধু ছিলো?'

এমিলিয়া হাসলো তার সুন্দর দাঁতে ঝিলিক দিলো আলো। 'বন্ধু? না—তাও না। An acquaintance, a mere acquaintance.'

কিন্তু ভাস্করের মুখ গম্ভীর, অন্ধকার। স্থির হ'য়ে ব'সে আছে সে, কঠিন চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ঠিক তেমনি ব'সে-ব'সেই বললো:

'সে তোমাকে এমিলি ব'লে ডাকে।'

'মানুষের নাম নিয়ে মানুষে ডাকে না ? মনামি, তোমার হয়েছে কী আজ ?'

'সে তোমাকে এমিলি ব'লে ডাকে,' ভাস্কর আবার বললো। 'আমার তা ভালো লাগে না।'

'অনেকেই তো ডাকে।'

'তার গলার স্বর—অন্য রকম। তার ডাকার ধরন—অন্য রকম।' ব্র্যাণ্ডিতে একবার চুমুক দিলো ভাস্কর।

এমিলিয়ার চোখ অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, কষ্টে। ভাস্করের আরো একটু কাছে ঘেঁষে বললো, 'এ-সব কথা কেন বলছো, এ-সবের অর্থ কী ?'

তবু ভাস্কর তার দিকে তাকালো না। আস্তে বললো, 'তুমি তাকে তোমার বাড়ি যেতেও বললে।'

আতঙ্ক ফুটে উঠলো এমিলিয়ার চোখে। সে কি ভাস্করকে হারাতে যাচ্ছে আজ এতদিন পর এই কারণে ? আ—ভাস্করকে হারালে কেমন ক'রে বাঁচবে সে ? এই প্রেম না-থাকলে কেমন ক'রে বাঁচবে ? দু-হাতে সে জড়িয়ে ধরলো ভাস্করের ঈষৎ আনত শরীর, ছাঁটা চুলের নিচে তার ঘাড়ের উপর মুখ চেপে ধরলো। ভাঙা-ভাঙা গলায় ডাকলো :

'কারো মিয়ো, কারো মিয়ো।'

ভাস্কর স্তব্ধ, নিশ্চল। মেঝের উপর আটকে আছে তার চোখ। এমিলিয়া স'রে এলো না, তার কানের কাছে গুনগুন ক'রে বলতে লাগলো :

'আমি তোমাকে ভালোবাসি! আর কাউকে কখনো ভালোবাসিনি—কোনোদিন, কোনোদিন না। বোঝো না কেন ? কেন আমাকে কষ্ট দাও ? তুমি আমাকে কষ্ট দিলে কেমন ক'রে বাঁচি বলো তো।' বলতে-বলতে দু-হাতে জোর ক'রে ভাস্করের মুখ ফেরাতে চাইলো তার দিকে।

ভাস্কর আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালো। 'তোমার সঙ্গে ঐ লোকটার—কখনো কিছু—'

'কেন আমাকে কষ্ট দাও ?' আর্ত স্বরে ব'লে উঠলো এমিলিয়া। 'কেন আমায় সব জেনেও কষ্ট দাও ? বাড়িতে আসতে বলা—সেটা কি কোনো অপরাধ ? ভদ্রতা—ভদ্রতাতেও দোষ ? তাছাড়া, আমি না-বললেও ও যেতোই। মনামি, এই তুচ্ছ কারণে নিজেও কি তুমি কষ্ট পাচ্ছো না ? ঐ লোকটা—তার কি এতই মূল্য যে তুমি আর আমি তাকে নিয়ে এত সময় নষ্ট করতে পারি ?'

শেষের কথাগুলি ভাস্করের মনে লাগলো। সহজ হ'লো তার শরীরের রেখা। এমিলিয়ার এক হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললো, 'এত যন্ত্রণা—তোমাকে ভালোবাসি ব'লেই এত যন্ত্রণা, এমিলি !'

কিন্তু যে-মুহূর্তে সে নিজের মুখে এমিলি নাম উচ্চারিত হ'তে শুনলো, আবার তার মনে প'ড়ে গেলো প্রদোষ ঘোষকে। মনে পড়লো সেই আত্মপ্রসন্ন মুখ, নির্বোধ হাসি, কণ্ঠস্বরের মোটা মাধুর্য। চকিতে হাত সরিয়ে নিলো, শূন্যে রেখা আঁকলো আঙুল দিয়ে যেন কোন অশুভ আবির্ভাব তাড়িয়ে দিতে। তারপর যেন নিজের কাছে নিজেরই লজ্জায় হাতের মধ্যে মুখ ঢাকলো।

এমিলিয়া নিচু হ'য়ে বলতে লাগলো, অস্ফুট গুঞ্জনে, যেন নিজেরই মনে-মনে :

'বোঝা না কেন ? বোঝো না কেন ? আমি তোমার। আমার জীবন তোমার। আমার মৃত্যু তোমার। মুখ তোলো তুমি। আমার দিকে তাকাও। তুমি যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো আমি তাহ'লে বাঁচি কেমন ক'রে !'

হাত সরিয়ে নিলো ভাস্কর, যন্ত্রণা ভরা চোখ তুলে তাকালো।

'তুমি কখনো—কখনো ঐ লোকটা'কে—'

এমিলিয়া বললো, নিতান্ত সহজ সুরে, 'কোনোদিন না, কোনোদিন না।'

আর হঠাৎ তার স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখে বিশ্বাস দেখতে পেলো ভাস্কর। শান্তি নামলো তার মনে, দিগন্তে সন্ধ্যার মতো। অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে সে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকলো প্রিয়ার চোখের দিকে, চোখের মধ্যে। কেউ কোনো কথা বললো না। তারপর হঠাৎ এমিলিয়ার দু-পায়ের মধ্যে মুখ চেপে ধরলো ভাস্কর। ব'লে উঠলো, 'ক্ষমা করো।' এমিলিয়ার দুই পা চুম্বনে আচ্ছন্ন ক'রে দিলো। 'ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও কষ্ট পেয়েছি নিজে। আর এত কষ্ট—তা তোমাকে ভালোবাসি ব'লেই। এমিলি, তোমাকে ভালোবাসি!' বলতে-বলতে ভাস্করের সুগঠিত ঠোঁট এমিলিয়ার হাতে বাহুতে, বক্ষে, বক্ষের উপত্যকায় চুম্বন ছড়াতে-ছড়াতে চ'লে গেলো।

মাথা হেলিয়ে চোখ বুজলো এমিলিয়া। নিশ্বাস ছেড়ে ডাকলো, 'মনামি!'

আবার উন্মাদনা, অসহ্য উন্মাদনায় কাটলো কয়েকটা দিন। তারাও যেন পরস্পরকে এমন হিংস্রভাবে আর ভালোবাসেনি।

বিশ্ব গ্রাস ক'রে নিলো তাদের প্রেম। বাসনার ক্ষয় নেই, আনন্দের অন্ত নেই। প্রতি মুহূর্তে প্রেমের কোনো নতুন রহস্যের উন্মোচন। প্রতি মুহূর্তে নতুন কোনো ভঙ্গি, নতুনতর আদর। প্রেমের পেয়ালায় পান করলো তারা সবশেষ তলানিপুঞ্জ পর্যন্ত, নিংড়ে নিলো নিঃশেষে—যতক্ষণ না নিজেদেরই বুক ব্যথায় উঠলো টনটন ক'রে। আ—তবু কি এর শেষ আছে! প্রেমের ইন্ধন প্রেম; আগুন থেকেই আরো আগুন জ্ব'লে ওঠে। আনন্দ নিজেকে অসীমে নিয়ে চলে মুহূর্তের সঙ্গে মুহূর্ত যোগ ক'রে। আর না, আর যেন সহ্য হয় না—জীবনে এও আছে ভাবিনি কখনো—কিন্তু এত ক্ষুদ্র শরীর নিয়ে কেমন ক'রে অসীমকে সহ্য করি!

কাছে এলো ক্রিসমাস, শহর সাজলো উৎসবের বেশে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ব'সে, কিংবা গাড়িতে যেতে-যেতে চৌরঙ্গির ইলেকট্রিকের মালার দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া মনে-মনে বলেছে :

'কলকাতা এত সুন্দর—সে এখানে আছে ব'লে, এখ নেই আমি তাকে পেয়েছি ব'লে।'

রোজই তাদের দেখা হয় আজকাল—কিন্তু সারাদিন এক সঙ্গে থেকেও বিদায়ের মুহূর্তটি কী নিষ্ঠুর! দরজা থেকে ফিরে-ফিরে আসে এমিলিয়া, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'ন—তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমি পারি না।' শেষটায় নিয়ে যায় নিজেকে ছিনিয়ে; মনে-মনে ভাবে, কতটুকু আর—কাল, কালই তো আবার দেখা হবে। একটু পর থেকেই বিচ্ছেদ হ'য়ে ওঠে প্রতীক্ষা।

এমিলিয়া আসে বিকেলে, ক্ষণিক সোনালি শীতের বিকেলে; চায়ের পরে নিবিড় হ'য়ে ব'সে থাকা, পরস্পরের সত্তার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ; সন্ধ্যার পরে বেরোনো—বেড়ানো—যে-কোনো দিকে, যে-কোনো রাস্তায়, যার নাম শোনেনি, আগে যেখানে যায়নি কোনোদিন—কলকাতাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করছে তারা, চিরকালের চির-চেনা কলকাতাকে। খিদে পেলে খেয়ে নেয় কোথাও—নামজাদা রেস্তোরাঁয় না,—সেখানে চেনাশোনা কেউ-না-কেউ থাকবেই—গলির নোংরা অখ্যাত কোনো দোকানে, মালিক এস্ত হয় তাদের দেখে, নিজেই উঠে খাবার নিয়ে আসে, চামচে কাঁটা বদলে দেয়—এটা একটু নেবেন কি? ওটা একটু চেখে দেখবেন?—যেন ভেবেই পায় না কেমন ক'রে যথেষ্ট আপ্যায়ন করবে—কিন্তু অতিথিদের ভাব দেখে মনে হয় তারা দেবতার খাদ্য ভোগ করছে। এমিলিয়া হাসে ছেলেমানুষের মতো—কী ভালো, কী ভালো লাগে সে-সব গরিব দোকানে, কোনোদিন বা পরোটা কাবাব গরম কফি, আর কোনোদিন বা চৌ-চৌ আর কয়েক পেয়ালা চৈনিক চা। সাত প্রস্থ ডিনারের বদলে—যাতে খাওয়ার চাইতে দেখাটাই বেশি, দেখানোটাই বেশি—কী ভালো এই সাধারণ খাদ্য, সাধারণ পানীয়, আর এই যা-খুশি বলার কিংবা কিছুই না-বলার স্বাধীনতা। ভালো, সব ভালো—কোনো অভাব নেই, কিছু আর চাইবার নেই, পরস্পরেই তারা পূর্ণ। পরস্পরেই মগ্ন তারা, পরস্পরেই বিশ্বের কেন্দ্র

তাদের—আর-কিছু নেই, আর-কেউ নেই, একজনের শুধু আর-একজন আছে। একজনের শুধু অন্য জন।

একদিন দুপুরবেলা ভাস্কর গেলো ক্লাইভ স্ট্রীটের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে। বেরিয়েই ফুটপাতে প্রায় ঠোকর খেলো প্রদোষ ঘোষের সঙ্গে। প্রদোষই আগে কথা বললো, 'হ্যালো!'

দাঁড়াতে হ'লো। আজ প্রদোষের দিকে তাকাতে তেমন যেন বিতৃষ্ণা হ'লো না ভাস্করের। যেন দিনের আলোয় আর বালু-রঙের ফ্ল্যানেলে তাকে ঢের বেশি ভদ্রলোকের মতো দেখাচ্ছে।

কয়েক পা একসঙ্গে হাঁটলো দু-জনে। তারপর প্রদোষ বললো, 'আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত?'

'না, তেমন না, তবে—'

'তাহ'লে—যদি কিছু মনে না করেন—আমি ভাবছিলুম কোথাও গিয়ে এক কামড লাঞ্চ খেয়ে নেবো—আপনার সঙ্গসুখ পেতে পারি কি?'

ভাস্কর ঘড়ির দিকে তাকালো। একটা-বারো। দুটোর সময় এমিলি আসবে। ফিরতে যদি দেরি হ'য়ে যায়? 'না—' সে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লো, 'I am afraid—'

কিন্তু প্রদোষ বন্ধুভাবে তার কাঁধে টোকা দিয়ে বললো, 'আহা—আসুন না—এই তো এখানে—we shan't be two minutes. Please!'

প্রায় মিনতি করলো প্রদোষ। তার চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ শরীরের সঙ্গে কী বেমানান এই ছেলেমানুষি কথা বলার ধরন। মুখটাও যেন বালকের—ভাস্কর ভাবলো—এ-মুখের কোনো অতীত নেই, স্মৃতির ভারে পীড়িত নয় এ। ছেলেমানুষ, সত্যি বলতে। আর একে নিয়েই কী ঝড় সেদিন তুলেছিলো সে!—বাজে! ভাস্করের হৃদয় যেন দ্রব হ'লো, এড়াতে পারলো না, এলো প্রদোষের সঙ্গে পেলিটিতে।

ভাস্কর শুধু স্যুপটা খেলো, আর একটু পয়ক্রেট, আর প্রদোষ যতক্ষণ ধ'রে এক প্লেট মটন অদৃশ্য ক'রে দিলো, চেয়ারে হেলান দিয়ে

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো সে। তারপর কফির পেয়ালায় গল্প শুরু হ'লো। কথা বললো প্রদোষ প্রায় একাই। স্কুল-পালানো ছেলের মতো স্ফূর্তি তার। মৃদু, নরম চোখ, দিলখোলা গলার আওয়াজ—সহজেই ভাব করতে চায়, মিশে যেতে চায়। বেশিক্ষণ দূরত্ব রাখতে পারে না—এর দূরত্বে আর সান্নিধ্যে তফাৎ খুব নেই ব'লেই বোধহয়।

হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রদোষ বললো, 'আপনাকে টেনে এনে ভালো করিনি। আপনার ভালো লাগছে না।'

'আপনার ভালো লাগা দেখে ভালো লাগছে।'

'কিছুই কথা বলছেন না?'

'সুযোগের অপেক্ষায় আছি।'

হা-হা ক'রে হেসে উঠলো প্রদোষ। 'হ্যাঁ—বড্ড কথা বলি আমি—বলতে ভালোও বাসি খুব!'

'আর আমি শুনতে,' ব'লে ভাস্কর কফির পেয়ালায় চুমুক দিলো।

আবার হেসে উঠলো প্রদোষ, এবার একটু নিচু গলায়। 'এই দেখুন না, টেনে আনলাম তো। যদিও ভালো ক'রে আলাপও ছিলো না আগে। তা সকলের সঙ্গেই তো প্রথম কখনো আলাপ হয়!'

ভাস্কর আড়চোখে ঘড়ি দেখলো একবার। 'তা সত্যি।'

'তাছাড়া দেখুন, আপনি আমার একেবারে অচেনাও ঠিক নন। আপনি এমিলির বন্ধু। অতএব আপনি আমারও বন্ধু।'

মুহূর্তের জন্য, ভাস্করের হৃৎপিণ্ড যেন সংকুচিত হ'লো; তারপর বিস্ফারিত হ'য়ে রক্ত ছড়িয়ে দিলো তার মুখে। প্রদোষ কিছু লক্ষ্য না-ক'রে বলতে লাগলো:

'এমিলি—কেমন আছে ও? কী করছে আজকাল? সেদিন গিয়েছিলুম ওদের বাড়ি—দেখা হ'লো না। ও নাকি প্রায়ই বাড়ি থাকে না আজকাল। আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়?'

'হয় মাঝে-মাঝে,' নির্জীব গলায় জবাব দিলো ভাস্কর।

'ও ভালো আছে? সুখে আছে এখন?' হঠাৎ জিগেস করলো প্রদোষ।

'আমি—আমি তা কেমন ক'রে জানবো ?'

'কিছু মনে করবেন না, কথাটা এমনি—হঠাৎ মনে হ'লো। আমার মনে পড়ে, অসুখী হবার অসীম ক্ষমতা ছিলো ওর। আগেকার কথা সে-সব। আমি তখন কলকাতায় নতুন চাকরিতে—তারপর সেদিন ওকে দেখলুম আপনার সঙ্গে—যেন অন্য কেউ।' একটু থামলো প্রদোষ, আর-একটু কফি ঢেলে বললো, 'সত্যি—এত সুন্দর আমি ওকে কখনো দেখিনি। এত সুন্দর ও ছিলো না—মনে হয় এই সেদিনও ছিলো না।' তার চোখের ভাব বদলে গেলো, হঠাৎ যেন সাবালক দেখালো, তার মুখ—ভাস্কর চোখ ফেরাতে পারলো না সেখান থেকে—তার মুখ এখন অন্য রকম—কোন অতীত ছায়া ফেলেছে সেখানে।

'তারপর—তার পরেই আমাকে বদলি ক'রে দিলো লক্ষ্ণৌ—ম্যাড্রাস—চাকরির দায়—কিন্তু কলকাতাকে ভুলতে পারবো না, ক্ষমা করতেও পারবো না তাকে। মুগ্ধ করেছে আমাকে—মগ্ন করেছে।' একটি হাসি ফুটলো তার মুখে, মুহূর্তের জন্য সুন্দর হ'লো প্রদোষ, ভাস্করের চোখের তারা পাথর হ'য়ে গেলো। 'Well!' কফিতে শেষ চুমুক দিলো প্রদোষ 'Well! আপনার বোধহয় দেরি করিয়ে দিলুম—বোস, বিল!'

বাইরে, শীতের হলদে রোদ্দুর ভাস্করের মনে হ'লো যেন কালির আঁচড়, কালো। তার চোখের পাতা উঠলো পড়লো বারেকবার। 'ঈশ্বর,' মনে-মনে সে বললো, 'ঈশ্বর!' যেন বিশাল অন্ধকারের কেন্দ্রে সে দাঁড়িয়ে। কঠিন, নিষ্ঠুর অন্ধকার। কালো, কিন্তু মাঝে মাঝে লাল, রক্তের মতো। উজ্জ্বল-লাল, লাল আপেলের মতো রঙের, বাসনার সেই চিরন্তন ফল—রক্তের মতো উজ্জ্বল। কঠিন, নিষ্ঠুর, উত্তপ্ত ঘৃণা। অন্ধ হ'য়ে গেলো ভাস্কর, অন্ধভাবে উঠে বসলো ট্যাক্সিতে। হঠাৎ রাস্তার ঘড়ি চোখে পড়লো—দুটো বেজে সাত। দেরি হ'য়ে গেছে—সে এসে ব'সে থাকবে। আর হঠাৎ তার মনে হ'লো:

'সে মিথ্যে বলেছে আমাকে।' আর সারা পথ, যেন মূর্ছার মধ্যে মনে-মনে বলতে লাগলো:

'সে মিথ্যে বলেছে। প্রতারণা করেছে। ঐ লোকটাকে সে ভালোবাসতো। নিশ্চয়ই। নয়তো হঠাৎ তার হাসি অমন সুন্দর হ'য়ে উঠবে কেন ?'

আর তারপর, নির্বোধের মতো, বার-বার :

'সে মিথ্যে বলেছিলো—আমাকে সে মিথ্যে বলেছিলো।'

বসবার ঘরে এমিলিয়া ব'সে, স্তব্ধ, একাগ্র, হাতে থুতনি রেখে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে। 'সে আরাম ক'রে বসেনি পর্যন্ত,' ভাস্কর মনে-মনে বললো, 'যে-কোনো লোক এখন তাকে দেখে বলবে সে অপেক্ষা করছে, সবচেয়ে যাকে ভালোবাসে ব'সে আছে তারই অপেক্ষায়।'

এমিলিয়া উঠে দাঁড়ালো ভাস্করকে দেখে, রুপোলি শাড়ি ঝলমলিয়ে উঠলো তার গায়ে। 'চোখ ঝলসে যায়,' ভাস্কর মনে-মনে বললো, 'এমন সুন্দর ! ঠিক বলেছিলো সে ।'

'এত দেরি করলে !'

ভাস্কর কথা বললো না, ডিভানের মধ্যে ডুবে গেলো। এমিলিয়ার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। 'তুমি যতক্ষণ আসোনি—' কিন্তু তার প্রেমাস্পদর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো এমিলিয়া। সে-মুখ যেন চেনা যায় না। ম্লান, মোমের মতো ফ্যাকাশে। চুল পড়েছে কপালে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, তার চোখ যেন ভীষণ কিছু দেখে ফেলে স্থির হ'য়ে গেছে।

ভয় পেলো এমিলিয়া, ছুটে গিয়ে ভাস্করের পাশে বসলো। হাত তুলে নিলো নিজের হাতে।

—'কী ? কী হয়েছে ? কেমন দেখছি তোমাকে !'

ভাস্কর হাত সরিয়ে নিলো, কথা বললো না।

আর হঠাৎ এমিলিয়ার সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে জ'মে গেলো। নড়তে পারলো না, সরতে পারলো না, দীন প্রার্থনার মতো আওয়াজ বেরোলো গলা দিয়ে :

'আমাকে বলবে না ? কী হয়েছে আমাকে বলবে না ?'

ভাস্কর চুপ। 'বলো—' আবার কথা বললো এমিলিয়া—'কথা বলো—তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও ?'

তবু ভাস্কব নীরব। এমিলিয়া স্তূপ হ'য়ে ভেঙে পড়লো মেঝের উপর ; মিনতিময় চোখ তুলে বললো : 'তুমি এত নিষ্ঠুর ! তোমার কি দয়াও হয় না ?'

তখন ভাস্কর বললো মোটা গলায় এমিলিয়াব দিকে না-তাকিয়ে, 'প্রদোষ ঘোষের সঙ্গে আমাব দেখা হয়েছিলো।'

অনেক, অনেকক্ষণ এমিলিয়া প'ড়ে রইলো স্তব্ধ, যেন নিষ্প্রাণ। আস্তে উঠে দাঁড়ালো তারপব, যখন কথা বললো, সে যেন অন্য কাবো কণ্ঠস্বরে :

'সে কি তোমাকে—কিছু বলেছে ?'

'সব জেনেছি আমি—সব।'

'সব জেনেছো ?' এমিলিয়া মূঢ়েব মতো কথাটা আওড়ালো।

'তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে। তুমি তাকে ভালোবাসতে।'

একটু দূরে বসলো এমিলিষা, সোজা তাব সামনেব দিকে তাকিযে। যেন কাউকে লক্ষ্য না-ক'রে বলতে লাগলো :

'না—সব জানোনি। যদি জানতে—বুঝতে—যদি আমি বোঝাতে পারতাম ! আমি দুর্বল, তাই লুকিয়েছিলাম তোমাব কাছে। লুকিয়েছিলাম ? না—তাও না ; লুকোবার কী আছে ? তুচ্ছ, তুচ্ছ। ওতে কি কিছু এসে যায ? ও কিছুই নয, লুকোবাবও যোগ্য নয়। কিন্তু ভেবেছিলাম—তোমাব কথাই—তোমাব আমার সুখের কথাই ভেবেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো। এখন তোমাকে সব বলছি—শোনো।'

কিন্তু ভাস্কর শুধু বললো : 'তুমি মিথ্যে বলেছো, তুমি প্রতারণা করেছো আমার সঙ্গে।'

'প্রতারণা ? না। আমি কী ছিলাম, আগে কী করেছিলাম, তার কি এখন কোনো অর্থ আছে ? তুমি কি বোঝো না—তুমি কি এটাও বোঝো না—যে তোমার আগে ভালোবাসার কোনো অস্তিত্বই

ছিলো না আমার জীবনে। জানতাম না—কিছুই জানতাম না—তোমাকে পাবার আগে ভালোবাসার অর্থ আমি জানিনি। অন্য সব মেকি—বানানো—মিথ্যা—ভালোবাসাই প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে, আমি কোনো প্রতারণা করিনি।'

ভাস্কর মাথা নেড়ে বললো :

'ও তোমার সেখানেই ছিলো, আমি এখন যেখানে আছি।'

'না—না—না! কী ক'রে তুমি বলতে পারলে ও-কথা! কখনো তা হয়নি, কখনো হবে না, হ'তে পারে না! তুমি আমার প্রথম, তুমি আমার শেষ, তুমি আমার একমাত্র!'

তারপর, তবু তার প্রিয়তমকে বিমুখ দেখে :

'শোনো—আর একটু শোনো—আমি একা ছিলাম। ওঃ, মনামি,' নিজেরই অজান্তে তার প্রিয়-সম্বোধন বেরিয়ে পড়লো, 'বড়ো একা, বড়ো ক্লান্ত, জীবনে কিছু ছিলো না আমার। তখন তুমি কেন এলে না? কেন এত দেরি করলে? আমার অপেক্ষা করা উচিত ছিলো, কিন্তু আশা করার সাহস ছিলো না। চারদিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো জীবনের আর কিছুই আমাকে দেবার নেই। সে এসেছিলো, আমি তাকে নিয়েছিলাম। কিন্তু কী এসে যায় তাতে, কী এসে যায় বলো তো? শূন্য, অর্থহীন—কোনো অর্থ নেই তার। তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি, শুধু তোমাকে—শুধুই তোমাকে, মনামি!'

'মিথ্যে। মিথ্যে বলছো!'

চোখে জল এলো এমিলিয়ার। 'তবু বুঝবে না—তবু বুঝবে না তুমি? তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?'

'মিথ্যা! সব মিথ্যা তোমার! আর আমি শুনতে চাই না!'

দরদর ক'রে জল পড়তে লাগলো এমিলিয়ার চোখ দিয়ে। ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো 'কিন্তু তোমার কথাও কি মিথ্যা? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না? এ-ও কি সম্ভব যে তোমার ভালোবাসা এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেলো? আর কি আমার মুখের দিকেও তাকাবে না তুমি?' বলতে-বলতে ছুটে গেলো ভাস্করের কাছে, তার

মুখ টেনে আনতে চাইলো নিজের দিকে। কিন্তু ভাস্কর কঠিন হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে থাকলো, আস্তে তাকে ঠেলে দিয়ে বললো :

'না, তুমি যাও।'

'তুমি আমাকে যেতে বলছো?'

'তা-ই ভালো। তুমি যাও।'

'কিন্তু তুমি পারবে? তুমি থাকতে পারবে?'

ভাস্কর আবার বললো, 'তুমি যাও।'

আর এমিলিয়া বিড়বিড় ক'রে বললো, নির্বোধের মতো : 'সে আর আমাকে ভালোবাসে না।'

নিঃশব্দে কাটলো কিছুক্ষণ। বিকেল হ'য়ে এলো—এমিলিয়ার মনে পড়লো—মিসেস কার্সন চা নিয়ে আসবে এখনই। সে কি ততটুকুও থাকতে পারে না? না, তাকে যেতে বলেছে, তাকে যেতে হবে। এখনই। এমিলিয়া সমস্ত শরীরে কেঁপে উঠলো।

উঠে দাঁড়ালো ধীরে। আয়নার কাছে গিয়ে চোখ মুছলো, পাউডর ছোঁয়ালো মুখে। তারপর, যেতে-যেতে, ভাস্করের সামনে দাঁড়িয়ে :

'কিন্তু তোমাকেই আমি ভালোবাসতাম।'

ভাস্করের মুখের পেশী নড়লো না। এমিলিয়া আরো একটু এগোলো, দরজার হাতল ধ'রে দাঁড়ালো একবার, মুখ ফিরিয়ে আবার বললো, 'তবু এটা জেনে রাখো আমি তোমাকেই ভালোবাসি।'

তারপর বেরিয়ে গেলো দরজা দিয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে ভাস্করের বুকের মধ্যে কোথায় যেন কী-একটা ছিঁড়ে গেলো। যেন ধনুকের ছিলা, এতক্ষণ প্রাণপণে কানে-কানে টেনে রেখেছিলো, কিন্তু আর টান সইলো না, টুকরো হ'লো এবার। টুকরো হ'লো সে, ভেঙে পড়লো, ক্লান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষ। শেষ—সব শেষ—সে নেই—কিছু নেই—আর ফিরবে না—আর তাকে দেখবো না কোনোদিন।

ভাস্কর ভাবতে চেষ্টা করলো কী হয়েছে, কী হ'য়ে গেলো ; কিছুই মনে করতে পারলো না। কিছু আর ভাবতে পারে না সে ; কিছু আর ভাববার নেই। ঘুম, ঘুমোবে এখন। ঘুম, মৃত্যু। 'ঘুমকে তোমরা কামনা করো, আর মৃত্যুকে তোমরা ভয় পাও, অথচ ঘুমও তো মৃত্যু।' আ—ঘুম যদি মৃত্যু হ'তো। যদি সে সেই ঘুম ঘুমোতে পারতো, যে-ঘুম থেকে আর জাগতে হয় না।

টলতে-টলতে শোবার ঘরে গেলো সে, নিজেকে ছুঁড়ে ফেললো বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গেই তলিয়ে গেলো অচেতনে, মিসেস কার্সন চায়ের ট্রে নিয়ে দরজা থেকে ফিরে গেলো।

ঘুম ভাঙলো অন্ধকারে। কিছুই বুঝলো না প্রথমে, কিছুই চোখে দেখলো না। এত অন্ধকার কেন? শুয়ে আছে কেন? তারপর তপ্ত স্রোতে মনে পড়লো সব। না, না, জাগবো না—ঘুম। কিন্তু আবার চোখ বুজতে গিয়ে হঠাৎ দেখলো এমিলিয়ার মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। তাকিয়ে-তাকিয়ে বুঝতে পারলো স্বপ্ন নয়।

'কত ঘুমোবে? ওঠো।' এমিলিয়া হাত রাখলো তার কপালে।

দুই হাত বাড়িয়ে ভাস্কর তাকে টেনে নিলো বুকের উপর। 'তুমি এসেছো।'

এমিলিয়া বললে, ভাস্করের পাশে বালিশে মাথা রেখে : না-এসে পারলাম না—পারি না।'

'এমিলি!' গাঢ় স্বরে ডাকলো ভাস্কর।

তারপর অন্ধকার। তারপর স্তব্ধতা। তারপর রক্তের সমুদ্রের বিশ্ব-মুছে-নেবা বন্যা।

আর তারপর, যখন বন্যা তাদের রেখে গেলো বাসনা-বেলায় অলস, অসহায়, দয়িতের সত্তাসারে আচ্ছন্ন, এমিলিয়ার দুই চোখ আবার জলে ভ'রে উঠলো। ভাস্কর তার চোখের ভিতরে তাকালো, যেন কোনো রহস্যময় চাঁদের অন্তরে। জিগেস করলো :

'কী হয়েছে, কাঁদো কেন?'

'কথা বোলো না, কাঁদতে দাও। তোমাকে ফিরে পাবার সুখ না-কাঁদলে কি সইতে পারি!' চোখ ভরা জল নিয়েই একটুখানি হাসলো এমিলিয়া। চোখ বুজে গুনগুন ক'রে বললো, 'ভালোবাসো, ভালোবাসো আমাকে—ভালোবাসা দিয়ে ঘুম পাড়াও।' ভাস্করের একটি হাত জড়িয়ে নিলো নিজের গলায়, আস্তে-আস্তে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

ভাস্কর জেগে থাকলো পাশে, কান পেতে শুনতে লাগলো প্রিয়তমার নিশ্বাস। শীত করছে ওর?—লেপ টেনে বুক অবধি তাকে ঢেকে দিলো। একবার হাত রাখলো সেই বুকের উপর, উষ্ণ, উষ্ণ, জীবনের স্পন্দন—তার নিজের জীবনের স্পন্দন সেখানে শুনতে পেলো। আ—কেন সে বুঝতে পারেনি কত সে ভালোবাসে এই শরীর—এই প্রাণময়ী প্রতিমা! অন্ধকারে, ভাস্করের হাত একটু ঘুরে বেড়ালো এমিলিয়ার ঠোঁটে, গালে, গলায়। কী গভীর ঘুমোচ্ছে, কী শান্তি!

ভাস্কর উঠে আলো জ্বাললো ঘরে। এমিলিয়া একটু ন'ড়ে উঠলো, কিন্তু তার ঘুমে আঁচড় পড়লো না। আর ভাস্কর সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে। ঈশ্বর, ঈশ্বর, কে জানতো আমি ওকে এত ভালোবাসি!

ঘুমের মধ্যে এমিলির ঠোঁট নড়লো, অস্ফুটে ডাকলো, 'মনামি!'

আর হঠাৎ, শান্তির দীপের মতো, এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সত্য উপলব্ধি করলো ভাস্কর। এই তো চরম, এই তো চরম মুহূর্ত। সে ফিরে এসেছে আমার কাছে; এর বেশি কখনো আমাকে ভালোবাসবে না, এর বেশি আমি তাকে ভালোবাসবো না। জীবনে কিছু নেই যার ক্ষয় নেই—এরও আছে—হয়তো এর পরেই আরম্ভ হবে ক্ষয়।—তাহ'লে—তাহ'লে থাকলো কী জীবনে? না, না, সেই সর্বনাশ ঠেকাতেই হবে! আর না—এর পরে আর না। এই মুহূর্তই শেষ হোক, এই মুহূর্তই চিরন্তন হোক।, এই মুহূর্ত চিরকাল হোক।

ভাস্কর নিচু হ'লো এমিলিয়ার মুখের উপর। আ—ঘুমের মধ্যে হাসছে! ঘুমের মধ্যেও আমারই কথা ভাবছে। কাল যদি আর না ভাবে? আ—কাল! কাল যদি প্রেম চ'লে যায়? যদি কখনো—যদি কখনো—ঈশ্বর, ঈশ্বর, কেমন ক'রে কালস্রোত আমি ঠেকাতে পারি!

এমিলিয়ার নিশ্বাসের ওঠা-পড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো ভাস্কর। এই আন্দোলন তারই জন্য এখনো, প্রতি মুহূর্তের এই হৃৎস্পন্দন এখনো শুধু তাকেই চায়। স্তব্ধ ক'রে দাও; পরিবর্তনের অতীত, বিস্মৃতির অতীত, সময়ের অতীত! আলো ওর চোখে লাগছে; আলো নেবাও, নামুক অন্ধকার, অসীম, চিরকালে কল্লোলিত হোক প্রেম।

ভাস্করের দুই হাত এমিলিয়ার গলার উপর নামলো। প্রিয় স্পর্শে হাসি ফুটলো এমিলিয়ার ঘুমন্ত মুখে। এত ভালোবাসা কোনখানে ধরবে? এই শরীরে? না, রক্তমাংস শুধু বাধা দেয়, অসীমকে শৃঙ্খলে বাঁধতে চায় এত তার স্পর্ধা! ছিঁড়ুক সেই শৃঙ্খল!

আস্তে-আস্তে, অতি গভীর প্রেমে, ভাস্করের জোরালো আঙুল গভীর হ'য়ে ব'সে গেলো এমিলিয়ার গলায়। ফুলে উঠলো নীল শিরা। এতক্ষণে, এতক্ষণে পরিপূর্ণতা! এমিলি, আর কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে তুমি? এখন চিরকাল তুমি আমার, চিরকালের মধ্যে তুমি আমার। তোমার জীবন আমার দু-হাতের মধ্যে পেয়েছি; আ—এতক্ষণে সম্পূর্ণ ক'রে পেয়েছি, দুই হাতের মধ্যে পেয়েছি তোমাকে এতক্ষণে। এখন আর আমাকে ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না।

বিস্ফারিত হ'লো এমিলিয়ার চোখ, প্রশ্নের মতো প্রকাণ্ড হ'য়ে খুলে গেলো। লাল চোখ, ভাস্কর মনে-মনে বললো, রক্ত। খুলে গেলো এমিলিয়ার মুখ—বোধহয় কিছু বলতে চাইলো, অস্পষ্ট চাপা আওয়াজ শুধু বেরোলো। আরো—আরো বড়ো হ'লো চোখ—গোল গর্তের মতো মস্ত দেখালো হাঁ। 'কী সুন্দর ওর দাঁত!' ভাবলো ভাস্কর।

নিশ্বাসের ঝাপট উঠলো এমিলিয়ার শরীরে—ঝড়—যেন পাখির ঝাঁক ঝাপট দিচ্ছে ঝড়ের মধ্যে। আ, ওর কষ্ট হচ্ছে। ভাস্কর

দু-হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলো তার বুক—আরো—আরো জোরে। অদ্ভুত একটা শব্দ হ'লো হঠাৎ—যেন ভূমিকম্পে কোথাও কিছু ফেটে গেলো। তার পরেও কাঁপলো অনেকক্ষণ সেই প্রিয়তম শরীর—যেন ঢেউয়ের পর স্মৃতির ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো—তারপর তাও মিলিয়ে গেলো, প'ড়ে থাকলো নিস্পন্দ হ'য়ে এমিলিয়ার তখনো সুন্দর শরীর—আর হাঁ-খোলা স্তব্ধ মুখটা দাঁতের ঝলকে বীভৎস দেখালো।

কিন্তু ভাস্কর সেই মুখের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকলো চুপ ক'রে। মনে-মনে বললো:

'আর ভয় নেই। এখন সে চিরকাল আমার।'

দু-একটা স্বর

আঃ, বাঁচা গেলো। এই তিন ঘণ্টা সময় স্বপ্নের মতো কেটেছে তার। স্বপ্নের প্রলাপের মতো, একশো-চার ডিগ্রি জ্বরের সম্মোহনের মতো। চারদিকে কত কিছুই হচ্ছে, কিন্তু কিছুই তার মনকে ঠিক ছুঁতে পারছে না, পৌঁছতে পারছে না তার চেতনায়। অথচ যা-কিছু হচ্ছে সব তাকে নিয়েই, তাকে ঘিরেই, তারই উপলক্ষ্যে। তাকেই উপলক্ষ্য ক'রে এই ব্যাপার, তারই জন্য মেঝেতে আলপনা, ফুলের মালা, ধূপের ধোঁয়া, চন্দনের গন্ধ—মিষ্টি গন্ধ, মিষ্টি গান, শাড়ির রং, কথার ঢং, কথার ফুলঝুরি। এ-সমস্তই শুধু-যে তারই জন্য, এটা কিছুতেই তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠছিলো। সত্যি—শারীরিক অর্থেই ঘামছিলো। সবচেয়ে বেশি তার হাতের পাতা—এই হাত দুটো নিয়ে মুশকিলই লাগছিলো তার, বার-বার মুছতে হচ্ছিলো রুমালে, আবার হঠাৎ একবার মনে হ'লো এটা শোভন হচ্ছে কি? কেউ লক্ষ্য করছে না তো? রুমাল লুকিয়ে ফেললো পকেটে, সামনে টেবিলের উপর মস্ত মোটা ফুলের মালাটা (যেটা তার গলায় দিয়েছিলো) দু-আঙুলে খুঁটতে লাগলো মন দিয়ে। তক্ষুনি আভা তার কানে-কানে কী বললো; তাকিয়ে দেখলো সভাপতি তাঁর গৌরচন্দ্রিকা শেষ ক'রে আনছেন, তার দিকে তাকিয়ে, তাকেই লক্ষ্য ক'রে কিছু বলছেন এখন। তাকাতে হ'লো, হাসতে হ'লো, বিনয়ভঙ্গিতে নোয়াতে হ'লো মাথা।

যাক, চুকলো সব। বাঁচলো। এতক্ষণে গাড়ি চলেছে নির্জন লুডন স্ট্রীট দিয়ে; আর মিনিট কয়েকেই বাড়ি। পথে ভিড় নেই, পাশে কেউ নেই—মানে, একজন শুধু আছে, গাড়িতে তার পাশে শুধু আভা। অনেক দূরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, অনেক দূরে

তার ভক্তরা; অনেক পুরোনো কথা তার সংবর্ধনা—আলো, মালা, বক্তৃতা, গান। অতীত, সেটা অতীত। সেটা হ'য়ে গেছে। কী আরাম, কী মুক্তি! গদির পিঠে হেলান দিয়ে আরামে সে চোখ বুজলো।

এও ছিলো তার কপালে! চিরকাল সে একটা জিনিশ ভয় করেছে: বক্তৃতা। বক্তৃতা শুনতে তার ভয়; তার চেয়েও ভয় বক্তৃতা দিতে। যেটা জনসভা—বাছাই-করা বন্ধুদের আড্ডা নয়—সেখানে গেলেই হাঁপ ধরেছে তার; সভা-সমিতি ইত্যাদিকে—যতদিন পেরেছে—এড়িয়ে চলেছে সন্তর্পণে। কিন্তু বেশিদিন পারেনি। প্রথম যখন বই লিখে তার 'নাম' হ'লো—ভালোই লেগেছিলো সেটা, বেশ ফুর্তি লেগেছিলো। কিন্তু তার বয়সের আর বইয়ের সংখ্যার অনুপাতে তার খ্যাতির ওজন যতই বাড়লো, ততই দেখলো, সে আর তার নিজের নেই, তাকে দশজনে লুটে খাচ্ছে। বাড়িতে লেগে আছে সাংবাদিকের, ভক্ত পাঠকের, এবং সাহিত্যিক উচ্চাভিলাষীর ভিড়; অনেক—অনেক দূর থেকে ছেলেরা আসে তাকে 'দেখতে'—শুধু চোখে দেখতে; যেতে হয় সভায়, দিতে হয় বক্তৃতা, মিশতে হয় বিস্তরের সঙ্গে। কত চেষ্টা করেছে এড়াতে, ঠেকাতে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধ'রে ফেললে ওরা, শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হ'লো বিশ্রী বেসুরো বাইরেটাকে। এলো অর্থ, এলেন রূপসী এবং সুনিপুণা স্ত্রী; তাঁরই ভাগ্যে, এবং সিনেমার রুপোলি সূত্রে, আরো অনেক অর্থ এলো; হঠাৎ একদিন গাড়ি হ'লো নিজের, তারপর উঠলো বালিগঞ্জে বাড়ি। আজ কলকাতার সমাজে সে রীতিমতোই বিশেষ-কেউ; সপ্তাহে প্রায় একটা সন্ধ্যাও সে ফাঁক পায় না—হয় সে নিমন্ত্রিত, নয় তারই বাড়িতে আপ্যায়নের পালা; কত রকম অনুষ্ঠানেই যে তাকে হাজিরা দিতে হয়, আর কত রকমেরই বই যে প্রকাশকরা লিখিয়ে নেয় তাকে দিয়ে! সময় নেই; এক মুহূর্ত সময় নেই। মনের মতো বই পড়া, প্রিয় কোনো বন্ধুর সঙ্গে দু-দণ্ড গল্প, কাউকে ভালো লাগে ব'লেই হঠাৎ তাকে চিঠি লেখা—কিছুরই আর সময় নেই।

সে খ্যাতিমান, সে প্রকাশ্য, সে জনতার; অন্তরঙ্গতা বিদায় নিয়েছে জীবন থেকে।

পেয়ালা পূর্ণ হ'লো আজকের এই সংবর্ধনায়। বাংলাদেশকে এ-দোষ কখনো দেয়া যাবে না যে সাহিত্যিকের যোগ্য সম্মান সে দেয়নি। দিয়েছে, যোগ্যতার বেশিও দিয়েছে অনেক সময়। নয়তো তাকে নিয়ে এই হুলুস্থুল আজ সম্ভব হ'লো কেমন ক'রে? সে, শিবপ্রসাদ দত্ত, যার বয়স এখনো পঞ্চাশ পোরেনি, আর যার ইদানীংকার অনেক লেখাই—সে তো জানে—সতর্ক কুকুরের মুখ-বন্ধ-করা মাংসখণ্ডের শামিল—সে-যে ফুরিয়ে যায়নি, চালাকি ক'রে সেইটে শুধু বুঝিয়ে দেয়া; সে-যে ফুরিয়ে গেছে, খেটে-খুটে সেইটে শুধু ভুলিয়ে রাখা; এ-ই তার এখনকার কাজ। তা হোক,; তবু-তো সমস্ত দেশ আজ মালা দিয়েছে তাকে—মালাচন্দন, অভিনন্দন। এতদিন যদি-বা তাব ছিটেফোঁটা তার নিজের ছিলো, আজ থেকে তাও গেলো, তাও গেলো।

নিশ্বাস পড়লো তার। বোজা চোখেব কালো পরদার উপর দিয়ে দ্রুত-চালানো সিনেমার মতো সভার ছবি ভেসে গেলো পর-পর। সভাপতি ছিলেন প্রাচীন, সুপ্রাচীন, সত্যি বলতে উনিশ শতকের ধ্বংসাবশেষ; কিন্তু এখনো তাঁর কণ্ঠশক্তি আশ্চর্য, কতক্ষণ ধ'রে যে বললেন—কী বললেন কিছুই সে শুনলো না, কিংবা শুনেও বুঝলো না, শুধু একটু বুঝলো যে শিবপ্রসাদ দত্ত নামক লেখকের একখানাও বই তিনি পড়েননি। মেয়েদের গান (সোলো এবং কোরাস, একটা আবার এ-উপলক্ষ্যেই বিশেষভাবে রচিত), আবৃত্তি (তারই কবিতার) প্রবন্ধপাঠ (তার উপন্যাস বিষয়ে)—শেষ হবে কখন? অভিনন্দন, উপহার; শুনতে হ'লো অসার চাটুবাক্য, নিতে হ'লো সোনার কলমদানি হাতে ক'রে—কিন্তু না, ওখানেই শেষ না, উত্তরে সে কিছু বললে তবে তো! যখন উঠে দাঁড়ালো একটা কথাও ছিলো না তার মাথায়, কিছু আরম্ভ ক'রে খানিকক্ষণ খুব কলের মতো ব'লে গেলো—হাততালি শুনে বুঝলো নেহাৎ মন্দ বলছে না। একবার ঠেকে

গিয়েছিলো হঠাৎ—আভা তক্ষুনি তাকে ঠিক কথাটি জুটিয়ে দিলো পাশ থেকে।

এ-রকম সাহায্য কতবার সে আভার কাছে পেয়েছে! শুধু এ-রকম? সব রকম, সব রকম। আভা—আভাকে না-হ'লে তার চলতো কী ক'রে? আজ উনিশ বছর বিয়ে হয়েছে তাদের; এই উনিশ বছর ভ'রে আভা তার নিঃসন্তান জীবনের সমস্ত সেবা যত্ন অধ্যবসায় একান্তে নিবেদন করেছে তার বিখ্যাত স্বামীকে; স্বামীর জীবনের—সাহিত্যিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের—এমন কোনো বিষয় বাকি থাকেনি যাতে সোৎসাহ নৈপুণ্যে নিজেকে নিয়োগ করেনি এই স্ত্রী। শুধু কি স্ত্রী? সহচারিণী, সহকারিণী, বন্ধু, উপদেষ্টা, রক্ষয়িত্রী। সবান্ধব ভোজের সভা সার্থক করেছে সুখাদ্যে এবং সুবচনে, ভক্তদের ভিড় ঠেকিয়েছে, বোঝাপড়া করেছে পাব্লিশরদের সঙ্গে, সচ্ছলতার মধ্যেও সুমিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রেখে নিশ্চিন্ত করেছে শিবপ্রসাদের জীবন—এবং সেই সঙ্গেই পাণ্ডুলিপি নকল করেছে, পাঁজা-পাঁজা প্রুফ দেখেছে, ধরেছে বানান ভুল, ভাষার ভুল—এমনকি, উপন্যাসের প্লটে যখন লিখতে-লিখতে জট পাকিয়ে গেছে, তখনো এই আভাই তাকে এগিয়ে দিয়েছে ঠিক পথে। কোনো বিষয়েই হেলা-ফেলা নেই তার স্বভাবে, আলস্য নেই, যেন ক্লান্তিও নেই;—কাজের তার যত চাপুক, কী সহজেই বহন করে সব। এই কৃতিত্ব, এই সম্মাননা, তারই প্রাপ্য ছিলো এ-সব, তাকেই বিধাতা বানিয়েছিলেন এ-সবের জন্য—কিন্তু ভুল ক'রে জুটে গেলো শিবপ্রসাদের কপালে, এবং আভার জীবন কেটে গেলো বিখ্যাত স্বামীর স্ত্রী হিশেবে বিখ্যাত হ'য়েই।...অন্যায়।

বোজা চোখ খুলে গেলো, আভার দিকে তাকালো শিবপ্রসাদ। আভা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে; চোখ উজ্জ্বল, লালচে গাল, ইট-রঙের ব্যাঙ্গালোর শাড়িতে প্রায় তাকে তরুণী দেখাচ্ছে—আর সত্যি তার বয়সই বা এমন কী, তিরিশ পেরিয়ে বিয়ে-করা শিবপ্রসাদের দশ বছরের ছোটো সে। শিবপ্রসাদ একটু তাকিয়ে

দেখলো সেই চিরচেনা মুখের আধখানার দিকে ; আভা মুখ ফেরালো না—যদিও স্বামীর দৃষ্টি অনুভব করলো নিশ্চয়ই—স্পষ্ট বোঝা গেলো সে নীরব নিবিড়ে উপভোগ করছে সদ্য-পাওয়া গৌরব—হ্যাঁ, তারও গৌরব, সমান মাপের মালা দিয়েছে তারও গলায়—দুটো মালাই নিয়ে আসতেও সে ভোলেনি। ভালো লাগছে তার, নেশার মতো লাগছে, কথা ব'লে এই ঘোর সে ভাঙতে চায় না। আমারও যদি ভালো লাগতো কী ভালোই হ'তো তাহ'লে—শিবপ্রসাদ ভাবলো মনে-মনে। কিন্তু না—ক্লান্তি ছাড়া কিছুবই এখন বোধ নেই ; কত ক্লান্ত সে, ভিতরে ভিতরে বহুদিন ধ'রেই কত ক্লান্ত, কেউ কি তা জানে ? এই ক্লান্তি গোপন ক'রে আর কতকাল—যাক, বাড়ি।

একেবারে উপরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়—কিন্তু না, খাওয়া আছে। খিদেও নেই যেন, না-খেলেও হয়, কিন্তু খেতেই হবে, অন্তত একবার বসতেই হবে—আভার জন্য। আজ আভা বাইরের কাউকে বলেনি, কিন্তু আয়োজন করেছে বিশেষরকম—শুধু তাদের, তাদের দু-জনের একটুখানি নিভৃতমিলন জনসভার পরে আজ খাবার টেবিলে। বেশ তা-ই হোক।

বসবার ঘরের সোফায় গা এলিয়ে দিলো শিবপ্রসাদ। খাশ চাকর মহেশ এসে পাখা খুলে দিলো, সামনে রাখলো খাবার জল, খাবার আগের ওষুধের বড়ি, কাশ্মিরি কাঠের বাক্সে সিগারেট। একটু পরে আভা এসে পাশে বসলো। এরই মধ্যে সাজ-বদল করেছে, তাঁতের শাড়ি পরেছে ঘরোয়া ধরনে, কোঁকড়া চুল শাদা কপালে লুটিয়ে আরো তাকে কম-বয়সি দেখাচ্ছে। এখন, বাড়ি ফিরে, আভা ভরা চোখে স্বামীর দিকে তাকালো, ফিরিয়ে দিলো সেই গাড়ির দৃষ্টি বহুগুণ ক'রে। আর যখন শিবপ্রসাদ তার দৃষ্টির অর্ঘটুকু সম্পূর্ণ পান ক'রে চোখ নামিয়ে নিয়েছে, তখন বললো :

'ক্লান্ত লাগছে তোমার ?'

'এই—একটু।'

'আজ কিন্তু রাত্রে আর কাজ না।'

'তা-ই হবে।' ব'লেই বেসুরো লাগলো শিবপ্রসাদের। সম্ভব হ'লে এখনই শুয়ে পড়া তার ইচ্ছা, কিন্তু এমন ক'রে বললো যেন আভাকে অনুগ্রহ করছে।

'ওষুধটা—'

'এই খাচ্ছি।' কালো কবরেজি বড়িটি টুক ক'রে গিলে নিলো শিবপ্রসাদ। দেখা যাক—যদি একটু খিদে জাগে, যদি একটু সুবিচার করতে পারে আভার কত যত্নের আয়োজনের প্রতি।

'এই ওষুধটা খেয়ে বেশ ভালো আছো—না ?'

'আমি তো ভালোই আছি—তোমরাই ডাক্তার ডেকে প্রমাণ করো আমি ভালো নেই।'

একটু হাসলো আভা, কেমন করুণ ক'রে হাসলো। 'ভালো থাকো, ভালো থাকো—আর-কিছু চাই না আমি,' ব'লে স্বামীর হাতে আস্তে একটু চাপ দিয়ে নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। "যাই—ওদিকে ওরা কী করছে দেখি।'

তার চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো শিবপ্রসাদ। এ-সবের মধ্যে এটুকুই যা ভালো যে আভা এত সুখী হয়েছে—পরিপূর্ণ সুখী—কোথাও তার ফাঁক নেই। সে, শিবপ্রসাদ, সেও সুখী আজ ; নিজের জন্য না হোক, অন্তত আভার জন্য। আভা পেয়েছে তার আজীবন চেষ্টার—স্বামীকে নিয়ে তার অবিরাম শ্রমের পুরস্কার—অন্তত পেয়েছে ব'লে ভাবছে। সব পাওয়াই তো আমাদের মনে ; যা আমরা ভাবি, যা আমরা চাই, সেটাই বাস্তবে প্রতিফলিত দেখার অসীম ক্ষমতা আমাদের। সেই বাস্তবের একটা দলিল আজ পেয়ে গেছে আভা ; এটা ভালোই হ'লো, দরকার ছিলো এটার। সকলেই এতদিনে এটা জেনে গেছে যে শিবপ্রসাদ দত্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন সাহিত্যে, আর তাঁর স্ত্রী জীবন উৎসর্গ করেছেন শিবপ্রসাদে ; কথাটার প্রথম অংশটা যা-ই হোক না, দ্বিতীয়টা নিছক সত্যি—কিন্তু সে, শিবপ্রসাদ, প্রতিদানে কী দিয়েছে আভাকে, আস্ত একটা মানুষের সমস্ত জীবনের বিনিময়ে কতটুকু দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত ? তার বছর-বছর এডিশন-হওয়া

বইগুলি, সিনেমার টাকায় তৈরি-হওয়া এই বাড়ি, কেউ চিনবে না এমন অবস্থায় পথে বেরোবার দুঃসাধ্যতা, এবং অবশেষে আজকের এই প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন—এই কি বিনিময় ? বেশ, তা-ই যদি হয় তো হোক, বেআব্রু বাইরেটার কাছে হাত পেতে আরো গৌরব কুড়োতে হয় তো কুড়োবো ; আভা সুখী হোক।

'টেলিফোনে ডাকছে।'

'জয়ন্তবাবু ?'—তার তৈরি-হ'তে-থাকা ফিল্মের ডিরেক্টর বোধহয় ?

'তাঁরা কেউ নন। মেয়ের গলা।'

'নাম ?'

'নাম বলেনি।'

'এখন পারবো না, মহেশ।'

'সে-কথা বলেছিলাম। কিন্তু খুব নাকি জরুরি দরকার।'

ভক্ত পাঠিকা কেউ ? তার অমুক বইয়ের নামকরণেই অর্থ জানতে চায় ? মাসের মধ্যে কত বার যে এ-রকম···কিন্তু কাউকে ফেরানো যায় না, একটু সময় সকলকেই দিতে হয়—তাতে 'জনপ্রিয়তা'য় সাহায্য করে, কাটতি বাড়ায় বইয়ের—অন্তত প্রকাশকরা তা-ই ব'লে থাকেন।

'কাল সকালে টেলিফোন করতে বলো।'

'তাও বলেছিলাম। কিন্তু আজই নাকি কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—একটু পরেই গাড়ি ছাড়বে—কথা বলছে হাওড়া স্টেশন থেকে।'

হাওড়া স্টেশন থেকে ? একটু পরেই গাড়ি ছাড়বে ? স্থানকালের নির্বাচন বেশ নতুন রকম তো। হঠাৎ কেমন কৌতূহল হ'লো শিবপ্রসাদের ; উঠে গেলো তার কাজের ঘরে, 'আপিশ'-ঘরে, যেখানে সারাদিন ব'সে সে সাহিত্য বানায়, সাহিত্যের ব্যবসা চালায়, কথা বলে সম্পাদক প্রকাশক নাটক-এবং সিনেমাওলাদের সঙ্গে।

'শিবপ্রসাদ দত্ত বলছি।'

একটু পরে, এক সেকেণ্ডেরও কোনো-এক ভগ্নাংশের পরে, ওপার থেকে জবাব এলো : 'আমাকে চিনতে পারছো ?'

সে। না। (কে ? আমাকে 'তুমি' বলবার মানুষ আজ ক-জন ?)

স্বর। অথচ তুমিই একদিন বলেছিলে যে মানুষের সবই বদলায়, শুধু বদলায় না তার গলার আওয়াজ।

সে (চুপ)।

স্বর। চিনতে পারছো ?

সে। বলো। একটু—এখান থেকে যাও, মহেশ।

স্বর। বেশিক্ষণ রাখবো না তোমাকে। জানি, তুমি কত ক্লান্ত। তবু-যে টেলিফোন ধরলে সেজন্য—ধন্যবাদ।

সে। ও-সব বোলো না।

স্বর। আজ তোমার সংবর্ধনা কেমন লাগলো ?

সে। ও-কথাও থাক।

স্বর। আমি যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু আজই আবার চ'লে যাচ্ছি ; সময় হ'লো না। গেলে দেখতে পেতাম তোমাকে। তুমি কি অনেক বদলেছো—চেহারায় ?

সে। কী ক'রে বলি। পঁচিশ বছর আগে যারা আমাকে দেখেছে তাদের কারো সঙ্গেই আর দেখা হয় না।

স্বর। তোমার নাম শুনি চারদিকে। কত বইয়ের নাম শুনি। পড়া হয় না ; সময় কই।

সে। তুমি ভালো আছো ; বই প'ড়ে সময় কাটাতে হয় না।

স্বর। কবিতা লেখো এখনো ?

সে। নিষ্ঠুর লাগলো 'এখনো' কথাটা।

স্বর। লেখো ?

সে। না।

স্বর। একেবারেই না ?

সে। কেন শুনতে চাও ? জানো না কোনখানে তোমার জিৎ ? কবিতা ছিলো—যখন তুমি ছিলে।—ও কী ?

স্বর। কিছু না। বলো।

সে। তোমার কথা বলো।

স্বর। আমার কথা? কী শুনবে?

সে। আজ চ'লে যাচ্ছো। কবে এসেছিলে কলকাতায়?

স্বর। প্রায় এক বছর থেকে গেলাম।

সে। এক বছর!

স্বর। অনেক দিন—না? দেখা হ'লো না তোমার সঙ্গে। দেখা হবে এমন আশাও করিনি।

সে। তার মানে, ইচ্ছা করোনি।

স্বর। ইচ্ছাও করিনি। শুধু ট্র্যামে চলতে-চলতে ভেবেছি হঠাৎ যদি—কিন্তু তখনই মনে পড়েছে তোমার গাড়ি আছে।

সে। সেই গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি বেরোলে কি—

স্বর। আর সময় নেই। তাছাড়া, কেনই বা দেখতে চাওয়া? আমাকে দেখলে চিনতেও পারবে না তুমি।

সে। তোমার চেহারা ঠিক মনে করতে পারি না।

(একটু চুপ)

এক্সচেঞ্জ। Have you finished?

সে। Hold on, please. কোথায় যাচ্ছো এখন?

স্বর। যাচ্ছি সেখানে, যেখানে এই পঁচিশ বছর কাটলো, যেখানে আমার বাকি জীবন কাটবে।

সে। সেটা এখন কোন জায়গা?

স্বর। বেশি দূরে না, কিন্তু অন্য জগতে। সময় হ'লো। যাই?

সে। একটু—একটা কথা বলো। আজ এতদিন পরে যাবার মুখে হঠাৎ কেন—

স্বর। কেন? বলি কারণ। কাগজে দেখেছিলাম তোমার সংবর্ধনার খবর। মনে হ'লো আজ সময় থাকতে আমিও তোমাকে জানিয়ে যাই—কী হ'লো?

সে। বলো, বলো।

স্বর। সকলের সঙ্গে, সারা দেশের সঙ্গে আমিও আমার অভিনন্দন—

সে (খুব নিচু গলায়)। না—না—না।

(একটু চুপ)

স্বর। এইটুকু আমার কথা। এখন যাই ?

সে। একটু—আর-একটু।

স্বর। একটা কথা শুনে যাই তোমার মুখে। খুব কি লেগেছিলো তখন ?

সে। তখন ? যখন তুমি—

স্বর। যখন আমি রাখতে পারলাম না তোমার কথা, রাখতে হ'লো যে-কথা আমি আগেই দিয়েছিলাম ?

সে। আমি হেরে গেলাম সেদিন। কেড়ে তো নিতে পারতাম তোমাকে, কিন্তু—

স্বর। নাওনি, সেই তো তোমার মহত্ত্ব।

সে। না কি ভীরুতা ?

স্বর। না কি ইচ্ছা—অনিচ্ছা ? চাইলেই নিতে পারতে, কিন্তু নাওনি—চাওনি। না কি আমারই হার ?

সে (একটু পরে)। তোমার গাড়ির ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি।

স্বর। চলি। যাবার আগে একটু কিছু বলো আমাকে। বলো, এখন কোনো দুঃখ নেই ?

সে। দুঃখ নেই ? কী ক'রে বলি।

স্বর। বলো, সব সার্থক হয়েছে ?

এক্সচেঞ্জ। Hurry up, please.

সে। Just a moment !

স্বর। বলো !

সে। ক্ষতি করেছি তোমার জীবনে, আমাকে-যে তুমি ভুলতে পারোনি, সেই ক্ষতি। আমাকে ক্ষমা করো তুমি, পারো তো ক্ষমা কোরো কোনোদিন।

স্বর। (খুব নিচু গলায়)। না—না—না।

সে। পারবে না?

স্বর। নিষ্ঠুর, আজও আমাকে ঠেলে দিলে দূরে। কিন্তু—তবু—তবু আমি সার্থক মেনেছি—সার্থক মানছি—সব।

সে। সব? শোনো, একটা কথা শোনো—শোনো—হ্যালো…।

'খাবার দিয়েছে।'

'খাবার?' দৃষ্টিহীন চোখ আভার দিকে মেলে রাখলো সে, তারপর টেলিফোন নামিয়ে বললো, 'চলো।' আমার হাতায় ঘাম মুছলো কপালের।

আভা বললো স্বামীর পাশে যেতে-যেতে, 'চোখ লাল হয়েছে তোমার, ঘুম পেয়েছে। এখন খেয়ে নিয়েই শুয়ে পড়বে কিন্তু।'

একা

আপিশ থেকে বেরিয়ে সে দেখলো, এখনো বেলা আছে। জি. পি. ও.-র ঘড়িতে ছ-টা বাজতে বারো। আজ একটু আগে ছুটি পেয়েছে— কিন্তু তাতে কী? এই একটু সময়, দিনের আলো থাকতে আপিশ থেকে বেরোনো—এতে তার অসুবিধেই হয় বরং। যেদিন ফিরতে-ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যায় সেদিনই ভালো; কিছু ভাবতে হয় না; ছেলে পড়ানো, খাওয়া, তারপর পুরোনো কোনো পূজা-সংখ্যার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে ঘুম। লম্বা ঘুম ছুটির দিনের দুপুরে; বিকেলে পূর্ণ কি এম্প্রেসে চার আনার সিনেমা, নয়তো বেলতলায় বিপিনদের তাসের আড্ডা। আগে ছুটি পেলে এই একটু মুশকিল হয় যে কী করবে ভেবে পায় না।

চৌরঙ্গি অবধি হাঁটা যাক; কিছু সময় কাটবে, পয়সাও বাঁচবে একটা। লালদিঘির আপিশ-ছুটির ভিড়ের মধ্যে আস্তে চলতে লাগলো সে, মাঝে-মাঝেই আঙুল দিয়ে ভিতর-পকেট ছুঁতে ভুললো না। সাবধান: পকেটমার। আজ মাইনে পেয়েছে, ছোট্ট ভাঁজ-করা নোট ক-টি যত্নে লুকোনো আছে ঘড়ি-পকেটে। চল্লিশ টাকা; মাস ভ'রে দশ ঘণ্টা ক'রে খাটে রোজ—তার মজুরি। মন্দ কী— যা দিনকাল।

না, এমন-কিছু মন্দ নেই সে, যখন ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলেরা ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবানীপুরে যে-বাড়িতে ছেলে পড়ায় রাত্তের খাওয়া তাঁদের ওখানেই জোটে। থাকে কাছাকাছি মেস-এর একতলার ঘরে; সীট-রেণ্ট আর একবেলার খাওয়ার জন্য আট টাকা নেয়; তাছাড়া, বিড়ি, সিনেমা, দু-একটা সিগারেট মাঝে-মাঝে, কচিৎ কখনো দোকানে ঢুকে চপ-কটলেট—ঐ চল্লিশ টাকায় সমস্তই পুষিয়ে

যায় তার, এমনকি, কিছু বাঁচেও। তার যা-কিছু খরচ সব নিজের জন্য, একটি পয়সা দিতে হয় না কাউকে। সম্পূর্ণ স্বাধীন সে, সব অর্থেই স্বাধীন। মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন—ও-সবের বালাই নেই তার। ভালোই।

বিধবার সন্তান সে—তার জন্মের ছ-মাস আগে বাপ মরলো। সে-ই তার মা-র প্রথম সন্তান—তার মানেই একমাত্র। সেই মা-ও ম'রে গেলো ভালো ক'রে তার জ্ঞান হবার আগেই। মানুষ হয়েছে দূর সম্পর্কের মামার বাড়িতে অনাদরের অন্ন খেয়ে। ওরই মধ্যে আশা ছিলো মনে, উচ্চাশা ছিলো। মন ছিলো পড়ায়, মাথা ছিলো না তাও নয়, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপও পেলো দশ টাকা। কিন্তু ও-টাকায় কি পড়া-খরচ চলে—আরো, মামা যখন পেটের ভাবনা ঘোচাতে বললেন? বেশ, তা-ই হবে; আশ্রয় ছাড়লো সে—কিংবা আশ্রয় তাকে ছাড়লো—উঠে এলো মেস-এ; পাঁচ টাকায় ছোটো-ছোটো ছেলে পড়িয়ে, নিজের হাতে গেঞ্জি-ধুতি কেচে, ধার-করা বই রাত জেগে টুকে নিয়ে, চললো তার আই. এ. পড়া। ওরই মধ্যে ফী-এর টাকা জমালো, পরীক্ষা দিয়ে পাশও করলো—কিন্তু স্কলারশিপ আর পেলো না। আর তো চলে না কলেজে পড়া, চালাতে পারলেও কী হবে প'ড়ে, সাধারণ পাশ-করা ছেলেদের কী মূল্য আজকাল; তার চেয়ে অল্প বয়সেই কিছু-একটায় ঢুকে পড়া ভালো। ভাগ্য দয়া করলো তাকে, চট ক'রে চাকরিটি জুটে গেলো।

সোনার চাকরি। ছত্রিশ টাকায় ঢুকেছিলো; চার বছরে চল্লিশ টাকা হয়েছে। লেগে থাকলে ষাট পর্যন্ত উঠবে। আর তারপর, যদি তেমন কাজ দেখাতে পারে, কিংবা হঠাৎ উপরিওলার নজরে প'ড়ে যায়, তাহ'লে আড়াই শো টাকার গ্রেডে পর্যন্ত যাবার তার বাধা নেই। আইনত বাধা নেই, কিন্তু কার্যত? আপিশে সব বাবুরা আছেন দেখি তো, পাকা চুলেও পঁয়ষট্টিতে প'ড়ে আছেন। তারই এমন ভরসা কিসের···হয়তো ঐ ষাট টাকাতেই খতম। আর একদিন সে ভেবেছিলো—কলেজে পড়ার সময় কত কিছুই ভেবেছিলো সে!

কিন্তু সে-সব কথা কেন আর মনে আনা। ভালো আছে সে, বেশ আছে—বাঁধা চাকরি, এদিকে বছরে একটা পোস্টকার্ডেরও খরচা নেই। এই তো আয়, এর উপর আবার পরিজন থাকলেই হয়েছিলো! তিন কুলে কেউ না-থাকার কিছু স্ুবিধেও আছে, যা-ই বলো! কেউ নেই ব'লেই তো মাসে-মাসে নিয়ম ক'রে টাকা জমাতে পারছে। খরচ তার এতই কম যে কোনো-কোনো মাসে অর্ধেকটাও বেঁচে যায়। মাইনে পেয়েই জমা দেয় পোস্টাপিশে, তারপর যেমন-তেমন চালিয়ে দেয় মাসটা। চার বছরে সাত শো টাকা জমেছে তার। সাত শো—তার মতো কুচো কেরানির পক্ষে ঐশ্বর্য প্রায়। এই ঐশ্বর্যের অন্য একটা মানেও আছে তার মনে; এটা তার কিপটেমি না, ফাঁকতিও না; বিশেষ একটা লক্ষ্য আছে এর পিছনে—তার সামনে। হাজার টাকা জমলেই সে বিয়ে করবে।

হ্যাঁ, বিয়ে। কালো মেয়ে, পড়াশুনো বেশি করেনি, কিন্তু হাসে খুব। ছেলেমানুষ—কিচ্ছু বোঝে না সংসারের। বৌকে একটুও কষ্ট করতে সে দেবে না, নিজে কষ্ট ক'রে টাকা জমাচ্ছে তাই। এতদিনে তার একটা বাড়ি হবে—বাড়ি। টালিগঞ্জের দিকে থাকবে, সেখানে ভাড়া শস্তা। বৌ তাঁতের শাড়ি পরবে, স্নানের পর মাথা হেলিয়ে ভিজে চুল নিংড়োবে, কপালে টিপ পরবে সিঁদুরের। পান খেয়ে লাল করবে ঠোঁট। ছুটির দিনে বৌকে নিয়ে দোতলা বাস্‌-এ বেড়াবে: ঝাঁকুনিতে টুংটাং ক'রে বাজবে ওর হাতের চুড়ি।

কর্জন পার্ক পার হ'যে চৌরঙ্গিতে এলো সে। বিকেলের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। উঁচু-উঁচু বাড়ি, মস্ত ময়দান, পিচের রাস্তা, রাস্তার ভিড়—সব যেন কে সোনার পাতে মুড়ে দিলো। কত বড়ো আকাশ, আর কত আলো আকাশে! কেমন অবাক লাগলো তার, এ-রকম যেন কখনো আর দ্যাখেনি।

ময়দানের দিকের ফুটপাত দিয়ে চললো সে। ফেরার তাড়া নেই, কেউ ব'সে নেই কোথাও। একটু বেড়াই। আঃ, হাওয়া! কী মাস এটা? চৈত্র মনে হচ্ছে। শুকনো পাতা ঝরেছে গাছের,

মড়মড় আওয়াজ দিচ্ছে জুতোর তলায়। জুতোটা ছিঁড়ে এলো, তালি-টালি দিয়ে এ-মাস যদি-বা চলে, সামনের মাসে কিনতেই হবে। বাটা শস্তায় জুতো দিচ্ছে আজকাল—বৌকে বাটার জুতো কিনে দেবে সে—'ও মা, মেয়েরা আবার জুতো পরে নাকি!' পাড়াগাঁর মেয়ে, অভ্যেস নেই। নতুন এসে মন টিঁকবে না কলকাতায়। তারপর আবার ছেড়ে যেতেই চাইবে না। 'তুমিও চলো!' 'পাগল! আমার ছুটি কোথায়?' 'ছুটি নিয়ে নাও।' 'সে হয় না।' 'তবে পুজোর ছুটিতে—' পুজোর ছুটিতে যাবে সে, যাবে তারা, দু-জনে একসঙ্গেই যাবে।

কলকাতায় জন্ম কাটলো, ভালো ক'রে পাড়াগাঁ ছাখেনি। সেই কোন আর-এক জন্মে যখন মা-র কাছে দেশে ছিলো সে-কথা প্রায় মনেই নেই। আর, মামাবাড়ি থাকতে মন-খারাপ ক'রে একদিন পায়ে হেঁটেই চ'লে গিয়েছিলো মেটেবুরুজ। কিন্তু তার মনের মধ্যে গ্রামের যে-ছবি আছে তার সঙ্গে মেটেবুরুজ মেলেনি। তার মনের গ্রামে তুলসীতলা আছে, সেখানে সন্ধেবেলা প্রদীপ দেয় একটি মেয়ে, প্রণাম করে মাথা ঠেকিয়ে। সেই মেয়ে একদিন চৌরঙ্গি দেখে অবাক হ'য়ে যাবে। আর আজকের মতো কোনো বিকেল-বেলায়—হয়তো দু-জনেই অবাক হবে একসঙ্গে।

কিন্তু বিয়েটা হবে কেমন ক'রে? বাপ-মা—নয়তো অন্য কেউ—এরাই তো ঠিক ক'রে দেয় সব? নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজে আবার করতে পারে নাকি কেউ। কাউকে বলতে হবে। কাকে? মামার সঙ্গেও সম্পর্ক চুকেছে অনেকদিন। সে কি কাউকে চেনে? কেউ কি তাকে চেনে···কোনো মেয়ের মা, কি আত্মীয় কেউ? নাঃ, কলকাতায় কিছু হবে না। গ্রামে কোথাও- কোথায়? তার দেশের বাড়ি—বাড়ি? কেউ নেই, কিচ্ছু নেই; এই কলকাতার আপিশ, আর মেসের একতলা, এ ছাড়া তার অস্তিত্বই নেই কোথাও। বিজ্ঞাপন দেবে কাগজে? ছি। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ে।

তাহ'লে?···তা হবেই একটা উপায়; সকলেরই বিয়ে হচ্ছে,

আর তারই কি হবে না? এদিকে শুনতে তো পায় কন্যাদায় নিয়ে কত চ্যাঁচামেচি।

তিন বন্ধু হাসতে-হাসতে তাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো। তারই বয়সি, আর-কিছুই তার মতো নয়। চৌকশ চেহারা, দোরস্ত জামা-কাপড়, তিন জনেই সিগারেট টানছে। ধোঁয়ার গন্ধ পেলো সে, নাকের ভিতরটা যেন চুলবুল ক'রে উঠলো, হাওয়াটা শুঁকলো দু-একবার। মিষ্টি গন্ধ। কত দিন একটা সিগারেট খায় না সে। বয়কটের হুজুগের পরে একটা সুবিধে এই হয়েছে যে বিড়ি খেলেই গরিব ভাবে না। পকেট হাৎড়ে বের করলো বিড়ি, কিন্তু দেশলাই নিবে গেলো হাওয়ায়। থেমে, দু-হাতে আড়াল ক'রে বিড়ি ধরালো—বিশ্রী! সিগারেট খেলে কেমন হয় আজ?

তার প্রায় গা ঘেঁষে চ'লে গেলো একজন ইংরেজ মেয়ে তার পুরুষ সঙ্গীর বাহুলগ্ন হ'য়ে। লাল চুল মেয়েটির, রোদ্দুর প'ড়ে জলজল করছে। কী বলতে-বলতে গেলো, আওয়াজটা কানে এলো তার—যেন কিছু শোনবার আশায়, যেন কিছু পাবার আশায়, ঠিক ওদের পিছন-পিছন সে চলতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থামলো ওদের সামনে, উধাও হ'লো ওদের নিয়ে। আর-একবার লাল চুলের ঝলক দেখতে তাকালো সে, কিন্তু দৈত্যের মতো দোতলা বাস্ আড়াল করলো ট্যাক্সিটা।

সন্ধে হ'লো প্রায়, বাড়ি ফিরতে হয়। বাড়ি? কিছু-একটা বলতে হয়, তাই বলা। বাড়ি কাকে বলে তা সে কখনো জানেনি। কী হবে ফিরে, কোথায়ই বা ফিরবে? ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না। আজ বাদ দাও ছেলে পড়ানো—রোববার দুপুরে পুষিয়ে দেবো। আর-একটু ঘুরি। একটু চা?

ফিরলো সে, এবার এবার হাঁটতে লাগলো এসপ্লানেডের দিকে। আকাশে আর আলো নেই, কিন্তু অন্ধকার এখনো হয়নি; কলকাতার সান্ধ্য সাজ শুরু হ'লো। আলো জললো রাস্তায়, দোকানে, নিশেন উড়লো বিজ্ঞাপনের বিজলী-বাতির, নানা রঙের মানিক-মেশানো

সাত-লহরী মালা পরলো চৌরঙ্গি। সুন্দর; কিন্তু এই সুন্দর কি কাছে ডাকে মানুষকে, না কি দূর ক'রে দেয় ঘর কেড়ে নেয়? এই ছাখো না, এসপ্লানেড, চৌরঙ্গি, চৌরাস্তার, পাঁচ রাস্তার, দশ রাস্তার মোড়—ট্র্যাম, বাস্‌,—মোটর, মানুষ, স্রোত, খরস্রোত—অন্ত নেই। এই অল্প একটু জায়গার মধ্যে কত অসংখ্য মানুষই ছুটেছে নানা দিক থেকে নানান দিকে, কিন্তু কেউ যেন ঠিক মানুষ নয়, নাম নেই কারো, কেউ চেনে না কাউকে—যেন লাখ-লাখ মুণ্ডওলা একটাই প্রকাণ্ড জীব, আলাদা ক'রে নিলে কেউ কিছু নয়, একলা হ'লে কারোরই কোনো মূল্য নেই।

একলা···একা···ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না। হ্যাঁ—চা খাওয়া যাক। এই রাস্তা পার হওয়া এক ঠেলা।

প্যাঁকপ্যাক ছুটে গেলো মোটর-সাইক্লে ফিরিঙ্গি ছোকরা, পিছনে একটা মেয়েকে বসিয়ে নিয়ে। ঈশ, প্রাণের ভয়ও নেই! যদি প'ড়ে যায়, যদি একবার একটু কাৎ হ'য়ে—যদি, মনে করো, ঠিক এক্ষুনি ছিটকে পড়ে পথের মধ্যে—হৈ-হৈ, ভিড়, পুলিশ—কিন্তু সে ছুটে গেছে সকলের আগে, তুলে ধরেছে মাথাটি, আর সে—মানে মেয়েটি—হঠাৎ একবার চোখ খুলেই—ঈশ, আর-একটু হ'লেই গিয়েছিলো আরকি। কেমন গাড়ি চালায় সব।

বাকি রাস্তাটুকু সাবধানে পার হ'য়ে সে এলো কর্পোরেশন স্ট্রীটে, যেখানে সারি-সারি তিনটে-চারটে চায়ের দোকান। এখানে? না, একটু এগিয়ে গলির মধ্যে, যেখানে ভাঁড়ের চা এক পয়সা, আর সঙ্গে দেয় দু-পয়সায় গরম-ভাজা দু-গণ্ডা ফুলুরি?···আচ্ছা, একটু আরামই করা যাক আজ; আজ তো পকেট ভরতি, পড়াতেও যাচ্ছে না—একটু না-হয় আরামই করলো একদিন।

একটু কম ভিড় দেখে দোকান বেছে ঢুকে পড়লো। কিন্তু এখানেও ভিড়, খালি টেবিল নেই, টেবিল ভাগ ক'রে নিতে হ'লো অন্য দু-জনের সঙ্গে।

—চা।

—আর কী দোবো ? চপ ? ফাউল-কটলেট ?

অন্য দু-জন ছুরি-কাঁটা দিয়ে নানারকম খাচ্ছিলো, তাদের সামনে ব'সে শুধু এক পেয়ালা চা খেতে লজ্জা করলো তার। তাছাড়া খিদে। আর দোকানের পরোটা ভাজার গন্ধ।

—একখানা পরোটা, একটা চপ।

অন্য দু-জন খেতে-খেতে কত কথাই বলছে। রাজেন নামে কোনো-একজনের কথা হচ্ছিলো; ভালোমানুষি ভাবটা বজায় রেখে মিষ্টি-মিষ্টি ঝাল-মেশানো নিন্দে। সে চেনে না রাজেনকে, কিছু তার বলবার নেই, কিন্তু শুনতে তো বাধা নেই কোনো। পরোটা আসতে যেটুকু দেরি হ'লো, রাস্তার দিকে তাকিয়ে ওদের কথা শুনলো একমনে।

হঠাৎ একজন বললো: তোর বৌ কেমন ?

—ভালো আর কোথায়।

—জ্বর ছাড়েনি ?

—না:। আজ এগারো দিন হ'লো। ভাবনাই হচ্ছে।

—ভাবনার কী আছে। গিরিশ নন্দী হোমিওপ্যাথকে নিয়ে যা—তিন ফোঁটায় সারিয়ে দেবে।

—দেখি। কাঁটায় কটলেট বিঁধে মুখে তুললো দ্বিতীয় জন।

প্রথম জন বললো: আজ বিলকুর বাড়িতে হরিপদর গান। যাবি না ?

—আজ আর না।

—আরে চল, চল। বেড়ে গাইছে আজকাল হরিপদ।

—না:। সেই দুপুর থেকে ঘুরছি, এখন আর—

—তাই ব'লে তো সন্ধেবেলাই বাড়ি ফিরতে পারিস না। আত্মসম্মান তো আছে তোর।

এ-কথায় হেসে উঠলো দু-জনেই। আর এই কথাতেই তাদের টেবিলে লাল হ'লো অন্য একজনের মুখ।

মুখ নিচু করলো চায়ের পেয়ালায়, পরোটা ভেঙে মুখে দিলো। কী ক'রে পারে ? যার স্ত্রীর আজ এগারো দিন জ্বর, কী ক'রে কটলেট

ওঠে তার মুখে? আর কী ক'রেই বা সারাটা দিন বাইরে ঘুরে কাটায়? কই, কিছু তো উদ্বেগ নেই মুখে—আর হরিপদর গান শুনে ফিরতে কি আর দশটা না বাজাবে! কী এরা? এরা কি মানুষ? তার—তার বৌয়ের একটু কোনো অসুখ করলে কক্ষনো সে বাড়ি ছেড়ে বেরোবে! আপিশ—তা আপিশে তো না গেলেই নয়, কিন্তু কী দুশ্চিন্তা, কী দুশ্চিন্তা সারাটা দিন। রাত জেগে ব'সে থাকবে পাশে। 'ওগো তুমি ঘুমোও।' 'তুমি ঘুমোও তো!' 'আমি বেশ আছি—তুমি আর রাত জেগে অসুখ বাধিয়ো না—কাল আপিশ আছে না আবার!' 'আর কথা না। লক্ষ্মী হ'য়ে ঘুমোও তো। এই আমি হাওয়া দিচ্ছি।' 'ছি। তুমি কেন হাওয়া দেবে?' খপ ক'রে কেড়ে নেবে হাতের পাখাটা। 'কথা শোনো, চারু। ছেলেমানষি কোরো না।' চলবে তার হাতের পাখা—যতক্ষণ-না ঘুমিয়ে পড়ে।

চারু—হ্যাঁ, চারু। নামও সে ঠিক ক'রে রেখেছে। যত নাম আছে বাংলা ভাষায়, সবচেয়ে সুন্দর ঐ নাম। তার তা-ই মনে হয়, অন্তত; ঐ নাম তার ছেলেবেলা থেকেই প্রিয়। কবে শুনেছিলো কার মুখে—নাকি কোনো বইয়ে পড়েছিলো—কেমন ক'রে পেয়েছিলো এই নামটি এখন আর মনে নেই, শুধু মনে হয় এ যেন তার কতকালের সঙ্গী। নামটি ভাবতে, মনে-মনে বলতে, কেমন তার গায়ে কাঁটা দিয়েছে এক-এক সময়। কাউকে বলেনি এ-কথা; এটা তার গোপন, গোপনীয়—ঠিক সময়ে ঠিক মানুষকেই বলবে ব'লে লুকিয়ে রেখেছে। হয়তো ওর নাম হবে ননীবালা, কি স্নেহলতা—কি হয়তো সৌদামিনী ডাকবে হয়তো পটলি কিংবা ছনকু ব'লে—কিন্তু সে বদলে নেবে বিয়ের পরেই চারু, ছাড়া কিচ্ছু ডাকবে না। আর যদি এমন হয় যে সত্যি নামই চারু?

কিন্তু দেরি কেন, আর দেরি কেন? পুরোপুরি হাজার টাকা জমাতেই হবে? টাকা তো জমাচ্ছো, এদিকে জীবনটা যে খরচ হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকের তো কিছুই থাকে না—তাও ফশ ক'রে বিয়ে ক'রে বসে। তারই মতো পুঁচকে কেরানি কত আছে বৌওলা ছেলেপুলে

সুদ্ধ। কষ্টে থাকে তারা? তা সেও না-হয়—খাওয়া-পরার কষ্টই কি শুধু কষ্ট? আর কষ্টই বা কেন—দু-বেলা ছেলে পড়াতে পারবে সে, তার মানে কুড়ি টাকা অন্তত, খুব চ'লে যাবে ষাট টাকায়। *সাবধানে চলবে, ওরই মধ্যে ইনশিওর করে ফেলবে একটুখানি,* জমানো টাকায় সহজে হাত দেবে না। ভাবনা কী—সব ঠিক আছে, —চৈত্র মাসটা যাক, এই বৈশাখেই।

আপিশের কিরণবাবুকে বলবে, আর সরোজকে—সারা আপিশে সরোজের সঙ্গেই একটু যা তার বন্ধুতা হয়েছে। লজ্জা? লজ্জা করলে আর চলবে না—আর লজ্জাই বা কিসের, বিয়ে করবে এটা কি কোনো লজ্জার কথা? হয়তো তাদেরই জানাশোনা কেউ—সরোজের দূর সম্পর্কের বোন, কিরণবাবুর ভাগ্নি-টাগ্নি কেউ থাকতে নেই? বাপ-মা ইত্যাদি নেই তার, এটা বিয়ের পক্ষে একটু অসুবিধের কথা, কিন্তু এমন কোনো মেয়েও কি দেশে নেই যে সব খুইয়ে টিঁকে আছে—গরিব বিধবার মেয়ে, কি অনাথা কেউ, পরের বাড়িতে শত দুঃখে মানুষ হয়েছে—তারই মতো? যে কখনো আপন ক'রে কাউকে পায়নি, মমতার মুখ ছাখেনি—তারই মতো? একা, জন্ম থেকে একা। কে কোথায় ছিলে দু-জনে—হঠাৎ কী হ'লো, আর একা নয়। একজনের আর-একজন আছে, দু-জনের দু-জনেই সব।

—আর-কিছু চাই আপনার?

—না।

—আর-একটা চপ? ডিমের ডেভিল?

—না। কত হ'লো?

—চোদ্দ পয়সা।

বেরিয়ে এসে পান কিনলো, দেড় পয়সায় একটি গোল্ড ফ্লেক। আজ যখন এতই হ'লো, এটুকু আর বাকি থাকে কেন—অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই করা যাক। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আস্তে এসে দাঁড়ালো হোয়াইটওয়ে লেডলর কাচের পিছনে সারি-সারি ঐশ্বর্যের সামনে। আরো অনেকে দাঁড়িয়েছে সেখানে—রোজই ভিড় জমে সন্ধের পরে—

পাৎলুন-পরা মাদ্রাজি, দাড়ি-না-কামানো বাঙালি বাবু, লজ্জাপুঁটুলি দেহাতি মেয়েরা—এরা কেউ কিনবে না, ও-সব জিনিশ কোনটা কী কাজে লাগে তাও জানে না অনেকে—শুধু দেখেই সুখ, এই উজ্জ্বল-সাজানো ছবির মতো বিলাসিতা চোখে দেখেই সুখ। চারুকে নিয়ে আসবে এখানে, নিয়ে যাবে সিনেমায়—'ওগো, ওরা কি জ্যান্ত মানুষ?' 'না, না, ছবি। ফোটো।' 'ফোটো? তারা আবার কথা বলে? নড়ে-চড়ে? ও মা, এ যে আবার ট্রেন দেখছি! সত্যি ট্রেন?' 'আস্তে—অত কথা বলতে হয় না এখানে।'

কিচ্ছু জানে না! ছেলেমানুষ!

স'রে এলো রাস্তায়, পান-ভেজানো মুখের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ার আমেজ নিতে-নিতে আস্তে হাঁটতে লাগলো যে-কোনো দিকে। যেন বেড়াচ্ছে, হাওয়া খাচ্ছে। আসলে কোথাও যাবার নেই, কিছু করবার নেই। তা মন্দ কী—এই বা তেমন মন্দ কী। খেয়ে বেশ লাগছে।

যদি কেউ থাকতো, এমন কেউ. যার সঙ্গে খানিক খুব গল্প করা যায়! ভিড, চারদিকেই ভিড, এর মধ্যে হঠাৎ তার চেনা কেউ বেরিয়ে পড়ে যদি? চেনা, যাকে ভালো লাগে, বন্ধু। ঠিক বন্ধু যাকে বলে এমন কেউ কি আছে তার? সরোজ—তার সঙ্গে ঐ আপিশেই যা-একটু—তার বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানে না সে। বিপিনদের তাসের আড্ডার ওরা—রাস্তায় ওদের কারো সঙ্গে দেখা হ'লে কী বলবে তা কোনো পক্ষই ভেবে পায় না। তবু—যদি ওদেরও কারো সঙ্গে দেখা হ'তো এখন! যে-কেউ, যে-কোনো মানুষ, দুটো-একটা কথা বলার সঙ্গী। কেউ কিছু বলুক আমাকে, আমিও কিছু কথা বলি। পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে কত লোক—সেই সব মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে সে, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না, সময় নেই। কেউ কোনো রাস্তা জিগেস করে না তাকে? কারো হাত থেকে কিছু প'ড়ে যায় না? না, কিছুই হয় না, যে যার মনে চ'লে যায়; স্রোত, ঘূর্ণি, আবর্ত, কিছু তার নিয়ম নেই, কারো কোনো নাম নেই—দিশি

মানুষ, বিলেতি মানুষ, বিদেশী মানুষ, পুরুষ, মেয়ে, বাচ্চারা—ব্যাণ্ড বাজছে হোটেলে, ডিনারের সময়, ফুর্তির সময়—কত কিছু হ'য়ে যাচ্ছে তার চারদিকে—ফুর্তি, ঝগড়া, কান্না, ভালোবাসা—আর এই প্রকাণ্ড হুলুস্থুলের মধ্যে সে কেন বাইরে প'ড়ে আছে, তার কোনো জায়গা নেই কেন, তার কেন ঠিকানা নেই।

লিনজে স্ট্রীটে মোড় ঘুরতেই প্যাণ্ট-কোট পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেলো। ভদ্রলোক ভদ্রলেন—Sorry ; ব'লেই হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন। একটু থমকে দাঁড়ালো সে। Sorry, তাকে লক্ষ্য ক'রে একটি কথা বলা হয়েছে। Sorry, মনে-মনে কয়েকবার শুনলো কথাটা—ঠিক যেমন ক'রে ভদ্রলোক বলেছিলেন। কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলেন তিনি, ফিরেও তাকাননি তার দিকে। এত তাড়া কিসের—একটু সময় নেই কারো? নতুন চেনা করতে ব্যস্ত নয় কেউ, এতই বন্ধু আছে সকলেরই? কী ক'রে চেনা হয়, বন্ধুতা হয়? কত বন্ধু থাকে, রোজ দেখা হয়, কত কথাই বলে দু-জনে ব'সে-ব'সে। কথা—কথা বলার চেষ্টায় বুক যেন তার ফেটে যাচ্ছে। কত লক্ষ, কত কোটি কথাই ছুটছে এই কলকাতায় প্রতিদিন, ঈথরে ঢেউ তুলে, হৃদয়ে ঢেউ তুলে, কত কিছু ঘটনার জালে জড়িয়ে-জড়িয়ে। কাজের কথা, ভাবের কথা, মুখের কথা, মনের কথা · চেঁচিয়ে বলা, আধো গলায় বলা ; সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, আশা, হিংসা, লোভ, যা কিছু মানুষের ভালো আর মন্দ, সব ঠেলে উঠছে ঐ ঠোঁটের নড়ায় অসংখ্য রকম অর্থওলা আওয়াজ হ'য়ে। ছুটছে কথা টেলিফোনের তারে-তারে, চলছে ঘরে-ঘরে দোকানে রাস্তায়, কত সুরে, কত ভাষায়, কত মন ভোলানো, মন-ভাঙানো ভঙ্গিতে। কথা মানেই একলা আর নয়, আর-একজন চাই। আর-একজন চাই, নয়তো কিছুই পারে না মানুষ নিজের ভারও সইতে পারে না আর। এই তো আমি, কী হয়েছে আমার, কিছুই কেন ভালো লাগছে না? ভালো লাগছে না : আওয়াজ ক'রে বললো একবার ; নিজের গলা শুনে আরাম পেলো একটু। দুটি ঝকঝকে বাঙালি মেয়ে হেঁটে গেলো—একজন বললো, ছেলেটি এমন

মৰ্বিড ! মর্বিড—মানে কী ? কে উঠে বসলো গাড়িতে, ফুটপাতে আর-একজন বললো, গুড-নাইট। সেও বললো, গুড-নাইট। একদল জাপানি গেলো ফীটনে, বুড়ো সায়েব মস্ত কালো কুকুর নিয়ে চলেছে। মর্বিড মানে কী ? সুন্দর ? ভালো ? চমৎকার ছেলে, খুব ভালো, সন্থ পাশ ক'রে বিলেত থেকে ফিরেছে। শিগগিরই বিয়ে হবে ওদের—ঐ মর্বিড ছেলেটির সঙ্গে ঝলমলিয়ে চ'লে যাওয়া তরুণীর। কোনটির ?

শিগগিরই বিয়ে হবে। বোশেখ মাসটা পড়লেই হয়। কী হাওয়া কলকাতায় এই চৈত্র বৈশাখে। তার মেসের একতলায় হাওয়া নেই ; ভাঙা তক্তায় ময়লা চাদরে দয়াময় ক্লান্তি তাকে ঘুম পাড়ায় রোজ। টালিগঞ্জের বাড়িতে কি ছাত থাকবে ? দুটি ঘর—একটি হ'লেও চলে—একটু বারান্দা, আর ছাত, দোতলার উপরে মস্ত খোলা ছাত। সকলেরই কাজে লাগে সারাদিন ; কাপড় শুকোয়, গিন্নিরা বড়ি দেন, বিকেলে বাচ্চারা দৌড়ে বেড়ায়—কিন্তু সন্ধের পরে, রাত্রে, একটু বেশি রাত্রে, ছাতটা শুধু তাদের, তাদের দু-জনের, শুধু দু-জনের। একটি পাটি, দুটো-একটা বালিশ। 'এসো না, লজ্জা কী।' 'এই, আস্তে—আন্নাদি টের পেলে যা ঠাট্টা করবে !' তা নতুন বিয়ের পরে ও-সব ঠাট্টা একটু সইতেই হয়। না-হ'লে বোধহয় ভালোও লাগে না। যেদিন রোববারে সরোজকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবে, সরোজই কি ছাড়বে নাকি ! ঘোমটার ফাঁকে রাঙা হবে মুখ, না কি হঠাৎ হেসেই ফেলবে একটুখানি ? হাসি, আনন্দ : আনন্দ ক'রে খাওয়া কাকে বলে জানেনি জীবনে ; মুখ নিচু করে নিঃশব্দে কিছু কয়লা ঠেলে দেয় শরীরের এঞ্জিনে, এ ছাড়া আর খাওয়ার কোনো অর্থ নেই তার কাছে। 'চচ্চড়ি আর-একটু দেবো ?···নটেশাকের চাটনি করেছি আজ।···পোস্ত ভালোবাসো না তুমি ?' সকালে আপিশের তাড়া, কিন্তু রাত্রে—বৌকে পরে খেতে কিছুতেই দেবে না সে, সব খাবার বেড়ে নিয়ে একসঙ্গে বসবে দু-জনে—হাসি, গল্প, আনন্দ, চুড়ির বোল টুংটাং।

পেরিয়ে এলো উজ্জ্বল লিনজে স্ট্রীট, সুখী লোকের ফুর্তি-খোঁজা ভিড়; কম আলোর গলিতে এসে একটু যেন আরাম পেলো। কোথায় কি একটু নির্জন নেই কলকাতায়? অদ্ভুত শহর; কেউ কারো চেনা নয় এখানে, আবার সত্যি একটু নিরিবিলি যদি চাও তাও কোথাও খুঁজে পাবে না। যদিফিতেতে না হ'তো—ঐ মেস্-এ বদ্ধ ঘরে, শূন্য ঘরে, আজ একটা রাত না-ফিরে পারতো যদি!

—Hullo, dearie!

হঠাৎ সে থামলো, তাকালো, দেখলো। দেখলো ফিরিঙ্গি মেয়েটিকে, তার সামনে, একটু দূরে, গলি যেখানে মোড় নিয়েছে সেই গ্যাসপোস্টের আধো ছায়ায় দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়েছে সোজা হ'য়ে, বুক টান ক'রে, দু-হাতের বুড়ো আঙুলে আলগোছে কোমর ছুঁয়ে, অন্য আঙুলগুলি পাখনার মতো ছড়িয়ে দিয়ে। সেই প্রথম মুহূর্তেই এই সব সে দেখে নিলো— দাঁড়িয়ে থাকার সেই আশ্চর্য ভঙ্গি, আশ্চর্য লাল ঠোঁট, আর পাৎলা শাদা জামার তলায় শরীরের জীবন্ত তথ্য।

—Come on, dear!

আর-কিছু দেখলো না সে, অন্ধ হ'য়ে গেলো, অন্ধ, চেতনাহীন—যেন তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড হাতুড়ির বাড়ি আর সমস্ত শরীরের অণু-পরমাণুর ছিন্নভিন্ন হবার প্রচণ্ড চেষ্টা ছাড়া আর-কিছুরই চেতনা তার নেই। ডেকেছে তাকে, ডাক দিয়েছে একজন, তাকেই বেছে নিয়েছে এই—এই বাস্তব, জীবন্ত, প্রাণময়ী উপস্থিত প্রতিমা। গেলো সে এগিয়ে, কাছে, আরো কাছে, তার আনন্দের দিকে, স্বপ্নের দিকে, সব স্বপ্নের সার্থকতার দিকে—তারপর যখন একেবারেই কাছে, যখন মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুলে তাকে ইশারা করলো পিছনে আসতে, আর ঐ শরীর থেকেই ছুটে-আসা অদ্ভুত একটা পচা ফুলের মতো মিষ্টি গন্ধ তাকে আঘাত করলো, তখন আর সহ্য হ'লো না তার—ঐ মধুরতার তীব্রতাতেই যেন হুঙ্কার উঠলো বুক ঠেলে, অসুস্থ লাগলো, কাঁপতে লাগলো থরথর ক'রে, ম'রে যাওয়ার মতো মনে হ'লো তার নিজেকে।

তারপর—হঠাৎ দেখলো সে দাঁড়িয়ে আছে—কোথায়? চমকে তাকালো চারদিকে। চুপচাপ বাড়ি, ভিতরে আলো, পরদা-ঢাকা জানলা। এ কোথায়? কোথায় এসে পথ হারালো সে? আর কোনোদিকে তাকালো না, ছুটলো, বুক-পকেটে নোটের ভাঁজে হাত রেখে ছুটলো, বুঝলো না কোন পথে কেমন ক'রে চৌরঙ্গিতে এসে উঠে পড়লো পাঁচ নম্বর বাস্-এ। কিন্তু চলতি বাস্-এর ঠাণ্ডা হাওয়ায় আস্তে-আস্তে বেঁচে উঠলো আবার—সব ফিরে এলো মনে, সে কে, কী করছিলো, কোথায় যাচ্ছে এখন। সেই মেয়েটিও ফিরে এলো, যে স্নান ক'রে তাঁতের শাড়ি পরে, কপালে দেয় সিঁদুরের টিপ। চারু তার নাম। চারু ব'লে ডাকি।... ঐ নাম, তার ছেলেবেলা থেকে লুকিয়ে-রাখা যত্নে ঢাকা নামটি যে-মুহূর্তে মনে পড়লো তার, কেমন-একটা অসহায় হেরে-যাওয়া কান্নার মধ্যে ভার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো তার; বাস্-এর জানলায় মাথা রেখে ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে যেন স্বপ্নের ঘোরে মনে-মনে বললো—তুমি এসো, নিজেই এসো, নিজেই এসে ধরা দাও আমাকে—আর তো আমি খুঁজে বেড়াতে পারি না।

রোদ্দ

বারো বছর আগে, তারা সকলেই যখন কলেজের ছাত্র, তখন এই শহরেই দল বেঁধে তারা হো-হো ক'রে ফিরেছে। গুরুজনের শাসন শোনেনি, স্বাস্থ্যের নিয়ম মানেনি; বেরিয়ে পড়েছে বেলা এগারোটাতেই, বিশৃঙ্খল চুল, স্যাণ্ডেল পায়ে, রেল-লাইন পার হ'য়ে চাটগেঁয়ে চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে কচ্ছপের ডিম খেয়ে দেড়টা বেলা বাজিয়েছে; রোদ্দুরে তিন মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরেছে তারপর; একবার টিকাটুলিতে সুনীলদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঠিক পল্টনের মাঠের মধ্যে বৃষ্টি নামলো, তারা দাঁড়ালো না, একটুও জোরে কি আস্তে চললো না, ঠিক যেমন হাঁটছিলো তেমনি কলস্বরে গন্তব্যে এসে পৌঁছলো; ভেজার মতো ভিজতে পেরেছে, আজকের মতো এটাই তাদের চরম ফূর্তি।

গন্তব্য ছিলো সুরথেরই বাড়ি। মাঠের মধ্যে টিনের ঘরে সুরথের বাসা, সেই ঘরেই আড্ডাটির কেন্দ্র। সেই ঘরটি এখনো আছে—পাড়ার মেয়ে-ইশকুল বসে সেখানে—কখনো চোখে পড়লে সুরথের এখন মনে হয়: 'ঈশ—কেমন ক'রে ছিলুম এখানে! টিনের ঘর কী সাংঘাতিক গরম—উঃ!'

কিন্তু ঐ ঘরেই ছ-টি বছর, ছ-টি গ্রীষ্ম সে কাটিয়েছে, তার মধ্যে একটি দিনও কি গরমে কষ্ট পেয়েছিলো? কই, মনে তো পড়ে না। আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ বছরের সুখদুঃখই অন্য রকম।

এমন-কোনো ঋতু নেই, দিন-রাত্রির এমন-কোনো প্রহর নেই, যখন ঐ ঘরটিতে তাদের বিচিত্র দলটি একত্র না হয়েছে; তাদের মধ্যে কেউ কারো মতো নয়, কিন্তু সকলেরই তারুণ্য, সকলেরই প্রাণে আনন্দের নেশা; চা, সিগারেট, অফুরন্ত গল্প, উদ্দাম হাসি, প্রগল্ভ ঠাট্টা, কখনো

বা করুণ গম্ভীর হাস্যকর হার্দ্য উদ্ঘাটন। একবার তো সারারাত জেগে 'পূরবী' পড়া হ'লো—'পূরবী' তখন সত্ত বেরিয়েছে, পাগল ক'রে দিয়েছে তাদের—এক-একবার চোখ আর খুলে রাখতে পারছিলো না কেউ, কিন্তু কেউ তা স্বীকার করেনি, জোর ক'রে ছেড়েছিলো।

আষাঢ়ের সেই সকালবেলায়, যখন সবুজ মাঠ কখনো আলোয় উজ্জ্বল, কখনো ছায়ায় স্নিগ্ধ, আর থেকে-থেকে দমকা হাওয়া শাদা আর ছাইরঙের মেঘগুলোকে আকাশ ভ'রে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে, স্বরথের হঠাৎ এ-সব কথা মনে পড়লো। ঠিক যে সব মনে পড়লো তাও নয়; সকালবেলা তার তিন বছরের মেয়ের হাত ধ'রে বাগানে যখন বেড়াচ্ছে, হঠাৎ ভেজা ঘাসের মধুর গন্ধে সে আচ্ছন্ন হ'লো, মনে হ'লো যেন সেই দিনেই ফিরে এসেছে যখন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরবেলায় ফাঁকা মাঠের মধ্যি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হো-হো ক'রে সে ফিরেছে।

এবার এই শহরে সে আছে প্রায় দু-মাস, গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি এখানেই কাটালো, কিন্তু এ-রকম অনুভূতি আজকেই তার প্রথম। এ-শহর সে ছেড়েছে তো দশ বছর হ'তে চললো, এখানকার সঙ্গে সমস্ত বন্ধনই তার ছিন্ন, তার স্ত্রী যদি এই শহরেরই মেয়ে না হ'তো, তাহ'লে এখানে হয়তো আর কখনোই আসতো না। স্ত্রীর জন্ম বছরে একবার আসতে হয়, কোনো-না কোনো ছুটি শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে যায়। বড়ো শহরের হট্টগোলের পর এখানে তার ভালোই লাগে, কিন্তু সে-ভালো-লাগায় পুরোনো দিনের স্মৃতির কোনো আন্দোলন নেই, কখনো তার মনে হয় না তারই পুরোনো জায়গায় সে ফিরেছে; যেমন সে মাঝে-মাঝে দেওঘরে কি দার্জিলিঙে বেড়াতে যায়, এ-ও তেমনি। এখানে চারদিক চুপচাপ, বাড়িটি চারিদিক খোলা, হু-হু হাওয়ার বিরাম নেই; এখানে পাখি ডাকে, ফুল ফোটে, সবুজ ঘাস বৃষ্টিতে ঘন হয়, এখানে সূর্যাস্তের সময় আকাশের পুবে আর পশ্চিমে দু-রকমের রঙের খেলা পাশাপাশি চলতে থাকে—এ-সবই ভালো লাগে স্বরথের। ভালো লাগে, কিন্তু কখনো মনে হয় না সে এখানকারই। বয়নার নির্জন

সুন্দর গাছের-ছায়া-পড়া রাস্তায় যখন বেড়ায়, মনে পড়ে না এই তার প্রথম যৌবনের লীলাভূমি, এ-সব পথেই রোজ সে কলেজে গেছে, বাড়ি ফিরেছে, বন্ধুদের কাছে মিল্টনের অপাঠ্যতা প্রমাণ করেছে চড়া গলায়, লাগসই কোটেশন বিড়বিড় করতে-করতে পরীক্ষার আগে হল্-এব সামনে পাইচারি করেছে তাও এখানেই, রোদে বর্ষায় জ্যোছনায় এই ঘাস, এই শুকনো কি পচা পাতাই পড়েছে তার পায়ের নিচে, এই সব চোরকাঁটার পূর্বপুরুষেরাই বিঁধেছে তার কাপড়ে। যদি-বা মনে পড়ে, তাতে কোনো আবেগের ছোঁওয়া লাগে না। তার মনের এই নির্লিপ্ততায় নিজেরই তার অবাক লাগে; আর এখানকাব গাছপালা, পথঘাট, বাড়িঘর—এরাও কেমন উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—তাকে কাছে ডাকে না, তাকে দাবি করে না, একদিন সে যে এদেরই মধ্যে নিতান্তই এদেবই একজন ছিলো, তার কোনো চিহ্নই এরা রাখেনি। মনে হয যেন এ শহর বরিশাল কি সিলেট কি পাটনাও হ'তে পারতো—সুবথের পক্ষে কিছুই তাতে তফাৎ হ'তো না। এখানে সে যে আগন্তুক তা সেও যতটা জানে, মাঠে-ঘেবা পিচ-ধূসর রাস্তাগুলিও তার চেয়ে কম জানে না।

অন্য জায়গাব সঙ্গে এখানকার একটু যা তফাৎ, যা, সত্যি বলতে, সুরথের পক্ষে কিছুটা আকর্ষণ, তা এই যে সেই আদি দলটির দু-একজন এখনো এখানেই রয়েছে। যে-কলেজে তারা ছাত্র ছিলো, এখন তারা সেখানেই অধ্যাপক। এখনো তারা নিচের ধাপেব বযোকনিষ্ঠের দলে, কিন্তু আরো দশ কি পনেরো বছর পবে তাদেরই হযতো জায়গা হবে অধিনায়কদের শিবিরে, আর তখনো যদি সুবথেব গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে আসতে হয, তাহ'লে বন্ধুদের দেখা পেতে হ'লে তাকে যেতে হবে রমনার এক-একটি রম্য ভবনে, কিংবা গিয়েও দেখা পাবে না, কেননা তারা কেউ তখন কাশ্মিরে, কেউ বা হয়তো কলম্বোতে।

জীবনে উন্নতি বলতে যা বোঝায় তা এমনি তুচ্ছ। আমরা ছোটো বাড়ি থেকে বড়ো বাড়িতে যাই, বছরে ছ-খানার বদলে চব্বিশখানা ধুতি কিনি, অপত্যেরা বড়ো হয়, স্ত্রীরা মোটা হন, আর-কিছু হয় না।

সুর বাজে না, মন বুজে গেছে, শুধু চলতে-চলতে হঠাৎ কখনো মীড় দেয়—কোন সুর মনে পড়ে না, কবেকার মনে পড়ে না—বুঝি না তাকে কখন হারালাম, কোথায় ফেলে এলাম।

২

সেদিন সকালে, সকালবেলার ঘাসের গন্ধে সুরথের মনে হ'লো, ফিরে পেয়েছি। যখন রোদে বৃষ্টিতে নিরঙ্কুশ বেড়িয়েছে, লম্বা দুপুরে পাটির বিছানায় গোল হ'যে গল্প করেছে বন্ধুরা—আকাশে মেঘ, রোদ, মাঠে বৃষ্টির আব্রু, কখনো হলদে কিংবা গোলাপি আভা—হাতে এত সময় যে সময় নষ্ট হবার ভয় নেই—এ যেন তখনকার, তখনকারই আবার একটি দিন। কী করা যায় এই দিনটিকে নিয়ে? বাঃ, অনুপম আছে না—তার কাছে এখনই একবার তো গেলে হয়! রোজই প্রায় দেখা হচ্ছে তার সঙ্গে, কিন্তু সন্ধেবেলায়; সকালবেলার আড্ডার যে বিশেষ একটি স্বাদ আছে তার জন্য সুরথের মন চঞ্চল হ'লো।

এলো বাড়ির ভিতরে, স্ত্রীকে ডেকে বললো, 'লিলি, ফর্শা জামা দাও।'

'বেরুচ্ছো?'

'ঘুরে আসি একটু।'

'কোথায়?'

'এই অনুপমের কাছে একবার—'

'তোমার আজ বিকেলে যাবার কথা না?'

'এখনই যাই।' লিলি একবার বাইরে তাকিয়ে বললো, 'বড্ড রোদ! গাড়ি আসুক।'

'না—না—গাড়ি লাগবে না।' পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে-লাগাতে সুরথ ঘর থেকে বেরোলো।

'মনিব্যাগ নিয়েছো? রুমাল?' লিলি তার সঙ্গে-সঙ্গে বারান্দায় এলো। 'ফেরবার সময় গাড়িতে এসো কিন্তু।'

সুরথ জবাব দিলো না, মনে-মনে হাসলো। গাড়ি সে নেবে না, ফেরবার সময়ও নেবে না। একটা কাঠের বাক্সে চ্যাপ্টা হ'য়ে ব'সে থাকবে, আর দুটো মুমূর্ষু ঘোড়া অতীব অনিচ্ছায় তাকে টেনে নিয়ে যাবে, এ-কথা ভাবতেই আজ হাসি পেলো তার। আজ সমস্ত পৃথিবী তাকে বাইরে ডাকছে। বাইরে, আকাশের তলায়, হাওয়ার ঝাপটায়, ঘাসের গন্ধে, মেঘের রঙে। কী সুন্দর পৃথিবী আমাদের! চোখ, নাক, কান, আর শরীরের রন্ধ্রময় আচ্ছাদন—এরই ভিতর দিয়ে সমস্ত পৃথিবী আমাদের রক্তে মজ্জায় মিশে যেতে চায়—কেন আমরা দূরে ঠেলি, সরিয়ে দিই? হাঁটতে আজ ভালো লাগলো সুরথের, নতুন লাগলো, যেন তার পায়ের পাতা সুখের ঢেউয়ের তালে-তালে পড়ছে। এই সুখের কারণ? কারণ নেই, প্রার্থিত নয়, একে সে উপার্জন করেনি—কুড়িয়ে-পাওয়া বস্তু যেন, ক্ষণিক রত্ন—এ স্থায়ী হ'তে পারেই না, কিন্তু সেইজন্যই আরো মধুর।

আলো-ছায়ার খেলার আঙিনায় হালকা পায়ে হাঁটলো সুরথ, দু-মাইলের অর্ধেক পথ এক দমকে চ'লে এলো। তারপর রাস্তা মোড় নিতেই হঠাৎ সূর্য ঠিক সামনে পড়লো তার, অনেকক্ষণ মেঘের ছায়া পড়লো না, চোখের কোল ঘেমে উঠলো, কিন্তু এই এসে গেছে ভাবতেই উৎসাহ পেলো আবার। হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে একটু তাড়াতাড়ি পা চালালো এবার, নিশ্বাস তাতে ভারি হ'লো, কিন্তু একটু পরেই অনুপমের দরজার সামনে দাঁড়ালো।

অনুপম তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। 'আরে, আমি ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলাম! এসো, এসো।'

সুরথ কথা বলতে একটু দেরি করলো। এক দমকে এতটা হেঁটে এসে একটু হাঁপাচ্ছিলো সে, চুপ ক'রে থেকে সেটা গোপন করলো। অনুপম পাখা খুলে দিলো, বাইরের হাওয়ার ঝাপটায় পাখার হাওয়া উড়ে গেলো।

সুরথ বললো, 'পাখা লাগবে না।'

'ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও।'

ঠাণ্ডা হ'তে দেরি হ'লো না। চা এলো, কথার পর কথা উঠলো, দেখতে-দেখতে এগারোটা বাজলো।

সুরথ বললো, 'এখন উঠি।'

'আর-একটু বোসো।'

সুরথ চেয়ারের মধ্যে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো—'তোমাদের সঙ্গে সেই ক্ষিতীশ চাটুয্যে পড়তো, সে আজকাল কোথায়?'

সাড়ে-এগারোটা। সুরথ আর-একবার ওঠার ভূমিকা করলো, কিন্তু উঠতে-উঠতে বেজে গেলো বারো। অনুপম বললো, 'বোসো, গাড়ি আনিয়ে দিই।'

'গাড়ি? লাগবে না।'

'এই রোদ্দুরে! দেরি হবে না, একটু বোসো।'

'না, হেঁটেই যাই। বেশ দিনটি আজ—এই মেঘ, এই রোদ্দুর!'

অনুপম বললো, 'ভারি গরম।'

'এমন আর গরম কী! যা হাওয়া!'

সুরথ গাড়ি আনতে দিলো না, সকালবেলার অহেতুক ফুর্তির গুনগুনানি মনে নিয়ে দুপুরবেলায় বেরিয়ে পড়লো। তখন গাছের পাতায় আওয়াজ দিচ্ছে শোঁ-শোঁ, পাখির গান থেমে গেছে, কিন্তু না—এই তো, কোথায় ডেকে উঠছে ঘুঘু—ঘু-ঘু সত্যি কথাই যে পৃথিবীর কবিতা কখনো মরে না। আকাশে যেখানে মেঘ নেই সেখানেই গভীর নীল, আর-একদিকে রুপোলি আগুন কালো মেঘের মাথায় জ্বললো। চারদিকে চোখ ছড়িয়ে, কান খুলে রেখে, সুরথ পথ চললো, কিন্তু একটু পরে তার যেন মনে হ'লো যে গাড়ি একটা নিলেই হ'তো। হঠাৎ হাওয়া বন্ধ, স্তব্ধ গাছপালা, গরম। একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ালো সে. ঝিরিঝিরি একটু হাওয়া দিলো একবার—আঃ!—পাতার ফাঁকে চোখে পড়লো আকাশের নীল। সিগারেট ধরিয়ে আবার বেরোলো রোদ্দুরে, বেরিয়েই মনে হ'লো এতটা পথ কিছুতেই হাঁটতে সে পারবে না। কিন্তু কোথায় গাড়ি? জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও, যতদূর দেখা যায় সে-ই একমাত্র পথিক। পুরো পাড়াটাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের, এখন ছুটির সময় হস্টেলগুলো শূন্য, কে বেরোবে রাস্তায় এই প্রচণ্ড দুপুরবেলায় ?

সুরথ তাকিয়ে দেখলো তার সামনে লম্বা ধূসর পথ বিরাট কোনো অজগরের শবের মতো উলঙ্গ রোদে প'ড়ে আছে। না, যেতেই হবে—চলো! পিচ গলছে পায়ের তলায়, সারা গায়ে পিন ফুটছে, নোংরা ঘাম ঠোঁটের উপর নোন্তা, চোখের ভিতর ঝাপসা, মেরুদণ্ডে পোকার মতো কিলবিলে। বিশ্রী সিগারেট—দুমড়ে ফেলে দিলো।··· আরো কত দূর তাকে যেতে হবে ?

*　　　*　　　*

মুখ গনগনে লাল, ফোঁশফোঁশ নিশ্বাস ফেলছে, কানের মধ্যে আওয়াজ দিচ্ছে পিঁ পিঁ, ছায়া-করা জানলা-ভেজানো ঘরে প্রথম পা দিয়ে সুরথ যেন কিছুই চোখে দেখলো না। তারপর আস্তে ভেসে উঠলো চেনা আসবাব, খাটে বিছোনো চিকনপাটি, লিলি চুল এলিয়ে ছবিটির মতো ব'সে আছে মাসিকপত্র হাতে নিয়ে। লিলি পায়ের শব্দে চোখ তুললো, বই রেখে কাছে এসে বললো, 'এত দেরি করলে! সবাই না-খেয়ে ব'সে আছে তোমার জন্য।'—কিন্তু তার স্নাত স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা চেহারাটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সুরথের এমন রাগ হ'লো যে পাছে কিছু বলতে গেলেই বিশ্রী কোনো কথা বেরোয় সেই ভয়ে সে কিছুই বললো না, জুতো জামা একটানে ছুঁড়ে ফেলে চিৎপাৎ শুয়ে পড়লো খাটের উপর।

দাম্পত্য আলাপ

—অনিমেষ নয়নে যে-ভদ্রমহিলাটির ছবি দেখছো, তিনি কে জানতে পারি?

—ইনি সুষমা দত্ত, মাত্র আটাশ বছর বয়সে একটি স্বামী ও তিনটি শিশু সন্তানকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরলোকে প্রয়াণ করেছেন।

—ও, মারা গেছে। তাই বুঝি ছবি?

—হ্যাঁ, অন্য কোনো কারণে নয়। যদিও খবর-কাগজে ছবি বেরিয়েছে, তবু ওঁর অবস্থাটা কেউ ঈর্ষা করবে না।

—বুঝেছি। আমরা শুধুই ঈর্ষা করি, এই তো বলতে চাও?

—না, ঈর্ষা কেন করবে। তবে আমরা যদি অন্য কোনো মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহ'লে তোমাদের বুকের ভিতরে সঙ্গে-সঙ্গেই জ্বলুনি-পড়ুনি শুরু হ'য়ে যায়।

—তা যা-ই বলো, ভদ্রলোকের পক্ষে ভদ্রমহিলার দিকে তাকানো কি ভালো?

—সে তো নয়ই, কেননা ভদ্রলোকেরা তাকান খোলাখুলি, সোজাসুজি দৃষ্টিতে, সেটা সকলেরই চোখে প'ড়ে যায়। আর ভদ্রমহিলারা যখন ভদ্রলোকদের দিকে তাকান, তাঁরা করেন কটাক্ষপাত, সেটা সকলে হয়তো লক্ষ্য করে না, কিন্তু 'বুকে যার বেঁধে সেই বোঝে'।

—সেইজন্য বুঝি অকপট সরল দৃষ্টিতে আধ ঘণ্টা ধ'রে ঐ ছবিটি দেখছিলে?

—দেখতে-দেখতে অনেক কথা মনে পড়ছিলো।

—তুমি ওঁকে চিনতে?

—আঁৎকে উঠলে যেন? তা চিরকাল তো আমি তোমার স্বামী

ছিলুম না, আমার জীবনেও এমন দিন ছিলো যখন মেয়েদের সঙ্গে কিছু মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম।

—নিজেকে অমন ফাঁপিয়ে তুলো না তো। তুমি এমন-কিছু নও যে মেয়েরা দেখামাত্র তোমার প্রেমে পড়বে।

—প্রেমে পড়ার কথা নয়। মেলামেশার কথা বলেছিলুম।

—তা এই সুষমা দত্তের সঙ্গে তোমার মেলামেশার রকমটা শুনি?

—তখন দত্ত ছিলেন না, তখন ছিলেন মজুমদার।

—কথাটায় যেন করুণ সুর বাজলো। মনে হচ্ছে তুমি চেয়েছিলে উনি তোমারই সগোত্র হন, সেটা তিনি হননি সে-কথা ভুলতে পারোনি।

—ভুল হ'লো। ওর গোত্রান্তর আমারই সাহায্যে ঘটেছিলো।

—ও, এক সময়ে তাহ'লে ঘটকালিও তোমার পেশা ছিলো?

—ঠিক পেশা নয়। এই একটাই করেছিলুম একবার, ফল তার ভালোই হয়েছিলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না, দেখছি। বেচারা সুকুমার! ওকে একটা চিঠি লিখতে হয়—কী লেখা যায় তা-ই ভাবছি। এ-সব চিঠি লেখার কোনো মানে হয় না, অথচ না-লিখলেও চলে না। হাসছো?

—ভাবছিলুম তুমি যদি ওঁকে বিয়ে করতে, তাহ'লে তোমার এখন কী মজাই না হ'তো। চৌদোলা চ'ড়ে আবার বিয়ে করতে যেতে।

—জীবিত ও মৃত সমস্ত মেয়েকেই যদি সতিন কল্পনা করতে থাকো তাহ'লে তো জীবনে মুহূর্তেরও শান্তি পাবে না।

—আপাতত শান্তি পাই, যদি সুষমা দেবীর কাহিনীটা আমাকে শোনাও। জানো তো আমাদের স্বভাব, কৌতূহলে ম'রে যাচ্ছি।

—হতাশ হবে। তোমাদের অতি প্রিয় অত্যাধুনিক লেখকের গল্পের মতো লোমহর্ষক মনস্তত্ত্ব এতে কিছুই নেই।

—বাঁচা গেলো। তাহ'লে গল্প কিছু আছে। প্রথম থেকে বলো, কিছু বাদ দিয়ো না। আগে বলো প্রথম দেখা কোথায়।

—প্রথম দেখা মামার বাড়িতে।

—তোমার মামা ?

—হ্যাঁ, আমারই মামা। যাঁর বাড়িতে সেবার আমরা দিল্লিতে গিয়ে উঠেছিলুম। সুষমা তাঁরই শালি।

—তোমার মামার কোনো শালি আছে, এ-কথা আগে তো কখনো বলোনি।

—অমন অনেক কথাই বলা হয়নি এখনো। যদি ম'রে না যাই, কিংবা তুমি যদি আমাকে ত্যাগ ক'রে অন্য কারো পাণিগ্রহণ না করো, তাহ'লে ক্রমশ সব প্রকাশ পাবে।

—কী যে বাজে বকো ভালো লাগে না।

—তার মানে, খুবই ভালো লাগে। লাগবেই বা না কেন ? কোন মেয়ের একবারের বেশি বিয়ে হয় ? মনোহারিণী শক্তি যার প্রবল, তারই তো ?

—পুরুষদের মতো অসভ্য বাঁদর নয় মেয়েরা, এটা ঠিক জেনো। চারদিকে যা সব শুনছি। বহুবিবাহের যুগ যেন ফিরে এলো !

—তোমাদের অতি প্রিয় লেখক তো প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে পুরুষদের বহুবিবাহই প্রাকৃতিক রীতি, এবং মানুষ তা লঙ্ঘন করেছে ব'লেই পৃথিবী ভ'রে এই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অশান্তি। যা-ই বলো, তাঁর এ-কথাটা আমার বেশ যুক্তিসংগত ব'লেই বোধ হয়।

—তা হবে না। তোমরা পুরুষরা যে কেমন তা জানতে তো আর বাকি নেই। তোমার জীবনের অতীত ইতিহাসে আরো কত সুষমা লুকিয়ে আছে কে জানে।

—আবার ভুল করলে।

—মামার শালি—সম্পর্কটিও বেশ। অর্থাৎ, কোনো সম্পর্কই নেই।

—শুনে সুখী হবে, সুষমার সঙ্গে কোনোদিন আমি ভালো ক'রে কথাও বলিনি।

—অন্য কেউ এ-কথা বললে বিশ্বাস করতুম না।

—তুমি জানো তোমার স্বামীটি এতই অপদার্থ যে দরকারমতো একটা মিথ্যে বানিয়েও বলতে পারে না। আহা, কত ভাগ্যে এমন স্বামী জোটে !

—বড্ড বাজে বকা তোমার স্বভাব। এইজন্যই তোমার হাতে গল্প জমে না।

—অভিজ্ঞতা ব'লে আমার কিছু নেই কিনা, তাই বাধ্য হ'য়েই ফেনিয়ে-ফেনিয়ে পাতা ভরাই। তোমাদের সেই আধুনিক লেখকের কথা শুনেছি, তাঁর বয়স এখন পঁয়তিরিশ, এরই মধ্যে তিনি চব্বিশ প্রণয়ের নায়ক, আর তার মধ্যে আঠারোটাই নাকি পরস্ত্রীঘটিত। লোকে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলে, কিন্তু এ-রকম কিছু না-হ'লে কি আর অমন গল্প বেরোয়! আর আমি কিনা গতানুগতিক-ভাবে বিয়ে ক'রে গতানুগতিক ভদ্রভাবে জীবন কাটাচ্ছি! তাই তো আমার কিছু হ'লো না।

—কিন্তু এই সুষমাকে তোমার একটা অভিজ্ঞতা ব'লেই বোধ হচ্ছে।

—একে যদি অভিজ্ঞতা বলো, আধুনিকের দল হো-হো ক'রে হেসে উঠবে। একদিন বিকেলবেলা কোনো-এক ঘরের মধ্যে ঢুকে একটি মেয়েকে এক কোণে ব'সে থাকতে দেখলুম—এটা কি কোনো অভিজ্ঞতা?

—বাঃ, জমবে ব'লে মনে হচ্ছে। শুনি, শুনি।

—আমি তখন এম. এ. পাশ ক'রে বেকার ব'সে আছি। মামা তখনো দিল্লির চাকরি পাননি, হাইকোর্টে পশার জমাবার চেষ্টা করছেন। আমি থাকি ভবানিপুরের ওয়াই. এম. সি,-তে, মাঝে-মাঝে বালিগঞ্জে মামার বাড়ি এসে আড্ডা দিয়ে যাই।

—আড্ডাটা কার সঙ্গে? তোমার মামাতো বোনেরা তখনো বড়ো হয়নি নিশ্চয়ই?

—কথাটা খুব অন্যায় হ'লো, কিন্তু এর প্রতিবাদ করতে গেলে আবার বলবে বাজে বকছি। আড্ডা দিতুম মামির সঙ্গেই, তিনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। অযোগ্যকে ভালোবাসাতেই মেয়েদের মহিমা।

—যোগ্যকে ভালোবাসতে একেবারেই পারে না বুঝি তারা?

—অযোগ্য হ'লেই ভালোবাসা সহজ হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় স্নেহের অংশটাই বেশি; আর জানো তো, স্নেহ নিম্নগামী।

—ঢের হয়েছে! এবার নায়িকাটিকে চটপট রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করো।

—শোনো তাহ'লে। একদিন বিকেলে গেছি মামার বাড়িতে। বসবার ঘরে পা দিয়েই থেমে গেলাম। কোণের চেয়ারে ব'সে আছে একটি অচেনা মেয়ে, বই পড়ছে। তার চুল পিঠের উপর খোলা আর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বিকেলের আলো সোনালি ফিতের মতো সেই চুলে পড়েছে।

মেয়েটিকে আগে দেখিনি। আমি দরজার ধারে একটু বোধহয় ইতস্তত করেছিলাম, সে বই থেকে চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়েই অত্যন্ত যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। উঠে চ'লে যাবে, না কি কিছু বলবে, এই রকম একটা দ্বিধার মধ্যে প'ড়ে আঙুলের ফাঁকে বই চেপে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

আমি বাড়ির ভিতরে পালিয়ে গেলাম। মামিমাকে পাওয়া গেলো রান্নাঘরে।

'ঠিক দিনেই এসেছো, সুমন। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'মাছের চপ হচ্ছে বুঝি?'

মামিমা আঁচলে মুখ মুছে বললেন, 'তুমি একটু বোসো গিয়ে। আমার এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'বসবার ঘরে কে একজন মহিলা ব'সে আছেন দেখলুম।'

'মহিলা! মহিলা আবার কে? ও, স্বুষি?' মামি হাসলেন। 'তা স্বুষিও আজকাল মহিলা বইকি।'

'আমি এখানেই বসি, মামিমা। তোমার ঐ ছোটো মোড়াটা দাও।'

'এই গরমে বসবে?'

'তুমি যদি এই গরমে ব'সে-ব'সে চপ ভাজতে পারো, তাহ'লে আমরা যারা দয়া ক'রে ওগুলো খাবো আমরাও না-হয় একটু কষ্ট করলুম।'

মামিমা যতক্ষণ খাবার তৈরি করলেন আমি রান্নাঘরেই কাটালাম কথায়-কথায় সুষি নাম্নী ব্যক্তিটির পরিচয় পাওয়া গেলো মামিমার বোন। জানা গেলো তাঁর মা-ও এসেছেন, কিছুদিন ওঁর এখানেই থাকবেন। মামিমার রাজ্যে সুমন-যুগ শেষ হ'য়ে তবে কি এবার সুষমা-যুগ আরম্ভ হ'লো? মনটা যে খুব প্রসন্ন হ'লো তা বলতে পারি না।

খানিক পরে মেয়েটি এসে রান্নাঘরের দরজার ধারে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলুম, এখানেও আমাকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়েছে, কিন্তু আমাকে যেন দেখতেই পায়নি, এইরকম ভাব ক'রে বললো, 'দিদি, টেলিফোনে কে ডাকছে।'

মামি বললেন, 'আমি এখন উঠতে পারবো না। যাও তো সুমন, ত্মাখো তো কে। সুষি, এই আমাদের সুমন। এর আরো পরিচয় আস্তে-আস্তে পাবি।'

আমি আব দেরি না-ক'রে চ'লে গেলুম টেলিফোন ধরতে।

সুষমাকে মাতুলালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ব'লেই মেনে নিতে হ'লো। মামিমার বিয়ের অল্প পরেই তাঁর বাপ মরেছিলেন, ভাইও ছিলো না, এ-অবস্থায় বোনের দায়িত্ব দিদিতেই বর্তায় তাতে সন্দেহ কী। সুষমা রংপুরের কলেজ থেকেই আই. এ. পাশ সেই করেছিলো, কলকাতায় এলে পড়াশুনোটা ভালোরকম চলতে পারবে, সঙ্গে মেয়েদের জীবনের যেটা শেষ লক্ষ্য, সেখানে পৌঁছবার রাস্তাও খুলে যেতে পারে, এই দ্বিবিধ আশাই মামিমার, এবং তাঁর মা-র, মনের তলায় লুকিয়ে ছিলো, সেটা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন হয়নি।

—বাঃ, এ যে একেবারে সাজানো গল্প! সুষমার হাত ফশকে আমার হাতে তুমি কেমন ক'রে পড়লে সেটা ভেবেই অবাক লাগছে আমার। তারপর, তোমাদের ভাব কেমন জ'মে উঠলো সে-কথা বলো। মামাবাড়িটা নিরতিশয় স্বর্গপুরী হ'য়ে উঠলো, তা-ই না?

—তোমাকে তো বলেছি, তখন কলকাতায় ও-ই আমার একমাত্র আড্ডা ছিলো। আমার বয়সের অন্যান্য ছেলেদের মতো আমি

হো-হো ক'রে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতুম না; বেশির ভাগ সময় নিজের ঘরে চুপচাপ ব'সে বই-টই পড়তুম, আর যখনই ক্লান্ত লাগতো আমিমার অঞ্চলছায়ার স্নিগ্ধতাই টানতো আমাকে। তিনি আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলতেন—'সুমন, তুমি বিয়ে করলে এমন আঁচল-ধরা হবে যে বৌ বেচারার প্রাণ থাকে কি যায়!' তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে কোনো-কোনো বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিলো?

—থাক থাক, আর বড়াই ক'রে কাজ নেই। বৌয়ের আঁচল-ধরা পুরুষমানুষ বড়ো ভালো না।

—পুরুষোচিত গুণ আমার কিছুই নেই সে তো তুমি ভালোই জানো। আমি রাগ করতে পারি না, হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে জানি না, চাকররা আমাকে ভয় করে না। এমনকি, একটি মনোহারিণী তরুণীকে একেবারে হাতের কাছে পেয়েও আমি তার সঙ্গে প্রণয় জমাতে পারিনি, যদিও তখন আমার যৌবনকাল। আমার পুরুষ-জন্মে ধিক!

—তরুণীটি খুবই মনোহারিণী বুঝি? এই ছবি দেখে তা মনে হচ্ছে না তো।

—এ-ছবিটা সেজে-গুজে তৈরি হ'য়ে তোলা, এতে ওর মুখটা মুখোশ হ'য়ে গেছে। ওর মুখে শ্যামল একটি আভা ছিলো, সেটি আমার ভালো লাগতো।

—আহা, থামলে কেন? আরো কিছু কবিত্ব করো!

—যেটাকে কবিত্ব ব'লে ঠাট্টা করো সেটাই সত্যিকার বর্ণনা।

—বাবাঃ, একটু ঠাট্টাও সয় না? তাহ'লে ব্যাপার তো সুবিধের নয়। শুনি, শুনি, তারপর?

—তারপর কিছু না। ঐটুকুই। অস্পষ্ট ছবি মাঝে-মাঝে মনের মধ্যে দোলা দেয়—যদি মনে করো সে-ছবি সুষমার তাহ'লে ভুল করবে। যেমন ভোরবেলার আধো-ঘুমের স্বপ্ন, তার আকার নেই, শুধু আকুলতা আছে। সে-ছবি কার কেউ জানে না। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমে পড়ার অবস্থা এটা নয়, এটাকে বলতে পারো

প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া। জানি না তোমাদের মেয়েদেব কখনো এ-অবস্থা হয় কিনা।

—হয় কিনা সেটা তখন সুষমাকে জিগেস করলেই জানতে পেতে।

—ভুলে যাচ্ছো, ওব সঙ্গে মুখোমুখি কথা আমার প্রায হ'তোই না, যদিও দেখা হ'তো যেদিনই যেতুম। আমাদের ঘবোয়া সভা বসতো দক্ষিণের বাবান্দায় পাটি বিছিয়ে, সুষমা একটু দূবে, একটু মুখ আড়াল ক'রে, অন্ধকারে ভালো ক'বে তাকে দেখা যেতো না। কোনো-এক বাত্রে যখন চাঁদ উঠলো, মামি বললেন, 'সুষি, গান কব।' কিছুতেই সে গাইবে না, অনেক পিড়াপিড়ি, প্রায় জববদস্তি ক'বে মামি তাকে গাওয়ালেন। ক্রমে তার গান গাওযাটা সহজ হ'যে এলো। এক-এক বাত্রে দশটা গান সে পব-পব গেযেছে ; তাব থামার পরে অনেকক্ষণ আমরা কথা বলতে ভুলে যেতুম।

সে কেমন গাইতো তা আমি বলতে পাববো না। লোকে বলতে ভালোই, পরে সে বেকর্ডে গান দিযে নাম কবেছিলো। কিন্তু তখন আমাব শুধু মনে হ'তো যে তাব গলাব সুবে সে-কথাই শুনতে পাচ্ছি, আমাবই যা মনের কথা, অথচ যা বলাব আমাব ভাষা নেই।

—গানগুলি সে তোমাকেই লক্ষ্য ক'বে গাইতো—এই তো কথাটা ?

—অমন অসম্ভব কথা কখনোই আমাব মনে হযনি। কোনো মেযে যদি চোখ তুলে তাকায, আব আমি যদি ভেবে বসি সে আমাকেই বিশেষভাবে দেখছে, সে-মূঢতাব কি তুলনা আছে ? কাউকে লক্ষ্য যদি কবতেই হয, তাহ'লে তাব জীবনেব নেপথ্যে যাব পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো, সে কি ছিলো না ?

—নেপথ্যে পদধ্বনি ? অর্থাৎ—

—ঠিক ধবেছো—ওব বিয়েব চেষ্টা চলছিলো নানা দিকে। মামিমাকে বলতে শুনতুম—'আহা ! এত ব্যস্ত কেন—মেয়েটা বি. এ. পডছে পড়ুক না—ঠিক সমযে ওব বিযে হ'যে যাবে, দেখো !' কিন্তু

তাঁর মা বলতেন, 'লোকে একটু আগে থেকেই চেষ্টা করে—মেয়ের বিয়ে কি সোজা কথা রে!'

একদিন ওর মা আমাকে বললেন, 'কত ভালো-ভালো ছেলে তো তোমার বন্ধু—মেয়েটার একটা গতি ক'রে দিতে পারো না?'

মামি হেসে বললেন, 'হ্যাঁঃ, ভালো লোককেই বলেছো। দোকানে গিয়ে কিছু কিনতে হ'লে যে সাত বার ঘেমে ওঠে, সে দেবে তোমার মেয়ের বিয়ে! তবে ওর সন্ধানে একজন খুব সুপাত্র আছে বটে,' ব'লে মামিমা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন।

ওর মা সাগ্রহে বললেন, 'কে? কোথায় থাকে সে? করে কী?'

আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালুম না। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায়। আমার সমস্ত মুখে তখনো পিন ফুটছে। ছী-ছি, মামিমা আমাকে এই ভাবলেন!

লজ্জা ঢুকলো আমার মনে—দুর্ভাবনাও। কেমন ক'রে আমি প্রমাণ করতে পারি যে সুষমার আকর্ষণেই আমি ওখানে যাই না? কেমন ক'রে বোঝাতে পারি যে আমি অত অভদ্র নই যে মামিমার স্নেহের অপব্যবহার করবো? আগেও ঘন-ঘন যেতুম, এখনো তা-ই যাচ্ছি। আমার ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন কি ঘটেছে? আমি কি ওঁদের এ-রকম ভাববার কারণ দিয়েছি কোনো? নিজের মন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলুম—হয়তো কোনো ভুল করেছি, হয়তো কোনোদিন কোনো কথায়, কোনো ভঙ্গিতে, নিজের অজান্তেই এমন কিছু প্রকাশ ক'রে ফেলেছি, মামিমার মেয়ে-মনের সূক্ষ্ম পরদায় যা ধরা পড়েছে। সেটা কবে হ'লো, কেমন ক'রে হ'লো, কিছুতেই মনে কবতে পারি না। মনোকষ্ট তাই বেড়েই গেলো।

আমার মন বললো, এ-অপবাদ তোমাকে কাটাতেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

ও-বাড়ি যেতে আমার আর পা সরছিলো না, কিন্তু ভেবে দেখলুম হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে সেটাও চোখে পড়বে। যাওয়ার পালাটা একই

রকম রেখে মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, কী করা যায়। হঠাৎ মনে হ'লো আমি যদি সত্যি-সত্যি সুবির একটি পাত্র জুটিয়ে দিই, তার চেয়ে ভালো কিছু হ'তে পারে না। তাই তো, এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয়নি?

ভাগ্যক্রমে সুকুমার ঠিক সময়ে জুটে গেল। এম. এ. পড়তো আমার সঙ্গে, বি. সি. এস.-এর বেড়া টপকে তখন খুলনায় ডেপুটিরূপে অধিষ্ঠিত। দু-দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলো, দৈবাৎ দেখা হ'লো চায়ের দোকানে। যেই জানলুম এখনো সে বিয়ে করেনি, মনটা আমার আশায় লাফিয়ে উঠলো।

কথা পাড়তে দেরি করলুম না। ঠাট্টার সুর লাগলো প্রথমে, কিন্তু দ্বিতীয় পেয়ালা চায়েব সঙ্গে সুকুমার গম্ভীর হ'লো। বুঝলুম বিয়েতে তার মন গেছে। মফস্বলের জীবন—একা-একা সময় কাটে না। আমার কাছে আস্তে-আস্তে জেনে নিলো সব—একেবারে উড়িয়ে দিলো মনে হ'লো না।

বিষয়টা এগিয়ে রাখার জন্য আমি বললুম, 'সামনের মাসে তো মহরমের ছুটি পড়েছে, তখন এসে মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে পারো।'

'মেয়ে দেখা? বর্বব প্রথা! আমি ওব মধ্যে নেই। তবে দবকাব হ'লে আমার মা বোধ হয় একবার—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমাকে জানিয়ো ঠিক সময়মতো।'

'আচ্ছা, দেখি।' সুকুমার এটুকুর বেশি বললো না, কিন্তু মুখেব ভাবে আরো বেশি বোঝা গেলো।

পরের দিন নিভৃতে মামিকে বললুম কথাটা। মামি একটু যেন অবাক হ'য়ে বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো, সুমন?'

'ঠিক মানে? আমি কি ঠাট্টা করছি তোমার সঙ্গে?'

মামিমা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বেশ তো।' তাঁর দিক থেকে যতটা উৎসাহ আশা করেছিলুম ততটা যেন দেখা গেলো না।

কিন্তু উচ্ছ্বসিত হলেন সুষির মা। আমাকে হাতে ধ'রে বললেন, 'এটা তোমাকে ঠিক ক'রে দিতেই হবে ভাই, এমন পাত্র হাতছাড়া হ'লে আর পাওয়া যাবে না।'

দেখতে-দেখতে সুষির বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো। বাংলা দেশে এত সহজে কোনো মেয়ের বিয়ে ঠিক হয় এ যেন কল্পনাও করা যায় না। মনে হ'লো এ যেন ভবিতব্য, শুধু মাঝখানে কেউ এসে পরিচয়ের সূত্রটি ধরিয়ে দেবার অপেক্ষা ছিলো। আমি সেই মধ্যবর্তীর কাজটি করলুম, আত্মীয়মহলে আমার ধন্য-ধন্য প'ড়ে গেলো। আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে এত বড়ো একটা সৎকর্ম সম্পন্ন হ'তে পারে এ-কথা কে ভাবতে পারতো।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধালো সুষমা নিজে। শোনা গেলো সে বেঁকে বসেছে, বিয়ে করবে না।

মামিমা আমাকে বললেন, 'এখন যাও, বোঝাও গিয়ে সুষিকে।'

আমি আকাশ থেকে পড়লুম।—'সে কী! আমি কী বোঝাবো?'

'তুমি বললেই হবে। তোমাকে ও মনে-মনে ভক্তি করে তা তো জানো!'

আমি লাল হ'য়ে বললুম, 'কী বাজে—!'

কিন্তু মনে-মনে চিন্তিত বোধ করলুম। বিয়েটা এতদূর এগিয়ে এখন যদি ফিরে যায়, তাতে আমারই লজ্জা সবচেয়ে বেশি। কী ভাবছে সুষি?

তাকে পাওয়া গেলো দোতলার কোণের ঘরে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। আমি তাকে বললাম—বোধহয় এত দিনের মধ্যে এই প্রথম মুখোমুখি কথা বললাম—'কথাবার্তা এত দূর এগিয়ে গেছে, এখন কি তুমি সকলকে লজ্জা দেবে?'

চোখ তুলে তাকালো একবার। তারপর নিচু মাথায় মৃদু গলায় বললো, 'আর আমার-মন?'

'তোমার মনে কি কোনো বাধা আছে?'

একটু লাল হ'লো তার কুমারী গাল। আঁচলের প্রান্তটা আঙুলে জড়িয়ে আস্তে-আস্তে খুলে নিলো।

আমি আবার বললাম, 'তুমি কি ভেবে দেখবে না আর-একবার?'

'আপনি বলছেন?'

তার এই প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হলুম।—'তোমার মা—তোমার দিদি—সকলেরই ইচ্ছে—এদিকে সুকুমার প্রতীক্ষা ক'রে আছে তোমার—' কথাটা শেষ করতে পারলাম না, হঠাৎ কেমন নিজের কানেই বাজে শোনালো।

'জানি সব। কিন্তু আপনিও বলছেন?'

আমি একটু হাসির চেষ্টা ক'রে বললাম, 'আমি তো বলবোই।'

'কেন? নয়তো বন্ধুর কাছে লজ্জা পেতে হবে?'

'ঠিক সে-জন্য নয়। তোমার যাতে ভালো হবে—'

'আমার ভালো!' ঐ একটি কথা ব'লে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সুষমা—আর-কিছু বলবার সময় দিলো না আমাকে, আস্তে-আস্তে ঘর থেকে চ'লে গেলো।

দেখতে-দেখতে বিয়ের তারিখ এসে পড়লো। বাড়ি ভরা লোকজন, হৈ-চৈ; আষাঢ় মাসের দিনটা যেন এক দমকে সন্ধ্যায় এসে ঠেকলো। আমি ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমাকে দিয়ে কাজ যে ঠিক এগোচ্ছে তা নয়, তবে ইচ্ছেটা অন্তত প্রকাশ পাচ্ছে। বিয়ের লগ্ন আসন্ন, বর এসেছে, এমন সময় কী-একটা কাজে মামিকে খুঁজতে-খুঁজতে দোতলার সেই কোণের ঘরে হাজির হলুম। মহিলার দল সুষিকে ঘিরে ব'সে আছেন। পরনে তার গোলাপি রঙের বেনারসি, কপালে চন্দন, পায়ে টুকটুকে আলতা। বসেছে উঁচু-করা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে, মাথাটি নিচু ক'রে। সুন্দর লাগলো, একটু হয়তো বেশিক্ষণই তাকিয়ে ছিলুম।

ওর মা আমাকে দেখে ব্যস্ত হলেন।—'এসো ভাই, এসো। তোমার জন্যই তো সব হ'লো, তোমার কথা কখনো ভুলবো না। সুষি, সুমনকে প্রণাম কর।'

এই আকস্মিক মর্যাদালাভে আমি এমন অপ্রস্তুত হলুম যে চটপট পালিয়ে যেতেও পারলুম না। সুষি আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। দেখলাম তার চোখ দুটি লালচে—বিয়ের রাতে সব মেয়েই কাঁদে শুনেছি, সেও কাঁদছিলো বোধহয়—তাও সুন্দর দেখলাম।

তার চোখ আমার মুখের উপর স্থির হ'য়ে থাকলো একটুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় বললো, 'আপনার মনে এই ছিলো!'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে এলাম যেন অপরাধীর মতো। হঠাৎ, সেই মুখর উৎসবের রাত্রে, আমার মনে তুলনাহীন বিষাদ নামলো।

—তারপর?

—আর তারপর নেই। এই শেষ।

—সুষমার সঙ্গে পরে আর তোমার দেখা হয়নি?

—দশমঙ্গল কাটিয়েই সুকুমার বৌকে নিয়ে খুলনা ফিরলো। তারপর এই আট বছর ও কখনো বাগেরহাটে, কখনো মেহেরপুরে, কখনো নোয়াখালিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদিকে মামাও হঠাৎ চাকরি নিয়ে দিল্লি গেলেন, আমিও কাজে-কর্মে—এবং দাম্পত্য বিধানে—বাঁধা পড়লাম।

—একবারও আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে?

—একবারও না। সুকুমার আমাকে অনেকবারই যাবার জন্য লিখেছে, আমিও ভেবেছি যাবো-যাবো, কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ইচ্ছার মতোই এও শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠেনি। একবার স্বামীর সঙ্গে সুষমাও আমাকে লম্বা একটা চিঠি লিখেছিলো। সুখের সেই অগাধ উচ্ছ্বাসের আমি কী জবাব দেবো ভেবে পাইনি। সত্যি ওরা সুখী হয়েছিলো।

—আমি ভাবছি সুষমার সঙ্গে আমার কেন দেখা হ'লো না? হ'লে ভালো হ'তো। তুমি ওদের আসতে বললে না কেন একবার?

—কত সহজে আমরা ভুলে যাই তা কি তুমি জানো না? আবার ভুলিও না, এই তো আজ কাগজ খুলেই কেমন সব মনে পড়লো।

—কিছু মনে কোরো না, কিন্তু সত্যি তুমি বড্ড বোকা ছিলে।

—এখনো তা-ই আছি। মাঝে শুধু একটা কাজে বুদ্ধির কিছু পরিচয় দিয়েছিলাম।

—কোন কাজটা শুনি?

—তোমাকে বিয়ে করা।

সুখের ঘর

প্রথম দৃশ্য

গ্রীষ্মকাল। রাত্তির দুটো। কালিঘাট পাড়ায় দমবন্ধ গলির উপর বাড়ি। একতলার ঘরে পাশাপাশি দুটো তক্তাপোশে বিছানা— ময়লা মশারিতে আলো ফেলেছে গলির গ্যাস। বিছানায় পাঁচটি প্রাণী নিদ্রিত, তাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মশারির মধ্যে বায়ুমণ্ডল আবিল। স্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বামী ঘুমোচ্ছে পাশ-বালিশ জড়িয়ে— ঘুমের মধ্যেও তার মুখ থেকে দিনের জীবনের রুক্ষতা সব মুছে যায়নি। স্ত্রীর বুকের কাছে বছরখানেকের একটি শিশু—আর তার সুগোল স্ফীত উদরের মধ্যে এরই মধ্যে আর-একজন। শিথিল হাতে সে তালপাখাটি ধ'রে আছে এখনো, যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও পাখা নাড়তে শিখেছে। চার এবং আড়াই বছরের একটি খোকা ও খুকু গড়াতে-গড়াতে চ'লে গেছে বিছানার ধারে—হাত-পা বেঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়েছে তারা—তাদের পিঠের তলার চাদর বার-বার ঘামে ভিজে শুকোলো। সব চুপ; শুধু এতগুলি প্রাণীর নিশ্বাসের ওঠাপড়ায় চিহ্নিত হচ্ছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত, আর গলির মোড়ে পানের দোকানের বেলেল্লা গান ক্লান্ত সুরে ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে।

হঠাৎ এক বছরের শিশুটি কেঁদে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে কলের মতো ন'ড়ে উঠলো তার মা-র পাখা-ধরা হাত। কান্না থামলো না, মা-র চোখ খুলে গেলো, মুখে ফুটে উঠলো ভয় যেন হঠাৎ-ভয়-পাওয়া পশুর মতো। এক হাতে বাচ্চাটিকে বুকে টেনে অন্য হাতে পাখা নাড়লো জোরে। তবু কান্না থামে না।

স্বামী (ঘুমজড়িত রূঢ় স্বরে)। আ—ঃ!

স্ত্রী (শিশুকে চাপড়ে-চাপড়ে)। ও-ও-ও।

স্বামী (চীৎকার ক'রে)। থামাও ওটাকে !

স্ত্রী (শুনলে-ঝাঁটা-মারতে-ইচ্ছে করে এমন গলায়)। হতভাগা ছেলে—!

স্বামী। মাই দাও না !

[স্ত্রী তা-ই করলো। একটু চুপচাপ।]

স্ত্রী (হঠাৎ)। উঃ ! (বাচ্চাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।)

স্বামী। কী হ'লো আবার ?

স্ত্রী। কামড়ে দিয়েছে ! রাক্ষস !

[আবার শুরু হ'লো কান্না।]

স্বামী। নাঃ, জ্বালালে ! পাখাটা কোথায় গো ? (স্ত্রীর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে একটু নাড়লো), কী গরম !

স্ত্রী। পচিয়ে মারলে !

স্বামী। তা দু-একটা মরলেও তো বুঝতুম।—(চেঁচিয়ে) ছেলেটাকে থামাও না !

স্ত্রী। (আরো চেঁচিয়ে)। মর, মর !

[ছেলেটাকে নিয়ে ধ্বস্তাধস্তি চললো খানিকক্ষণ। বাঙালি শিশুর কান্না থামাবার প্রসিদ্ধ উপায়টি আর-একবার চেষ্টা করা হ'লো, কিন্তু বাচ্চাটা এমন বদমাশ—তাতেও খুশি না,—স'রে এসে চ্যাঁচাতে লাগলো দস্তুরমতো স্বর ক'রে—যেন চ্যাঁচানোতেই তার পরম সুখ।]

স্বামী (হাতের পাখা ঠাশ ক'রে ফেলে দিয়ে)। করছো কী গো ?

স্ত্রী। আমি কী করবো ?

স্বামী। গরমের জ্বালায় ঘুমোয় কার সাধ্যি—তাও যা-একটু চোখ লেগে এলো—

স্ত্রী (শিশুর পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে)। ও-ও-ও-ও-ও—

স্বামী। নরক, নরক ! বিছানাগুলো রোদে দিতেও তো পারো—যা দুর্গন্ধ—

স্ত্রী। রোদ ! তোমার এই রাজপুরীতে কতই রোদ !

স্বামী। ইশ—ভারি নাক শিঁটকোনো হচ্ছে! যাও না—কোথায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়, দেখি!

স্ত্রী। তা-ই যাবো একদিন।

স্বামী। (অট্টহাস্য ক'রে)। তা যাবেই তো! মন উড়ু-উড়ু করে, না? তবু যদি চেহারাটা একটু—

স্ত্রী। ছোটোলোকের মতো কথা বোলো না!

স্বামী (গর্জন ক'রে)। ছোটোলোক। তুই আমাকে ছোটোলোক বললি?

স্ত্রী (স্নায়ুচ্ছেদকারী কাংস্যস্বরে)। একশোবার, একশোবার বলবো! ছোটোলোক, ছোটোলোক—

স্বামী। দেবো একদিন লাথি মেরে মুখ গুঁড়িয়ে। নবাবের বেটি!

স্ত্রী। (অস্ফুট একটা শ্মশানঘটিত অভিশাপ আওড়ালো।)

[একটু চুপচাপ। হঠাৎ কী মনে ক'রে ছেলেটা একটু কান্না থামিয়েছে।

স্বামী পাশ ফিরে চোখ বুজেছে, ঘুমিয়েও প'ড়েছে প্রায়, এমন সময় হঠাৎ এক অমানুষিক হাঁক ছাড়লো ছেলেটা।]

স্বামী। মেরে ফেলো, গলা টিপে মেরে ফেলো ওটাকে!

স্ত্রী (নিচু গলায়)। তুই মর।

স্বামী (বিড়বিড় ক'রে)। মাগি বিয়োতেও পারে!

[ছেলেটার কান্নার সেই শেষ ধাক্কা। আস্তে-আস্তে গলার জোর ক'মে এলো তার, আর শেষ পর্যন্ত—অন্য কোনো কারণে নয়, নেহাৎই ক্লান্ত হ'য়ে সে চুপ করলো। আবার নামলো নীরবতা। পানের দোকানের শিথিল গানও থেমে গেছে এতক্ষণে। আরো একটা শ্রমে ভরা, গ্লানিতে ভরা লম্বা দিন আরম্ভ হবার আগে একটুখানি ঘুমের শান্তি নামলো।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্বামীর স্বপ্ন]

মস্ত বাড়ি ; গিশগিশ করছে লোক। কী ব্যাপার ? বিয়ে বুঝি ? আরে, এ যে বড়োবাবুর বাড়ি! বাড়িটা হঠাৎ অন্য রকম হ'য়ে গেছে যেন ?—না—ঐ তো বড়ো-বড়ো বারান্দা, জাফরি-কাটা রেলিং—ঠিক! বড়োবাবুর মেয়ের বিয়ে ? দেখি একটু। বিনোদ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলো। কী হৈ-চৈ—কাণ্ড বটে একখানা! দলে-দলে লোক ঢুকছে বাড়িতে। লুচি ভাজার গন্ধ দিচ্ছে। শালা পয়সা করেছে বিস্তর। শালা চামার। আপিশে আধ মিনিট দেরি হ'লে তলবের চোটে অস্থির।

কে একজন লোক তার কাছে এসে বললো, 'আসুন।'

আরো অনেকের সঙ্গে বিনোদও ঢুকে গেলো ভিতরে। বাপ্‌স্‌ ঘটাখানা দ্যাখো একবার। মেঝেতে গালিচা, ফুলেব ছড়াছড়ি, পাখা ঘুরছে বনবন। গুনগুন গল্প করছে সবাই, হাসছে, রুমালে মুখ মুচছে মাঝে-মাঝে। দরজায় জুতো ছেড়ে বিনোদ এক কোণে গিয়ে বসলো। সামনে রুপোর থালায় সোনালি তবক-মোড়া পান। তুলে মুখে দিলে একটা। ঐ তো আপিশেব জনার্দনবাবু না ? হ্যাঁ—অত মস্ত ভুঁড়ি আর কার ? জনার্দনবাবুর তাব দিকে একবার চোখ পড়তেই বিনোদ চট ক'বে একটা নমস্কার ঠুকে দিলো। কিন্তু জনার্দনবাবু লক্ষ্যই করলেন না, চিনতে পাবলেন না তাকে ? না কি ইচ্ছে ক'রেই চিনলেন না ? তাব তো নিমন্ত্রণ হযনি—সে কেন এখানে ? ভয়ে ঘেমে উঠলো বিনোদ। জামার হাতায় কপাল মুছতে গিয়ে চমকে উঠলো। এ কী ? এ কার জামা তার গায়ে ? এমন ধবধবে, ইস্ত্রি-করা, আর কী বিরাট ঝুল হাতার! জামাটার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো—তাই তো! বুকে আবার মুক্তোর বোতাম। স্তম্ভিত হ'য়ে বার-বার তাকালো নিজের শরীরটার দিকে—যেন চিনতেই পারলো না। কুঁচোনো তাঁতের ধুতির লম্বা কোঁচা

কোথায় গিয়ে ঠেকেছে—এ তার হ'লো কী? পকেটে হাত দিতেই বেরিয়ে এলো গন্ধমাখা সিল্কের রুমাল। তাই তো!

নিজের এই ভোল-বদল কেমন ক'রে হ'লো, চুপ ক'রে তা ই ভাবছে ব'সে-ব'সে, এমন সময় তার কানের কাছে কে আস্তে বললো, 'কী লালবিহারী বাবু, ভালো আছেন?'

'আজ্ঞে আমি—'

'শেয়ারবাজার কেমন চলছে আজকাল?'

'আজ্ঞে দেখুন—'

'ডুয়ার্সের চা-বাগান এবার নাকি লাল?'

'দেখুন, আমি—' বিনোদ সেই সিল্কের রুমালে ঘাম মুছলো। লালবিহারীবাবুর নাম জানে সে। শেয়ার বাজারের চাঁই, বড়োবাবুর বন্ধু। এমনও কি হ'তে পারে যে সে-ই সেই লালবিহারীবাবু? সে যদি লালবিহারী হয়, বিনোদ তবে কে? আচ্ছা, সে যে বিনোদ তারই বা কী প্রমাণ? কোথায় তার ছিটের শার্ট, বঙ্গলক্ষ্মীর ইঞ্চিপাড় ধুতি—নিজেকে দেখে-শুনে আর তো বিনোদ ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সে যদি বিনোদ না-ই হবে, তবে এতদিন কেন বিনোদ ছিলো?

নাঃ—ফ্যাশাদে পড়া গেলো দেখছি। বিনোদ চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো—যদি চেনাশোনা আর-কেউ চোখে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো, কোথায় মিলিয়ে গেলো লোকজন, ঘরের মধ্যে একলা সে ব'সে আছে। সে-ও উঠি-উঠি করছে, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এলো বিশ্রী একটা মানুষ—বিশ্রী চেহারা—তার দিকে রেগে তাকিয়ে বললো, 'বাড়ি-ভাড়া, বাড়ি-ভাড়া দিন!'

লোকটা দেখতে অনেকটা তার বাড়িওলার মতো, কিন্তু ঠিক বাড়িওলাও না। কে তবে? বিনোদও খুব রেগে গিয়ে জবাব দিলো, 'খেপেছেন মশাই? এই বিয়ে বাড়িতে এসেছি নেমন্তন্ন খেতে, এর মধ্যে কী আরম্ভ করেছেন!'

'কে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে এখানে? আপনি ভাড়া দেবেন কিনা বলুন!'

'বাড়ি-ভাড়া?'

'হ্যাঁ, বাড়ি-ভাড়া।'

'যদি বলি দেবো না, কী করতে পারেন?'

'কী করতে পারি? আপনাকে বের করে দিতে পারি এখান থেকে!'

'ঈশ্।'

'দেখুন তবে। ডাকছি সব লোকজন।'

'না, না, লোক ডাকতে হবে না—' বিনোদ হঠাৎ কেঁচো হ'য়ে গেলো—'আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি।'

'এই।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা, খপ ক'রে তার গায়ের জামা আঁকড়ে ধরলো। 'পালাচ্ছো কোথায়? আমার বোতামের সেট নিয়ে পালাচ্ছো কোথায়। এদিকে আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। চোর! শালা চোর।'

আস্তে-আস্তে লোকটার মুখ হুবহু বড়োবাবুর মতো হ'য়ে গেলো। বড়োবাবু তার ঘাড় চেপে ধ'রে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'তাই তো বলি, আমার রুপোর সিগারেট-কেস কি আর অমনি-অমনি হারিয়ে যায়।'

লোকজন জড়ো হ'লো চারদিকে, রব উঠলো, 'মারো শালাকে। পিটিয়ে টিট ক'রে দাও।' তার জামার গলা ধ'রে হ্যাঁচকা টান দিলেন বড়োবাবু, ফ্যাঁ—শ্ ক'রে জামাটা ফেঁড়ে গেলো। সে কঁকিয়ে উঠে বললো, 'দোহাই, দোহাই বড়োবাবু—আমার জামা।'

'ওঃ—ওর জামা না আরো কিছু। এই যে সেদিনও এটা লালবিহারীর গায়ে দেখলাম—'

'না, না, এ-জামা আমি চুরি করিনি। আমার গায়ে কী ক'রে এলো তা আমি জানি না, কিন্তু চুরি আমি করিনি—'

লোকেরা টিটকিরি দিয়ে হাসলো। বড়োবাবু দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'থাক, থাক, বোঝা গেছে সব—এখন বেরোও—বেরোও আমার বাড়ি থেকে।'

হঠাৎ বিনোদ বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো বড়োবাবুর গলায়। 'খুন!—খুন ক'রে ফেলবো!'

চমকে জেগে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে। ওঃ— ঢিপঢিপ করছে বুকের মধ্যে। খানিকক্ষণ নড়তে পারলো না বিছানায়। কী গরম!

তৃতীয় দৃশ্য

[স্ত্রীর স্বপ্ন]

ধুলোয় শাদা রাস্তা চ'লে গেছে যতদূর চোখ যায়। কেন সে এখানে এসেছে, কে তাকে নিয়ে এলো এখানে, কামিনী তা জানে না। শুধু মনে হচ্ছে যেন অনেক, অনেক পথ সে হেঁটেছে, বড়ো ক্লান্ত, একটু বসতে চায়—হোক এই পথেরই ধারে, এই ধুলোরই মধ্যিখানে। কিন্তু কেমন ক'রে বসবে, বসবার তার উপায় নেই, চলতে তাকে হবেই। শরীর ভারি, পা যেন আর তুলতে পারে না, তবু চলছে, যেন নেশার ঘোরে চলছে। আচ্ছা, আস্তে চলি'। কামিনী তাকিয়ে দেখলো সামনের দিকে, ফিতের মতো রাস্তাটা কেবলই খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে—শাদা—ধুলো—কোন দূরে ধূ-ধূ ক'রে মিশে গেছে—পথের কি শেষ নেই? আর কত চলবো? না—চলতেই হবে—পিছনে কী আসছে জানো না?—পালাও—ছোটো—নয়তো রক্ষে নেই! কামিনী চেষ্টা করলো জোরে চলতে—ছুটতে—পারে না, আর পারে না। কিন্তু থামতেও পারে না তো—আসছে, ঠিক আসছে পিছনে। একবার পিছন ফিরে তাকালো—দূরে কালো-মতো কী-একটা—বেশি আর দূরেও না—এতক্ষণে অনেক এগিয়েছে। অনেকক্ষণ ধ'রেই দেখছে ওটাকে—অনেকক্ষণ ধ'রেই এগোচ্ছে ওটা

একটু-একটু ক'রে তার দিকে।…কী?…কামিনী আবার তাকালো পিছন ফিরে…আরো একবার…এবার দেখতে পেলো স্পষ্ট ক'রে—কালো, মিশকালো, দুশমনের মতো দেখতে—মা গো, ভালুক। হেলে-দুলে, থপথপ ক'রে আসছে ওটা, যেন হাসতে-হাসতে, যেন আহ্লাদে গ'লে গিয়ে। গলা শুকিয়ে গেলো কামিনীর, ভয়ের বেগে পাগলের মতো ছুটলো, থেকে-থেকেই তাকিয়ে দেখলো পিছনে।… ঐ তো… এসে পড়লো…ধ'রে ফেললো। এবার একেবারেই কাছে—দেখা যাচ্ছে লকলকে জিভ, ঝিলিক দিচ্ছে শাদা-শাদা দাঁত, আর মুখটা—মুখটা যেন টিপে-টিপে হাসছে। কাছে, আরো কাছে; জন্তুটার নিশ্বাস লাগছে কামিনীর গায়ে। যাক, ধ'রে ফেললো তাহ'লে; নিশ্চিন্ত হ'লো একরকম—আর ছুটতে হবে না, পালাতে হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই একটুখানি পথ কিছুতেই যেন পেরোতে পারছে না জন্তুটা। এক লাফেই তাকে ধরতে পারে এখন, তবু সেই শেষ ফাঁকটুকুর যেন বদল নেই, কমছে না, বাড়ছেও না;—এই বাঁচা-মরার মধ্যিখানে আর কত, কতক্ষণ, কত কাল?…এটা কী? গাছ? গাছ তো এখানে ছিলো না, আর কেমন ক'রে আমি চ'ড়ে বসলাম? আর ওটা? ঐ তো গাছের তলায় ব'সে—না, ব'সে নেই—উঠে আসছে। ঠিক যেন মানুষের মতো আওয়াজ ক'রে হেসে উঠলো জন্তুটা, থাবা তুলে দুলতে-দুলতে উঠে এলো গাছে, মুখ থেকে টপটপ লালা ঝরছে তার। এবার কামিনী ভালো ক'রে দেখতে পেলো মুখটা—মুখটাও যেন মানুষের মতো, কিন্তু জিভটা এখনো ভালুকের, লকলকে লম্বা জলভরা গরম জিভ বের ক'রে যেই ওটা কামিনীর মুখের কাছে এগিয়ে এলো, অমনি সে চিনতে পারলো যে মুখটা তার স্বামীর। বুক-ফাটা আওয়াজ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো কামিনী, কিন্তু গলা দিয়ে টুঁ শব্দ বেরোলো না—ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো বিছানায়।—উঃ, মা গো!

চতুর্থ দৃশ্য

[অজাত মানুষের স্বপ্ন]

[আদিম রাত্রির মতো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের আনীল সমুদ্রে অজাত মানুষ ভাসমান।]

অজাত মানুষ। বড়ো অন্ধকার। আমি কি বেরোতে পারবো না এখান থেকে?

একটা স্বর। আর দেরি নেই। এই তোমার সময় হ'লো।

অজাত মানুষ। কে তুমি কথা বললে?

স্বর। তোমরা আমাকে ভগবান ব'লে ডাকো।

অজাত মানুষ। তুমি ভগবান? তুমি কি আমাকে নিয়ে যাবে এখন থেকে?

স্বর। নিয়ে যাবো।

অজাত মানুষ। কোথায়?

স্বর। আলোয়, আকাশের তলায়, নিশ্বাসের হাওয়ায়।

অজাত মানুষ। তারপর?

স্বর। বড়ো হবে, বাঁচবে, পাবে মানুষের জীবন, যে-মানুষ পৃথিবীর রাজা।

অজাত মানুষ। রাজা? তাহ'লে আমি সুখী হবো সেখানে গিয়ে?

স্বর। সুখীও হবে।

অজাত মানুষ। দুঃখও পাবো?

স্বর। সুখে-দুঃখে জীবনের কিছু এসে যায় না।

অজাত মানুষ। আমি তো দুঃখ পেতে চাই না।

স্বর। দুঃখ না-পেলে জয়ী হবে কার উপর?

অজাত মানুষ। যদি না পারি জয়ী হ'তে?

স্বর। চেষ্টা তোমার থামবে না কখনো। তাতেই তোমার প্রমাণ।

অজাত মানুষ। যদি হেরে যাই?

স্বর। ভুলতেও পারবে।

অজাত মানুষ। পারবোই?

স্বর। যে তোমাকে সব ভুলিয়ে দেবে একদিন, তারই নাম মৃত্যু।

অজাত মানুষ। মৃত্যু। আমাকে মরতে হবে?

স্বর। ভয় কোরো না। জন্মের জন্য তৈরি হও।

অজাত মানুষ। জন্মের জন্য—না, মৃত্যুর জন্য? না, আমি জন্মাতে চাই না, আমাকে ফিরিয়ে নাও।

স্বর। এখন আর উপায় নেই। জীবন তোমাকে বেঁধে ফেলেছে; বেরোতেই হবে আলোয়, হাওয়ায়, আকাশের তলায়।

অজাত মানুষ। কেউ কি আমাকে চায় সেখানে?

স্বর। তোমার মা, তোমার বাবা—তারা তোমাকে কোনো-একদিন চেয়েছিলো।

অজাত মানুষ। এখন আর চায় না? তাহ'লে আমি ফিরে যাই?

স্বর। পারবে না ফিরতে। জন্মাতেই হবে।

অজাত মানুষ। হবেই? কিন্তু আমি তো জন্মাতে চাইনি। কোথায় ছিলাম, কেমন ক'রে এলাম, কিছুই জানি না। তাহ'লে কেন—কেন?

স্বর। আগেই শুনতে চাও? তবে শোনো। তোমার মা-বাবা তোমাকে ঘৃণা করবে—সেইজন্য। অন্যেরা তোমাকে মাড়িয়ে যাবে পায়ের তলায়—সেইজন্য। চুরি শিখবে, নেশা ধরবে, খেতে পাবে না—সেইজন্য। রোগে ধুঁকবে, অনুতাপে পুড়বে, ধিক্‌কার দেবে জীবনকে, আবার মৃত্যুর ভয়ে তিলে-তিলে মরবে—সেইজন্য।

অজাত মানুষ। এ-ই? এ-ই হ'তে হবে? অন্য কিছু হ'তে পারে না?

[উত্তর নেই।]

অজাত মানুষ। তুমি তো সব পারো, তাহ'লে অন্য কিছু পারো না কেন?

[উত্তর নেই।]

অজাত মানুষ। আমাকে ফিরিয়ে নাও, আমাকে ফিরিয়ে নাও! আমি জন্মাতে চাই না!

হতাশা

—কী, শুয়ে পড়লে যে বড়ো? আপিশে যাবে না আজ?

—আহা, এই খেয়ে উঠলুম, একটু জিরোতে দাও না। আর-একটা পান দাও।

সুরমা পানের ডিবেটা নিয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে রাখলো। অনুপম একটা পান মুখে দিয়ে খবর কাগজের ছবির পাতাটা চোখের সামনে খুলে ধ'রে বললো—'বিলিতি মেয়েগুলো কী অসভ্যই হচ্ছে দিন-দিন। ঐটুকু কাপড় গায়ে না-রাখলেই বা কী। দেখেছো?

কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে সুরমাকে সেখানে দেখতে পেলো না। কোথায় সে? অনুপম হাঁক দিলো—সুরমা!

সুরমা পাশের ঘর থেকে বললো—যাই। কোন জুতোটা পরবে আজ?

—গেছে আবার জুতো বুরুশ করতে। বেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললো অনুপম।

একটু পরে সুরমা চকোলেট রঙের জুতো হাতে ক'রে ঢুকলো। ঝকঝক করছে আয়নার মতো। জুতোটা নামিয়ে রেখে বললো—ওঠো এখন।

অনুপম খবরের কাগজের পাতা ওল্টালো; কথাটা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেলো না। সুরমা টেবিলের কাছে স'রে এসে বললো—বারোটা বাজে যে।

অনুপম তবু চুপ। এত গভীর মন দিয়ে খবর-কাগজে কী পড়ছে সে-ই জানে। চেয়ারের পিঠের উপর তার পাৎলুন, কোট, নেকটাই সব সাজানো, সেগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সুরমা আবার বললো—ওঠো না।

এবার অনুপম জবাব দিলো—কী যে বিরক্ত করো। আপিশের বাঁধা কাজ তো নয় যে দশটা বাজতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।

—কাল তো দশটা না-বাজতেই বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছিলে। একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বললো সুরমা। ঝাঁঝের কারণ ছিলো। কাল আপিশে বেরোবার আগে অনুপমের নতুন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি—তাই নিয়ে কী কাণ্ড। সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি, তার ইশকুলগামী ছোটো ননদ, সকলকেই হাঁকে-ডাকে বিপর্যস্ত ক'রে অনুপম শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব। স্বয়ং শ্বশুরমশাই আপিশে বেরোবার মুখে বলেছিলেন—কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে ছেলেটার। তা তোমরাও তো আগে থেকেই ওর কাপড়চোপড় একটু···

লজ্জায় সুরমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। স্বামীর তুচ্ছতম সুখসুবিধার জন্য সে তো প্রাণপণ করে, তবে মানুষ যদি এমন হয় যে পুরোনো চিঠিপত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে তারপর বাড়িসুদ্ধ লোকের উপর মেজাজ ফলিয়ে বেড়ায়

সেইজন্য আজ সকালবেলাই সে কাপড়চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আজ অনুপমের তাড়া নেই। একটু পরে বললো—আজ কি তাহ'লে বেরোবেই না?

অনুপম গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললো—উঠছি। কিন্তু তার ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিশ নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করতে-করতে সুরমা বললো—কাজে এ-রকম গাফিলি করা কি ভালো? মাসের শেষে মাইনে তো ওরাই দেবে!

—ওঃ, তা দিলোই বা। আমাদের তো আর দশটার সময় আপিশে হাজিরা দিতে হয় না। আমাদের হ'লো ফীল্ড-ওঅর্ক। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ।

—তা হোক, বিছানায় শুয়ে থাকলে কোনো কাজই তো হবে না।

অনুপম হঠাৎ চ'টে উঠে বললো—আমার ইচ্ছে শুয়ে থাকবো! আমার শোয়া-বসাও তোমার হুকুমে হবে নাকি?

—আমার হুকুমে হবে কেন? সমস্ত সংসারটাই হুকুমে চলছে। ইচ্ছেমতো শোয়া-বসা কার আছে?

—ওঃ ভারি তো একশো-পঁচিশ টাকার চাকরি—ছেড়ে দিলেই বা কী?

এবার সুষমার মুখে সত্যি-সত্যি আশঙ্কার ছায়া পড়লো।—বলো কী, এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেবে। ভালো ক'রে কাজ তো আরম্ভই করলে না এখনো।

অনুপম যেমন হঠাৎ চ'টে উঠেছিলো, তেমনি হঠাৎ নরম হ'য়ে বললো, না, না, ছাড়বো কী। উঠি এবার। ব'লে সে সত্যি-সত্যি উঠে বসলো।

সুষমা আশ্বস্ত বোধ করলো, তবু না-ব'লে পারলো না—ভাখো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ছেড়ে-টেড়ে দিয়ো না কিন্তু। শ্বশুরমশাই তাহ'লে মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

আর-কোনো কথা সুষমা বলতে পারলো না; তার নিজের দিকটা মনে এলো না তার, অনুপমের দিকটাও না, শ্বশুরের কথাই মনে হ'লো। বয়সের চাইতে বেশি বুড়ো হয়েছেন। সরকারি চাকরিতে পেনশন নেবার আর দু-চার বছর বাকি। দেড়শো টাকায় পেনশন নেবেন—তখন এই বৃহৎ সংসার চলবে কেমন ক'রে? সারা জীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে টালিগঞ্জে এই ছোটো বাড়িটি করেছেন। তার উপর বিস্তর দেনা। আশ্রিত, অতিথি, নিঃসম্বল আত্মীয়ের অভাব নেই। নিজের পড়ুয়া ছেলে, অবিবাহিত মেয়ে আছে এখনো। অনুপম বড়ো ছেলে। বছর চারেক আগে বি. এ. পাশ করেছে। বিয়ে হয়েছে বছরখানেক। বিবাহটা মা-বাপের কর্তব্যসম্পাদন। সুষমা খুব সুখে আছে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন ব'লেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। উপার্জন একজনের, দাবি দশজনের। বুড়ো ভদ্রলোক একটা শার্ট

ছিঁড়ে গেল সহজে আর-একটা কেনেন না। অথচ পুত্রবধূর জন্য ঘন-ঘন শাড়ি কেনা হচ্ছে পাছে ছেলের মনে কষ্ট হয়। সুরমার ভারি লজ্জা করে।

অনুপমই একমাত্র আশা। কিন্তু·· আজকালকার দিনের সাধারণ বি. এ. পাশ ছেলে, কতটুকু আশা তার, কতটুকু মূল্য? সেরা পাশিয়েরা খাবি খাচ্ছে। তাই ব'লে অনুপমের কোনো উৎকণ্ঠাও নেই। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও ত্যাখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার ভালো লাগে না। আজকালকার দিনে কি নিজের উপর মমতা করলে চলে! জীবন পণ ক'রে খাটতে হবে···অমনি ক'রেই কিছু হ'য়ে যাবে। কী আর হবে? কতটুকু হবে? যেটুকুই হোক, বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হবে তো। তাছাড়া, শুয়ে-ব'সে কি আর পুরুষমানুষের দিন কাটে? না কি মেয়েদেরই কাটে? না কি সেটা ভালোই দেখায়?

তবে কিছুদিন থেকে অনুপমের ভাবটা যেন বদলেছে। বাড়ি থেকে সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায় সাড়ে-দশটা বাজতেই, ফিরে যখন আসে তখন প্রায় সন্ধে। তার রোদে পোড়া ক্লান্ত মুখ দেখে সুরমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এই তো পুরুষের জীবন···মনে-মনে তার কেমন-একটা আনন্দে-মেশা গর্বও হয়। সে নিজে···সে তো দুপুরবেলা ঠাণ্ডা পাটিতে প'ড়ে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কী করবে সে? সে অতি সাধারণ স্ত্রীলোক—তাকে দিয়ে সংসারের যা-যা কাজ হ'তে পারে, তাতে সে কখনো ত্রুটি হ'তে দেয় না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্নান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্য হাৎড়াতে হয় না, বাথরুমের আলনায় সব সাজানো আছে। এর বেশি সুরমার সাধ্য নেই, সাবেকি পরিবারের আড়ালে-আবডালে সে মানুষ হয়েছে, বৃহৎ পুরুষ-পৃথিবীর কোনো ব্যাপারই সে জানে না; সে গেঞ্জি কেচে দিয়ে ধোবার খরচ বাঁচাতে পারে, দশবার ঘর ঝাঁট দিয়ে স্বামীর মেজাজ ভালো রাখতে পারে, দিতে পারে জুতো বুরুশ ক'রে, দরকার হ'লে সুখাদ্য রেঁধে খাওয়াতে পারে—এই পর্যন্ত।

সুরমার বাপের বাড়ি বড়োলোক নয়, টানাটানির সংসারকে নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়েই সুশ্রী ক'রে তুলতে সে তার মা-কে দেখেছে। সে-ও কি তা পারবে না?

রাত্রে সে স্বামীকে জিগেস করে—কোথায় থাকো সারাদিন?

অনুপম গম্ভীরভাবে শুধু একটি কথা বলে—কাজ। এর চাইতে মহৎ কথা আজকালকার ভাষায় নেই।

—সুবিধে হচ্ছে কিছু?

—চেষ্টা তো করছি। দেখি কী হয়। অনুপম তার কথায় বেশ একটা রহস্যের ভাব বজায় রাখে, সুরমা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর সত্যি, অনুপম যখন পর-পর পাঁচ-সাতদিন সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে গিয়ে নিতান্তই ক্লান্ত চেহারা ক'রে সন্ধেবেলা ফিরতে লাগলো, তখন আর সন্দেহ করবার কোনো উপায় রইলো না যে সত্যি-সত্যি সে এবার কর্মক্ষেত্রে নেমেছে।

তারপর একদিন সে তার স্ত্রীকে চুপি-চুপি বললে—কাউকে বোলো না এখন, একটা চাকরি পেয়েছি।

—পেয়েছো সত্যি?

অনুপম একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির নাম করলো। সেখানে, জানা গেলো, তাকে একটা চাকরি দেবার জন্যে সাধাসাধি করছে অনেকদিন ধ'রে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বনিবনাও হচ্ছিলো না। এবারে রফা হয়েছে—বেশি কিছু নয়, একশো-পঁচিশ দেবে গোড়াতে। ছ-মাস পরে কাজকর্ম দেখে বাড়িয়ে দেবার কথা। তাছাড়া কমিশন। মোটর-অ্যালাউএন্স গোটা পঞ্চাশ দিতেও রাজি আছে, তবে গাড়ি তো···

এখানে বাধা দিয়ে সুরমা বলেছিলো—বলো কী! সত্যি?

অনুপম অবিচলিতভাবে বললো—নেহাৎ মন্দ না, কী বলো? আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আজ রাজি হ'য়ে এসেছি।

—রাজি হবে না! সুরমা এবার রীতিমতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। যা দিনকাল পড়েছে, কত সব ভালো-ভালো এম. এ. পাশ

ছেলে পঞ্চাশ টাকার জন্ত ঘুরে মরছে—আর এ তো চমৎকার! ক-টা লোক আজকাল একশো টাকা রোজগার করে! তার উপর আবার কমিশন দেবে, অ্যাঁ?

অনুপম বললো, এম. এ. পাশ হ'লেই তো হ'লো না, কাজের লোক হওয়া চাই! ইনশিওরেন্স কোম্পানি বিস্তে বোঝে না, কাজ বোঝে।

—তা কাজটা কী করতে হবে?

—ও:, কাজ! কাজ বিশেষ-কিছু না। আমার অধীনে সব এজেন্ট থাকবে, তারা বিজনেস জোগাড় করবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে হবে, এই আরকি। ভাবছি ছ-মাস পরে ছোটো একটা গাড়িই কিনে ফেলবো। বাইরে ঘোরাঘুরি আছে কিছু।

মাইনে ভালো, অথচ কাজ কিছু নেই। সুরমার ঠিক যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না। আর এমন একটা সুখের কাজ বাংলাদেশের এত লোক এড়িয়ে তার স্বামীর হাতে কেমন ক'রে এলো, সে-কথা ভেবে রীতিমতো অবাক হ'লো সে। তা অবাক হ'য়ে আর কী হবে—মানুষের কপাল যখন ফেরে, তখন এই রকমই।

—কাউকে বলতে বারণ করলে কেন?—সুরমা নিজের সৌভাগ্য একা-একা সহ্য করতে পারছিলো না—হ'য়ে তো গেছে।

—হ'য়ে গেলোই বা। কাজকর্মের ব্যাপার—বাইরে বেশি বলাবলি না-করাই ভালো।

—আহা, বাইরে আমি কাকে আর ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো। শ্বশুরমশাইকে বলেছো?

—না, বলিনি এখনো। বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি গবর্মেণ্টের চাকরিতে ঢুকি, হয়তো তিনি খুব খুশি হবেন না। হাজার হোক, সামান্ত কোম্পানির চাকরি বই তো নয়।

—কী যে বলো! সামান্য হ'লো কিসে! আর গবর্মেণ্টের চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়। শ্বশুরমশাই খুবই খুশি হবেন, দেখো।

হলেনও। অনুপমের এ-কাজে বিলিতি কাপড়চোপড় না-হ'লে নাকি চলবে না, ও-সব করাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হ'য়ে গেলো। হেমবাবু ধার ক'রে এনে দিলেন টাকাটা। তারপর কয়েকদিন সেই শ্বেতাঙ্গ বেশে অনুপম নিয়মিত যাতায়াত করলো—ইতিমধ্যে গোটা দুই নতুন টাই কেনা হ'য়ে গেলো। সুরমা বিছানার তলায় পাৎলুন ভাঁজ ক'রে রাখে, টাই মোজা রুমালের হিশেব রাখে, আর বাড়ির মধ্যে সারাদিন কারণে অকারণে অফুরন্ত কাজ ক'রে বেড়ায়।

আজ তাই স্বামীকে খাওয়ার পর শুয়ে পড়তে দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলো। রোজ নির্দিষ্ট সময়ে আপিশে না-গেলেও হয়তো চলে, কিন্তু একেবারে শুয়ে থাকলে চলে কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম উঠলো, উঠে একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে বললো—চললুম।

—আজ স্যুট পরবে না?

—না, যা গরম!

স্বামীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার একটু কষ্ট হ'লো। ভাদ্র মাসের রোদ্দুর সমস্ত গায়ে পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে বেরুনো! তাই সে বললো—আজ না-বেরোলেও চলে নাকি?

—বেরোলেও হয়, না-বেরোলেও হয়—শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।

—তাহ'লে আজ আর না-বেরোলে। একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।

অনুপম হেসে বললো—ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠাতে হয় না আমাদের, যতদিন খুশি না-গেলে কেউ কিছু বলবার নেই।

—বলো কী? যতদিন খুশি না-গেলেও চলে?

—তা চলে বইকি। ওদের কাজ পাওয়া দিয়েই কথা।

—কাজটা তাহ'লে ওরা কেমন ক'রে পাবে?

—তুমি তা বুঝবে না।

সুরমা আর-কিছু বললো না। সত্যি, কাজটা যে কী-রকম তা সে

ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও আর কথা না-ব'লে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে এসে শুয়ে পড়লো আবার। উঠলো যখন, পাঁচটা বেজে গেছে। সুরমা চা ক'রে এনে দিলো। চা খেয়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে অনুপম বেরিয়ে গেলো বোধহয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

তার পরের দুটো দিন এইভাবেই কাটালো সে। সুরমা মাঝে-মাঝে দু-একবার তাড়া দিলো, কিন্তু অনুপম নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বললে—তুমি তো দেখছি ভারি ছেলেমানুষ! এজেন্টরাই সব কাজ করে যে। আমার বেরোবার কী দরকাব। এই তো আজ বিকেলেই দু-জনেব আসবাব কথা আছে আমার কাছে।

সত্যিও সেদিন বিকেলে দুটি ছেলে এলো তার কাছে। অনুপম তাদের সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ কথা বললো। সুরমা চা পাঠালো, খাবাব পাঠালো, পান পাঠালো।

ভাবি খুশি হ'লো সে মনে-মনে।

পবেব দিন সকালে ন-টা না-বাজতেই অনুপমেব বেরোবাব তাড়া লেগে গেলো। আজ তাকে যেতে হবে ভাটপাড়া, সেখানে একজন বড়ো দরের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। অসম্ভব তাড়াহুড়ো ক'বে, কোনোরকমে দুটো গবম ভাত আব মাছেব ঝোল গলাধঃকবণ ক'বে, পোশাক প'রে, মা-র কাছ থেকে দুটো টাকা নিযে সে বেবিযে গেলো। তার কিছুই খাওযা হয়নি ভেবে পবে সুবমাও ভালো ক'বে খেতে পারলো না—তিনটে না-বাজতেই উঠে স্টোভ ধরিয়ে নানাবকম খাবার তৈরি করতে বসলো।

এদিকে অনুপম আপিশে গিয়ে খবর পেলো ভাটপাড়াব ভদ্রলোককে অন্য কোম্পানিব লোক পাকডে ফেলেছে। ব'সে-ব'সে আড্ডা দিলো ঘণ্টা তিনেক, তাবপব আব-একজনের সঙ্গে বেবিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে এ-আপিশ ও-আপিশ ঘুবে বেড়ালো যেখানে যত চেনা লোক আছে। কোথাও এক পেয়ালা চা, কোথাও পান, নানারকম লাখ-বেলাখেব গল্প, সময়টা কাটলো মন্দ না। কিন্তু রোদ্দুরে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, যা-ই বলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন চা খাচ্ছে সুরমা জিগেস করলো—কেসটা পেলে ?

—কোন···?

—ভাটপাড়ায় গেলে যে ?

অনুপম বলতে পারলো না যে ভাটপাড়ায় সে যায়নি। ঘুরিয়ে বললো—আর-একদিন যেতে হবে।

—কবে যাবে ? কাল ?

—এত খবর দিয়ে তোমাব দবকার কী ? আমার কাজ আমি ভালো বুঝি।

এর পরে কয়েকদিন সে যথাসময়ে রাজবেশ প'রে বেরোলো, যথাসময়ে ফিরে এলো। তারপর একদিন সে সুরমাকে বললো—আর-একটা অফর পেয়েছি, এব চেয়ে ভালো।

—কী রকম ?

—এক ভদ্রলোক একটা বিজনেস করবেন, আমাকে পার্টনার ক'রে নিতে চান। লায়ন্স রেঞ্জে আপিশেব ঘর খোঁজা হচ্ছে। এখন অবশ্য মাত্র হাজার দশেক নিয়ে আরম্ভ হবে—তবে ভদ্রলোক কুড়ি হাজার পর্যন্ত ফেলতে রাজি। তাঁর নিজের আরো অনেক কাজ আছে—আমাকেই ম্যানেজাব হ'তে হবে। আপিশে আলাদা ঘরে বসবো টেলিফোন থাকবে, বাড়িতেও রাখতে হবে একটা। তুমি যখন-তখন দরকার হ'লে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বেশ ভালো—কী বলো ?

সুরমা জিগেস করলো—ব্যবসাটা কিসের ?

—সে নানারকম। ঐ ভদ্রলোকের দশ রকম ব্যবসা আছে কলকাতায়—কাগজ, কাঠ, কয়লা, তাছাড়া একটা জুয়েলারি দোকানও আছে। বিস্তব পয়সা ওর, পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলতেও আটকাবে না। আমাকে গোড়াতে দু-শো দেবে, আস্তে-আস্তে পাঁচশো পর্যন্ত উঠবে।· লাভের উপর আমার টু পার্সেণ্ট শেয়ারও থাকবে, তাইতে বা কোন না দু-হাজার হবে বছরে। আর আপিশের

পার্টিটা অবশ্য আমার অজ্ঞেই থাকবে। আমাদের কয়েকজন কেরানি দরকার—আছে নাকি তোমার জানাশোনা কোনো ছেলে-ছোকরা?

সুরমা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললো—তুমি তাহ'লে ইনশিওরেন্সের কাজটা ছেড়ে দেবে?

—ছেড়ে দেবো না তো কী! ঐ মাইনেতে কোনো ভদ্রলোকের কি চলে! আর যা খাটুনি! রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে হয়রান।

—তা যেখানেই যাও, ব'সে-ব'সে কেউ তো তোমাকে খাওয়াচ্ছে না।

—তুমি কিছু বোঝো না। এটা কত ভালো। আপিশটাই আমার, সবই আমার ইচ্ছেমতো হবে। আমার পার্টনার নিজে বিশেষ-কিছু দেখতে-শুনতে পারবেন না, আমি রাজি হয়েছি ব'লেই তিনি ব্যবসাটা ফাঁদবেন।

—অত বড়ো একটা ব্যবসা চালাতে তুমি পারবে তো? ব্যবসাতে তো খাটুনি সবচেয়ে বেশি শুনি।

—ওঃ, সে ঠিক হ'য়ে যাবে দু-দিনেই। দু-চারখানা বইপত্র দেখে নিলেই হবে। তাছাড়া আমার নিজেকে তো বিশেষ-কিছু করতে হবে না, আমার অধীনে কেরানিরাই থাকবে। শিগগিরই আমরা আরম্ভ ক'রে দেবো কাজ—আপিশের একটা ভালো ঘর পেলেই হয়।

হঠাৎ সুরমার কী-রকম একটা সন্দেহ হ'লো। জিগেস করলো—ইনশিওরেন্সের কাজটা তুমি ছেড়েই দাওনি তো?

অনুপম মুচকি হেসে বললো—তা একরকম ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারো।

সুরমার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। ক্ষীণস্বরে বললো—একেবারে ছেড়েই দিলে! ওটার তো এখনো ঠিক নেই। শ্বশুর-মশাইকে একবার জিগেসও করলে না!

—ওঃ, বাবাকে আবার জিগেস করবো কী। এ-সব ব্যাপারের উনি বোঝেনই ভারি। তাছাড়া, কিছু ঠিক নেই বলছো কেন? কোম্পানি শিগগিরই রেজিস্টার্ড হবে। আরে ভাবছো কেন—বাবার

দুঃখ এতদিনে দূর হ'লো। বাবাকে আর এক বছরের বেশি চাকরি করতে দেবো নাকি ভেবেছো!

কথাটা শুনে সুরমা রোমাঞ্চিত হ'লো, কিন্তু ছোট্ট একটু সন্দেহ তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিলো না। তাই সে বললো—কিন্তু ব্যবসা তো, তার নিশ্চয়তা কী? বাঁধা একটা চাকরি হুট ক'রে ছেড়ে দিলে।

—ভারি তো বাঁধা চাকরি। ব্যাটারা ভারি পাজি, ছোটোলোক, কথা দিয়ে কথা রাখে না, টাকা-পয়সা কিছু দিতে চায় না!

সুরমা অবাক হ'য়ে বললো—বলো কী। চাকরিতে কখনো মাইনে না-দিয়ে পারে। মাস পুরলে নিশ্চয়ই দেবে। তুমি ওদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করোনি তো?

এবারে অনুপম বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললো—ওদেব যা ব্যবহার, তাতে ঝগড়া না-ক'বে পারা যায় না। আছে, ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। মান-সম্মান নিয়ে ওদের কাজ করা যায় না। দিয়েছি আজ খুব দু-কথা শুনিয়ে।

সুবমা হতাশ স্ববে বললো—তাহ'লে ছেড়েই দিয়েছো!

অনুপম একটু হেসে বললো—আহা, তুমিও যেমন! এমন একটা ভাব কবছো যেন কত বড়ো একটা লোকশান। ও-রকম চাকরি পথে-ঘাটে অনেক ছড়িয়ে থাকে।

কথাটা আসলে সত্য, কেননা বীমার দালালি আজকাল চাইলেই পাওয়া যায। কিন্তু যতখানি কাজ করতে পারলে তা থেকে মাসে পঞ্চাশটা টাকাও উপার্জন কবা যায, অনুপমের পক্ষে তা অসম্ভব। অবশ্য আসল কথাটা জানে না ব'লেই সুরমা চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললো—বলো কী! আজকালকার দিনের পক্ষে ও তো চমৎকার চাকরি ছিলো। আমি তো মনে করি ও-রকম একটা কাজ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনুপম তাচ্ছিল্যের সুরে বললো—তুমি তা-ই মনে করতে পারো, আমি করিনে। তাছাড়া, কত একটা বড়ো কাজে যাচ্ছি। ত্যাখো না

দু-পাঁচ বছরে কী হয়। শোনো—ভদ্রলোক বলছেন আমাকেও কিছু টাকা ফেলতে। বেশি না, হাজার পাঁচেক। তাহ'লে লাভের টেন পর্সেণ্ট দিতে রাজি। টেন পর্সেণ্ট মানে জানো? বছরে হাজার দশেক তো বটেই। বলবো নাকি বাবাকে একবার?

সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললো—দেখতে পারো ব'লে।

একটু যেন দ্বিধা ক'রে অনুপম বললো—আচ্ছা, তোমার বাবা কি কিছু দিতে পারেন না?

সুরমা ম্লান হ'য়ে গিয়ে বললো—আমার বাবা গরিব মানুষ, তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন?

একটু যেন লজ্জিতভাবেই অনুপম বললো—আচ্ছা, থাক, থাক। এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম। তুমি কিছু ভেবো না। এ-ব্যবসায় লাভ আমাদের হবেই। অবশ্য রিস্‌ক্ যে কিছু নেই তা নয়—রিস্‌ক্ সব ব্যবসাতেই আছে—তা একটু রিস্‌ক্ না-নিলে জীবনে কি বড়ো হওয়া যায়! তুমিই বলো!

সুরমা আবার জিগেস করলো—ব্যবসাটা কিসের?

এবারেও অনুপম জবাব দিলো—আছে নানা রকমের।

—ইনশিওরেন্সের কাজটা এ-ক'দিন ক'রেই ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে কিনা কে জানে। কিছুদিন করলে হয়তো ভালো লাগতো। মোটে তো ভালো ক'রে করলেই না।

—আরে ছী-ছি, এ-কাজ কি ভদ্রলোকে করতে পারে! দু-দিনেই ঘেন্না ধ'রে গেছে! বললুম না তোমাকে, ওরা অত্যন্ত বদ লোক—কথায়-কথায় অপমান করে।

—তা এ-ক'দিনের মাইনে দিয়ে দিয়েছে তো?

—তা দিলেও তো বুঝতুম। কিছু না, এক পয়সাও না।

—বলো কী, এ-ক'দিন খাটিয়ে নিলে, তার মজুরি দিলে না! এ কি সম্ভব নাকি?

—ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

—বাঃ, এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি। আইন আছে কী

করতে? একটা উকিলের চিঠি দাও—বাপ-বাপ ক'রে টাকা দিয়ে দেবে।

—ব'য়ে গেছে এখন আমার সামান্ত কয়েকটা টাকার জন্ম অত হাঙ্গামা করতে। বিজনেস-এর জন্ম এখন ভয়ানক খাটতে হবে কিছুদিন। অত সময় কোথায় আমার!

—তাই ব'লে তুমি চুপ ক'রে এ-ও সহ্য করবে?

—খুব দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি—আবার কী? আমাদের ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠুক, তখন ঐ পচা কোম্পানির ম্যানেজারকে কেরানি রাখবো।

এর পর কয়েকদিন অনুপমকে সত্যি খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার সে বেরোয় আর বাড়ি ফেরে। অদ্ভুত সব জায়গায় এনগেজমেণ্ট থাকে তার। টেলিফোন ছাড়া কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, সামনের মাসের গোড়ার দিকেই আনিয়ে ফেলবে একটা। কিছুদিন তার পকেটে কিছু টাকা-পয়সাও ঝনঝন করলো। তাছাড়া পকেটে তার প্রায়ই সচিত্র পুস্তিকা দেখা যায়—মোটরগাড়ির ক্যাটালগ। আপিশের গাড়ি কেনা হবে—সে-ভারও তারই উপর পড়েছে।

দিন পনেরো কাটলো এইভাবে। ততদিনে সুরমারও প্রায় বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে যে বাণিজ্যেই বসতে লক্ষ্মী। এখন ভালোরকম সব চললেই হয়।

রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া অনুপম আজকাল প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রমে শরীর পাছে ভেঙে পড়ে, সে-ভাবনায় তার মা ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অনুপমের সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই তার। তার নামে বড়ো-বড়ো খামে টাইপ-করা চিঠিপত্র আসে, নানা রকমের লোক আসে বাড়িতে। হ্যাঁ—এ না-হ'লে আর ব্যবসা কী! সুরমা ভাবে, এতদিনে তার স্বামী নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে, একদিন

সত্যি-সত্যি বিরাট কিছু হ'য়ে বসা আশ্চর্য নয়। কার মধ্যে কী থাকে বলা তো যায় না।

আরো কিছুদিন গেলো। তারপর এক রাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনুপম বললো—শোনো, কলেজ স্কোয়ারের কাছে পাঁচশো টাকায় একটা চায়ের দোকান বিক্রি হচ্ছে। ভাবছি বাবাকে ব'লে সেটা কিনে ফেলি। পাঁচশো টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন?

সুরমা অবাক হ'য়ে বললো—কেন, চায়ের দোকান কিনে তুমি কী করবে?

—কী আবার করবো। চালাবো। মাসে দু-শো টাকা নেট প্রফিট।

—বলো কী। মাসে দু-শো টাকা যাতে লাভ, সে-দোকান পাঁচশো টাকায় ছেড়ে দিচ্ছে! লোকটা কি পাগল?

সঙ্গে-সঙ্গে সুর নামিয়ে অনুপম বললো—না, ঠিক দু-শো হয়তো হবে না। দেড়শো—হ্যাঁ, একশো তো হবেই। ব'লে-ক'য়ে পাঁচশোতেই রাজি করাতে পারবো বোধহয়। লোকটার ব্যামো হয়েছে, পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যেতে চায়।

—তোমার হাতে সেই কোম্পানি তো রয়েছে—এত বড়ো ব্যবসা—

—হ্যাঁ, বিজনেসটা রয়েছে বটে। তা চায়ের দোকানটাও থাক না। 'গোটা কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আমি তো নিজে গিয়ে দোকানে বসতে পারবো না। বুঝলে না—চার-পাঁচটা কলেজের কাছে কিনা, ছাত্রদের ভিড় হয়। বেশ লাভ।

—নিজে না-দেখলে দোকান চলে না।

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসবো বইকি। কালই বলবো বাবাকে। আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁও ক'রে তোলা যায়। তাহ'লে অবশ্য চৌরঙ্গি পাড়ায় তুলে আনতে হয়।

হঠাৎ সুরমার মনে পড়লো, সেই ব্যবসার কথা স্বামীর মুখে কিছুদিন ধ'রে শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা ভয়ের ভাব এলো

তার মনে, খুব নিচু গলায় জিগেস করলো—তোমাদের ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হবে ?

—জোগাড়যন্ত্র চলেছে। এ-প্রসঙ্গে অনুপমের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো না।

—এ-মাসের প্রথমেই আরম্ভ হবার কথা ছিলো না ?

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এইভাবে অনুপম বললো—চায়ের দোকানটাই কিনে নেবো। আমাদের কালীপদ বেশ বিশ্বাসী লোক, তাকেই বসিয়ে দেয়া যাবে। ও তো বাড়িতে আট টাকা স্লেটে মাইনে পাচ্ছে, আমি কুড়ি টাকা দেবো—আচ্ছা, না-হয় পঁচিশই দেয়া যাবে। ওর পক্ষে কত বড়ো একটা লিফট ভাবো তো।

বোধহয় সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে অনুপম খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরো কয়েকমাস কাটলো। অনুপম যেদিন খুশি বাড়িতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়, যেদিন খুশি পোশাক প'রে বেরোয়। কোথায় যায় ? একটি মন্থলি টিকিট নিয়ে শহরের এমন জায়গা নেই যেখানে সে না যায়। বড়োবাজারে তার আনাগোনা, ড্যালহৌসি স্কোয়ারের অনেক আপিশে তার ঘন-ঘন আবির্ভাব। কিছু কাজ নেই; সুতরাং সে সবচেয়ে ব্যস্ত। তার পাশ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেই ঘূর্ণির মধ্যে ঢোকবার যত বারই চেষ্টা করে, তত বারই ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এসে বলে—উঃ, এত ভয়ানক পরিশ্রম আর সহ্য হয় না।

সত্যি, অকারণে নিরুদ্দেশে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো—কতদিন মানুষ তা সইতে পারে ? কতদিন, আর কতদিন ?

তবে এটাও মানতে হবে যে সে এখন বিজনেসম্যান। অবশ্য সেই কুড়ি-হাজারি কোম্পানিটা শেষ পর্যন্ত হ'লো না, সমস্ত ঠিকঠাক হবার পরে যে-লোকটি টাকা দেবে, সে-ই শেষ মুহূর্তে পেছ-পা হ'লো—লোকটাকে শূকরসন্তান বললে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। পৃথিবীর

সব লোকই এই রকম—ইতর, অশিক্ষিত, ধূর্ত, স্বার্থপর, প্রতারক—এতগুলো খারাপ লোকের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক অনুপমের উপায় কী? তা সেও একটা বিজনেস চালাচ্ছে, ক্লাইভ রো-তে এক বন্ধুর আপিশে গিয়ে একটা চেয়ারে দু-তিন ঘণ্টা ব'সে থাকে মাঝে-মাঝে। বিজনেসটা কী, সেটা সুরমা এখনো জানে না, যখন বেশ ফেঁপে উঠবে তখন জানতে পারবে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়। দোকানদারি করাটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ কি? 'দোকানে যাচ্ছি,' বলতে কেমন বিশ্রী লাগে না? 'আপিশে যাচ্ছি,' কথাটাই বেশ। তাও নিজের আপিশ। অনুপম এখন নিজেব আপিশে যাচ্ছে।

এইভাবেই আরো এক বছর কাটলো। হেমবাবু মলিন জিনের প্যাণ্ট প'রে আপিশে যান, আপিশ থেকে ফিরে শুয়ে থাকেন খোলা গায়ে চিৎ হ'য়ে, মাসের পয়লা তারিখে প্রচুর ধার শোধ করেন ও সাত তারিখে আবার ধার করতে ছোটেন। বড়ো ছেলের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয় না তাঁর। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনুপম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বাইরের ঘরে বাপের মুখোমুখি প'ড়ে গেলো। সে এড়িয়ে বেরিযে যাচ্ছিলো, হেমবাবু তাঁকে ডাকলেন। একটু কেশে, অত্যন্ত যেন লজ্জিতভাবে বললেন:

—শোন—আমাদেব আপিশে একটা চাকবি খালি হয়েছে।

অনুপম চুপ ক'বে রইলো, যেন এ ব্যাপারে তার কিছুই এসে যায় না।

—আমি তোর কথা সাহেবকে বলেছি, তবে যা দিনকাল—

—কী চাকরি?

—মন্দ নয় খুব। পঞ্চাশ টাকা থেকে আবম্ভ—

—ওঃ, পঞ্চাশ টাকা! অনুপম খুব মৃদুস্বরে বললো কথাটা, অসম্ভব আজগুবি কিছু শুনে যেন সে হতবাক হ'য়ে গেছে।

—পঞ্চাশ থেকে সওয়া-শো, তারপর ডিপর্টমেণ্টল পরীক্ষায়

উংরোলে হয়তো তিনশো পর্যন্ত যাওয়া যাবে। গবর্মেন্টের বাঁধা জেলে আস্তে-আস্তে উঠে যাবি—বেশ ভালোই তো।

অনুপম বললো—পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে!

খুব কুণ্ঠিত স্বরে বললেন হেমবাবু—আপাতত আর-কিছু যখন হচ্ছে না—। আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে রেখেছি—কাল সেটা দিতে হবে।

অনুপম বাপের মুখের উপর আর-কিছু বললো না, পরের দিন দরখাস্ত সই ক'রে দিলো। স্ত্রীকে বললো—দুঃখে-কষ্টে বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকায় কেরানিগিরি করতে বলছেন।

সুরমা বললো—ঐ পেলেই কত লোক আজকাল কৃতার্থ।

—কত লোক তা-ই হ'তে পারে, আমার কথা আলাদা। বিজনেস-এব লাইন আমি ছাড়বো না। আমাব একটা স্কীম আছে—সেটা হ'য়ে গেলে তো আর কথাই নেই। দস্তবমতো গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতে পারবো।

স্কীমটা কী, সুরমা তা শুনতে চাইলো না। শুনেই বা কী হবে, সে সামান্য মেয়েমানুষ, ও-সব বড়ো-বড়ো ব্যাপাব সে বুঝবে না।

অনুপমই আবার বললে—একটু বুদ্ধি থাকলে কলকাতার শহরে মাসে শো-পাঁচেক রোজগাব করা কিছুই না। গ্যাখো না সব মাড়োয়ারিদের—না জানে লেখাপড়া, না পাবে ভদ্রলোকের মতো একটা কথা বলতে। একজন মাড়োয়াড়ির সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি, তার কাছে সব ফন্দি-ফিকিব শিখে নিচ্ছি। দেখবে আর দু-দিন পরে—হ্যাঁ, আমাকে একটা টাকা দাও তো।

সুরমা বললো—একটা টাকা?

—একটা টাকাও নেই তোমাব কাছে?

—আমার কাছে টাকা থাকবে কোত্থেকে?

—কেন, বাজার খরচ তো তোমার হাতেই আজকাল। আচ্ছা, এক টাকা না পারো আট আনা দাও।

—এক টাকাই দিচ্ছি। নিজের জমানো খুচি আধুলি বের ক'রে দিলো সুরমা। মাঝে-মাঝে এমন দেয়। তার হাতে দু-চার আনা পয়সা যা আসে সব সে সযত্নে জমিয়ে রাখে, যে-কোনো দিন স্বামীর দরকার হ'তে পারে।

পরের দিন হেমবাবু আপিশ থেকে খানকয়েক বই নিয়ে এলেন। অনুপমকে ডেকে বললেন—এগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখিস একটু—ইণ্টারভিয়ুতে ডাকতে পারে।

—পঞ্চাশ টাকার চাকরি, তার আবার ইণ্টারভিয়ু!

—ইনকাম-ট্যাক্সের আইনগুলো একটু দেখে নিস। কিছু জিগেস করলে দু-একটা কথা বলতে পারলেই হ'লো।

—বাবার একদম মাথা-খারাপ হয়েছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুপম বললো। আমাকে বলছেন ইনকাম-ট্যাক্সের বই পড়তে। এখনো যেন আমার পরীক্ষা পাশ করার বয়স আছে। হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সে, হাসিটা অত্যন্তই উচ্চ।

—ভালোই তো। কখনো একখানা বই তো ছুঁয়েও ছাখো না। তবু একটু পড়াশুনোর চর্চা হবে।

—ওঃ, পড়াশুনো সম্বন্ধে এই তোমার ধারণা! ইনকাম-ট্যাক্সেব আইন! অনুপম আরো জোরে হেসে উঠলো।

বইগুলো সে ছুঁয়েও দেখলো না। সন্ধেবেলা আপিশ থেকে ফিরে নাকের নিচে চশমা নামিয়ে হেমবাবুই সেগুলো পড়তে বসলেন। রোজই এ-রকম হ'তে লাগলো; যখনই সময় পান, হেমবাবু ব'সে-ব'সে ইনকাম-ট্যাক্সের আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করেন। অনুপম তাঁকে একদিন দেখে ফেললো। হাসতে-হাসতে সুরমাকে গিয়ে বললো—দেখেছো বাবার কাণ্ড! তিনি বই পড়লে কি আমার বিদ্যে হবে?

সুরমা শান্তভাবে বললো—ও, সেটা তাহ'লে বোঝো!

—আমাকে দিয়ে ও-সব রাবিশ চাকরি পোষাবে না তা তো আমি ব'লেই দিয়েছি।

তারপর একদিন আপিশে সায়েবের কাছে তার ডাক পড়লো। না-গেলে বাবা নেহাৎই দুঃখিত হবেন, শুধু সেই কারণেই সাজগোজ ক'রে গেলো সে। ফিরে এসে বললো—সাহেব আমাকে বললে, তুমি আমাদের হেমবাবুর ছেলে, তোমাকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। তা আপাতত এটা নিলে কেমন হয়, বলো তো? বিজনেসটা একটু কেঁপে উঠলে ছেড়ে দিলেই হবে। হাত-খরচটার জন্য আরকি—বুঝলে না?

সুরমা বললো—আপাতত হাত-খরচ ছাড়া আর-কোনো খরচও তো নেই তোমার।

—আহা, কোনোরকমে দিন কাটলেই কি হ'লো! বাবার অবস্থা দেখছো তো। সেই মাড়োয়ারিটা যা বলে তাতে তো মনে হয় ছ-মাসের মধ্যেই খুব সুবিধে হ'য়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে অনুপম বাড়ি ফিরে দেখে সুরমার মুখ ভারি গম্ভীর। জিগেস করলে—কী হয়েছে তোমার?

—তোমার চাকবির খবর এসেছে।

—কী খবর? অনুপম খুব তাচ্ছিল্যের সুরেই জিগেস করলো, তবু তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো।

—হয়নি। শ্বশুরমশাই ভারি ভেঙে পড়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হ'য়ে গেলো অনুপমের মুখ। কিন্তু তক্ষুনি আবার বললো—ওঃ, বাঁচলাম। হ'লে মুশকিলই হ'তো—বাবার জন্য না-নিয়েও তো পারতাম না। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি এখন থেকে শেয়ার মার্কেটেই মন দেবো। এ ছাড়া আর-কিছুতে পয়সা নেই। গোড়াতে হয়তো মাসে দু-শো আড়াইশোর বেশি হবে না—ক্যাপিট্যাল না-থাকার এই তো মুশকিল। তবে বছরখানেক মধ্যে পাঁচশো-মতো সহজেই হ'য়ে যাবে। আমাদের এ-বাড়িটা ভারি ছোটো—এটা ভাড়া দিয়ে তখন বড়ো বাড়িতে যাবো, কী বলো?

মাস্টার মশাই

দু-বার বি. এ. ফেল ক'রে কোন জন্মে কলেজ ছেড়েছিলুম : এত দিনে কলেজ তার শোধ নিলো।

আমরা পুরোনো জমিদার। গেরিলার মতো আমাদের অবস্থা আজকাল : রাশিয়ার নয়, আফ্রিকার গেরিলা। আমরা মরতে বসেছি—কোনোরকম চেষ্টাতেই বাঙালি জমিদাররূপী সুখী শৌখিন প্রাণীটিকে বেশি দিন আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

মদ, ঘোড়া, মামলা, আমলা, বেশ্যা, সন্ন্যাসী, স্বদেশী ব্যবসা—এই সব গতানুগতিক অপঘাতে বহু কাল ধ'রে ঝাঁঝরা হ'য়ে-হ'য়ে বহু-বিভক্ত জমিদারির যে-অংশটুকু আমার পাতে পড়লো, সেটা এমনই আঁটোসাঁটো মাপের যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভোগ করবার উপায় নেই; হয় খেটে-খুটে বাড়াতে হয়, নয় ফুঁকে দিতে হয় এক নিশ্বাসে। কিন্তু ও-দুয়ের কোনোটাই সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। আমার জীবন-চরিতে বি. এ. পরীক্ষার পরিচ্ছেদটা আকস্মিক নয়, স্বভাবতই ফেল করার দিকে আমার ঝোঁক : এমনকি যে-সব ক্ষেত্রে জমিদারপুত্রের চিরাচরিত অধিকার—যেমন পরস্বাপহরণ কি পরোপকার, রাজনীতি কি লাম্পট্য—তার কোনোটিতেই কিছুমাত্র শক্তি নেই আমার, অভিরুচিও না। অম্বুরি তামাকের সৌগন্ধ্যে তাকিয়াশ্রিত তন্দ্রার আবছায়ায় আমার জীবনটা কেটে যেতে পারতো—আমি তাতে সুখীই হতাম—কিন্তু তা আর হ'তে পারলো কই। জমিদার-জন্তু যারা পড়বে যার হাতে, সেই নখদন্তবান নব্য অবতার তোলপাড় তুলেছে পৃথিবীতে—গেলো শ্রী, শৃঙ্খলা, শান্তি, সম্ভ্রম, সৌজন্যও গেলো—এখন লাল বাতি জ্বললেই হয়। সে-দুর্দিন আমার জীবনেই হয়তো আসবে—কিন্তু এমন দুর্দিনই বা কী। ভালোই তো। পুরোনো পাপের

উদ্ভেদের জন্ত টাটকা-টাটকা পাপ লাপালাপি ক'রে বেড়াচ্ছে ; এ-অবস্থায় একমাত্র আশা করবার এই আছে যে শেষ যেন শিগগির হয়। তা-ই যদি, তাহ'লে শেষ হবার অপেক্ষায় না-থেকে শেষ ক'রে দেয়াই তো ভালো ? যা কেড়ে নেবে তা যদি আগে থেকেই খেড়ে ফেলি ?...হঠাৎ আমি ঠিক করলাম, আমাদের শহরে একটি কলেজ করবো।

একেবারে হঠাৎও নয়। ফেনিতে, মালদয়, বগুড়ায় কলেজ আছে, অথচ আমাদের এই বড়োসড়ো সচ্ছল জেলায় আজ পর্যন্ত একটি হ'লো না, এ নিয়ে কোথায় যেন লজ্জা ছিলো আমার। লজ্জার কারণ এই যে, প্রজারা এখনো আমাকে রাজা ব'লেই ভাবে, আর আমিও মানুষ হয়েছি প্রথমতন্ত্রে, শক্তি না-থাকলেই দায়িত্ব চুকে যায় এ-কথা ভাবতে শিখিনি কখনো। আসলে দায়িত্ববোধের শৈথিল্যেই শক্তি ক'মে আসে, তাই তো আমার কলেজ-কল্পনার মনোবিলাস তামাকের ধোঁয়ায় পেঁচিয়ে-পেঁচিয়েই মিলিয়ে গেছে দিনের পর দিন। আর শেষ পর্যন্ত হয়তো ইচ্ছাময়ের চরণেই আমার এই ইচ্ছাময় চিন্তার অবসান হ'তো, যদি না কলকাতায় বোমার হিড়িকের সঙ্গে-সঙ্গে মফস্বলে আরম্ভ হ'তো কলেজের হিড়িক। মহকুমায়, গঞ্জে, গ্রামে কলেজ গজিয়ে উঠলো দেখতে-দেখতে, অথচ আমাদের অঞ্চলে কোনো সাড়াশব্দই নেই। মনের মধ্যে একটা হীন, সংকীর্ণ দেশপ্রেমের জ্বলুনি-পুড়ুনি এমন তীব্র হ'য়ে উঠলো যে মনস্থির করতে আর দেরি হ'লো না। একেবারে পয়লা নম্বরি কলেজ করা চাই ; যা লাগে লাগুক, নিজেদের খাওয়া-পরার নিছক সংস্থানটুকু বাঁচিয়ে সর্বস্ব দেবো। সব তো যাবেই, এ-ভাবেই যাক—মানে কিছু একটা হ'য়ে থাক তবু। আমার ছেলে যদি জমিদারির আশা রাখে, সে তবে মূঢ়, আর আমি যদি তার জন্ত সে-আশা করি, আমি ততোধিক।

এ-কাজে আমার প্রধান সহায় হলেন হরিহর চক্রবর্তী। শহরের সব চাইতে বড়ো এবং বুড়ো উকিল তিনি : চল্লিশ বছর ধ'রে প্র্যাকটিস করছেন, এবং এই চল্লিশ বছরে আমাদের আদি সম্পত্তির প্রায়

অনেকই তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছে, এটা একাধারে তাঁর বুদ্ধির এবং বিত্তের পরিচয়। সত্যি বলতে, তাঁর তুল্য যোগ্য ও মান্ত ব্যক্তি পাশাপাশি দুটো-তিনটে জেলাতেও আর-একজন নেই। যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের পাণ্ডা হ'য়ে প্রায় জেলে গিয়েছিলেন; উদ্যোক্তা ছিলেন প্রথম দিশি ব্যাঙ্কের স্থাপনায়—সে-ব্যাঙ্কের অপমৃত্যুতেই হরিহর চক্রবর্তীর উত্থানের সূত্রপাত এই রকম একটা প্রবাদ যদিও প্রচলিত আছে, আমি সে-কথা কখনোই বিশ্বাস করিনি। ছেলেবেলা থেকে দেখছি তাঁকে, বাবার অগাধ আস্থা ছিলো তাঁর উপর—এবং মন্দ লোকে যদিও সর্বদাই ব'লে থাকে যে আমাদের বর্তমান দুর্দশার সেটাই কারণ, সে-কথাও মানি না আমি। দুর্দশার কারণ আমাদেরই অক্ষমতা: আমরা যদি মামলাবিলাসী হই, সেটা কি উকিলের দোষ? হরিহরবাবুকে দেশপ্রেমিক এবং কর্মবীর ব'লেই জেনে এসেছি; রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে দু-তিনখানা খবরের কাগজ আর দু-এক পেয়ালা চায়ের সহযোগে দেশের অবস্থাটা তিনি এমনি দীপ্তিময়ী ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন যে তার প্রভাবে আমি যে আমি, আমিও একবার যৎকিঞ্চিৎ দেশোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলুম। উনিশ-শো একুশে আমাদের চরকা ধরিয়েছিলেন তিনি, আমার নিজের কাটা সুতোয় আট হাতি একখানা ধুতিও তৈরি হয়েছিলো—যদিও অন্তঃপুরে সেটা নিয়ে অত্যন্ত বেশি হাসাহাসি হবার ফলে সে-ধুতি আমার কটিলগ্ন হ'তে পারেনি।

হরিহরবাবুর কাছে কলেজের প্রস্তাব নিয়ে যখন গেলাম, তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, বেশ। আমি নিশ্চয়ই জানতাম আমাদের সরোজ একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো কিছুই জানি না, আপনি ভরসা।'

'আমি তো আছি, ভাবনা কী।'

মনে-মনে যতটা ভাবতে পেরেছিলাম, সব বললাম। ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত শুনে বললেন, 'আমার কাছে কী আশা করো ঠিক ক'রে বলো তো।'

একটু কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'সরস্বতীর আসন রচনা করতে হ'লে প্রথমেই লক্ষ্মীর প্রসাদ চাই।'

'তার জন্যে আর ভাবনা কী—তুমিই তো আছো লক্ষ্মীর বরপুত্র।' হরিহরবাবু সশব্দে হেসে উঠলেন।

'একলা আমি কি সবটা পেরে উঠবো। আপনি যদি কিছু...'

হরিহরবাবুর মুখ গম্ভীর হ'লো। আস্তে-আস্তে বললেন, 'পৈতৃক বিত্ত কিছুই পাইনি আমি, নিজের জীবনে নিজের উপার্জনে সামান্য যা করেছি, তা বিলিয়ে দিলে পুত্রপৌত্রের প্রতি অন্যায় করা হবে। তাছাড়া, আমি যদি অর্থ দিয়ে তোমার কলেজে সাহায্য করি, তাহ'লে তোমার নিজের চেষ্টা হয়তো চরমে পৌঁছতে পারবে না—আমি বলবো সেটা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। ত্যাগের পথে মানুষকে বাধা দিতে নেই। অরবিন্দ ঘোষ বলতেন...'

অরবিন্দ ঘোষ কী বলতেন, তা শোনবার জন্য আমি উৎসুক হলাম, কিন্তু কথাটা শেষ না-ক'রে হরিহরবাবু নিজেই আবার বললেন, 'এ-রকম কিছুই আমি করবো না যাতে কোনো-এক সময়ে তোমার মনে হ'তে পারে আমি তোমার আত্মশক্তি হরণ করেছিলাম।'

মানতে হ'লো তাঁর যুক্তির সারবত্তা। পৈতৃক বিত্ত নিয়ে আমিই যখন জন্মেছি, আর সেটা যখন এ-কালের নীতি অনুসারে অপরাধ, তখন সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে, শোধ করতে হবে দেশের কাছে বহুকালের সঞ্চিত ঋণ। শোধ করবার সুযোগ সকলে পায় না, পেলেও নেয় না; আমিও যাতে পেয়েও না হারাই সে-বিষয়ে যত্ন নিয়ে হরিহরবাবু আমাকে কৃতজ্ঞ করলেন তাঁর কাছে। অবশ্য হরিহরবাবুর পুত্র-পৌত্রে এ-অপরাধ নতুন ক'রে বর্তাবে—কিন্তু তাতে কী? আমি বাপের পয়সা পেয়েছিলাম, অতএব আমার ছেলে পাবে না; হরিহরবাবু পাননি, অতএব তাঁর ছেলে পাবে—এ-ই তো বেশ উত্তম যুক্তিসংগত কথা। সাম্যনীতির প্রথম প্রস্তাবই তো এ-ই।

আরো খানিকক্ষণ আলোচনার পরে স্থির হ'লো যে হরিহরবাবু হবেন কলেজের প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারি, কমিটির মেম্বর থাকবেন এ-অঞ্চলের আরো কয়েকজন গণ্যমান্য সজ্জন। হরিহরবাবুকে কয়েক দিনের মধ্যেই একবার কলকাতা যেতে হবে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো তরফে দেখাশোনা ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে আসবেন।

বিশ্ববিদ্যালযের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেলো। সামনের জুলাইতেই কলেজ খোলা হবে।

শহরের বাইরে পূর্বপুরুষ একটি সুবৃহৎ প্রমোদ-ভবন বানিয়েছিলেন; ব্যবহারের অভাবে বাবার আমল থেকেই পরিত্যক্ত। পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ব্যয় ক'রে সেইটেকে কলেজের প্রয়োজন-মতো সংস্কার করিয়ে নিলাম: এক পাশে একশো ছেলের উপযোগী হস্টেল। দেখতে-শুনতে ভালোই হ'লো। বিলাস-প্রাসাদকে বিদ্যামন্দিরে রূপান্তরিত ক'রে মনে-মনে বেশ-একটু গর্ব হচ্ছিলো আমার,—আমি-যে আধুনিকতায় একেবারে অনধিকারী নই এটাই কি তার প্রমাণ হ'লো না?

হরিহরবাবু তাঁর একটু দূর সম্পর্কের দু-জন আত্মীয়কে প্রোফেসরির জন্য আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, অন্যান্য অধ্যাপকের জন্য কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হ'লো। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে অধ্যক্ষ পাবার আশা কম, অথচ সদ্যোজাত কলেজের প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে শক্তিশালী ও যশস্বী অধ্যক্ষের উপর। দেশে তেমন লোক কে আছেন যাঁকে পাবার আশা আমরা করতে পারি? প্রশ্নটা মনে জাগতেই মাস্টার মশায়ের কথা আমার মনে পড়লো।

রাজশাহির সরকারি কলেজে ছাত্র ছিলাম তাঁর। সেই যুব-বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ ভ'রে ছড়িয়েছিলো। কিন্তু মানুষ ছিলেন তিনি অত্যন্ত শান্ত আর নম্র, আর এত লাজুক যে কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতেন না। তাই তাঁর লেকচারে 'ভালো ছেলে'রাও মন দিতো না, আর আমার মতো মূর্খরা তো নিয়মিত ক্লাশ পালাতো। তবু ক্লাশের বাইরে আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে একটু

ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম, বাড়িতেও যাওয়া-আসা ছিলো; আর তার ফলে আমরা তাঁকে ভক্তি করতে শিখেছিলাম, পণ্ডিত ব'লে নয়, মানুষ ব'লেই। তাঁর সংস্পর্শে এমন একটি নিঃশব্দ মধুরতা অনুভব করতাম, এমন একটি ভয়-মেশানো ভালোবাসায় মন ভ'রে উঠতো যে আমি তখনই উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর চরিত্রের অসামান্যতা। কলেজ ছেড়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধে আমার আগ্রহের অবসান হয়নি: তিনি যে গবর্মেণ্টের আলিঙ্গনচ্যুত হ'য়ে কলকাতার একটি প্রাইভেট কলেজে আত্মনিয়োগ করলেন, তিনি যে বিপত্নীক হলেন, তাঁর প্রভাবে যে সেই প্রাইভেট কলেজ সর্ববিধ কৃপণতা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য হ'য়ে উঠলো, ক্রমে-ক্রমে সাংসারিক জীবন থেকে একেবারে স'রে এসে তিনি যে একান্তরূপ গ্রন্থবিহারী হ'য়ে উঠলেন—এই সমস্ত খবরই লোকমুখে আমি শুনেছিলাম, তার উপর কলকাতায় গেলে মাঝে-মাঝে দেখাও করেছি তাঁর সঙ্গে। আমাদের কলেজের জন্য তাঁকে যদি কোনোরকমে পাই, তাহ'লে আর ভাবনা থাকে না; তাঁরই মহত্ত্বে এই প্রচেষ্টার সাফল্য অবধারিত হ'তে পারে।

এই সম্ভাবনা নিয়ে সুখস্বপ্ন দেখে সময় নষ্ট করলাম না, পরের দিনই চ'লে গেলাম কলকাতায়।

একতলার ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে মাস্টার মশায় মোটা একখানা বই পড়ছিলেন। ঘর-জোড়া তক্তাপোশ মলিন চাদরে ঢাকা, তক্তার উপরে দেয়াল ঘেঁষে তিন আলমারি বই; এদিকে বনাত-ছেঁড়া সেক্রেটারিয়েট টেবিল বইয়ের বাগান হ'য়ে আছে। ধুলো, কালির দাগ, ফলের খোশা, চায়ের পেয়ালা, ছিন্ন-ভিন্ন খবর-কাগজ;—এই শ্রীহীন বিশৃঙ্খলার মধ্য ব'সে-ব'সে মস্ত মোটা কালো মলাটের বই থেকে নিঃশব্দে নিংড়ে-নিংড়ে কী-সুধা তিনি পান করছেন, আমাকে তা জানতে হ'লে নতুন ক'রে জন্মাতে হবে। আমি ঘরে ঢুকে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকলুম, চোখই তুললেন না মাস্টারমশাই।

হঠাৎ আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে বললেন, 'এই যে।'

আমাকে চিনতে না-পেয়েই বললেন, বুঝতে পারলাম। আমি অস্ফুট একটু শব্দ করলাম শুধু।

বই নামিয়ে রেখে চশমা খুলে আমার দিকে তাকালেন, আমি সেই সুযোগে প্রণাম ক'রে বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'সরোজ না? বোসো। বড্ড মোটা হয়েছো।'

আর-কিছু বললেন না, কেমন আছি, কেন এসেছি, কী চাই, কিচ্ছু না। আমার ভয় হ'লো পাছে তখনই আবার বই খোলেন, তাই তাড়াতাড়ি কথা পাড়লাম।

'আমি বিশেষ একটু দরকারে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'ও,' ব'লে বইটা বন্ধ ক'রে হাতের সবুজ পেন্সিলটা দু-আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে লাগলেন।

আমার বক্তব্য মনে-মনে ভালো ক'রে সাজিয়েই এসেছিলাম, সেই অনুসারে আরম্ভ করলাম: 'ছাত্রজীবনে আপনার কাছে যত অপরাধ করেছি, আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করবো, এই আমাব বাসনা।'

এটুকু ব'লে, উৎসাহসূচক কোনো-কিছু শোনার আশায় মাস্টার মশায়ের মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু তাঁর সমাহিত গম্ভীর মুখশ্রীতে ঔৎসুক্যের এক চুল বিকার দেখতে পেলাম না। অচেনা কেউ হ'লে তখনই হতোদ্যম হ'য়ে পড়তো, কিন্তু আমি তো তাঁর স্বভাব জানি, তাই দম নিয়ে আবার বললাম, 'আমাদের ওখানে একটা কলেজ করেছি।'

'ও।' চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন, একপাতা খবর-কাগজ কোলে টেনে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে সবুজ পেন্সিলের দাগ কাটতে লাগলেন তার উপর।

আমি অনর্গল ব'লে যেতে লাগলাম—জমিদারির অবস্থা, শিক্ষার সমস্যা, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা, আমার কর্ম-কল্পনা—বলতে-বলতে গলা চড়লো, ভাষা এলোমেলো হ'লো, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জ'মে উঠলো কপালে। তারপর রুমাল বের ক'রে যখন ঘাম

মুচছি, তাকিয়ে দেখি মাস্টারমশাই খবর-কাগজের গায়ে একটি সবুজ পদ্মফুল আঁকা শেষ করেছেন।

'আপনি কী বলেন এ-বিষয়ে?'

'ভালো।'

'সব-শেষে একটি নিবেদন আছে আমার,' ব'লে আমি আসল কথাটি উত্থাপন করলাম। মাস্টার মশাই হঠাৎ যেন জেগে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ?'

আমার প্রার্থনা খুব স্পষ্ট ভাষায় পুনরায় জানালাম আমি। তারপর বললাম, 'আমার এ-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই হবে আপনাকে; আপনি রাজি না-হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে যাবো না, এই পণ ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।'

পদ্মফুলের পাশে একটা পাখি আঁকতে লাগলেন মাস্টার মশাই। আঁকতে-আঁকতে পাখিটা যখন প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিলের আকার ধারণ করলো, তখন হঠাৎ চোখ তুলে বললেন, 'ভেবে দেখবো।'

আমি বললাম, 'ভেবে দেখবার আর কী আছে। কী আপনার অসুবিধে, কী রকম ব্যবস্থা হ'লে আপনার পক্ষে এটি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে তা যদি বলেন—'

'ভেবে দেখি।'

আমি অদমিত উৎসাহে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তখনই অন্য দু-জন ভদ্রলোক এলেন, আমাকে উঠতে হ'লো। যাবার সময় বললাম, 'কাল এই সময়ে আবার আসবো।' মাথা নেড়ে বিদায় দিলেন আমাকে, বললেন না কিছু।

রীতিমতো ধন্না দিয়ে প'ড়ে রইলাম আমি। এই নতচক্ষু নির্বাক গ্রন্থমগ্ন অঙ্কনপ্রিয় মানুষটির মুখ থেকে দুটি-চারটি কথা যা আদায় করতে পারলাম তাতে মনে হ'লো যে ওঁর আগ্রহ নেই বটে, কিন্তু আপত্তিও বিশেষ নেই; শুধু স্থানান্তরিত হবার হাঙ্গামাকে ওঁর ভয়, শুধু শারীরিক আলস্য, যেটা অনেক সময়ই মনস্বিতার অনুষঙ্গ—জিনিশ-পত্র.

বাঁধাছাঁদা, রেলগাড়ি, নতুন জায়গায় নতুন ক'রে বসা, এ-সব ভাবতেই ওঁর খারাপ লাগে—যেমন আছি, বেশ আছি, যে-ব্যবস্থা (বা অ-ব্যবস্থা) চলছে সেটাই সবচেয়ে ভালো, কিংবা, ভালো যদি সেটা না-ও হয় তার চেয়ে ভালো কী-ই বা হবে আর—ওঁর মনের ভাবটা বুঝতে পারলাম, এই রকম। অর্থ মানুষের জীবনে উৎসাহের একটি বৃহৎ উৎস—সে-উৎস ওঁর রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, পদমর্যাদাও আকর্ষণ করে না ওঁকে ; এ-রকম মানুষকে অনুরোধে ক্ষত-বিক্ষত করা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। তা-ই করলাম আমি, আর সেই সঙ্গে এই কথাটার উপরেও জোর দিতে লাগলাম যে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না ওঁকে, বইপত্র এবং অন্যান্য জিনিশ পৌঁছে যা'বে আগেই, কিছু ভাবতে হবে না ও-সব নিয়ে, চোখ বুজে গাড়িতে চড়বেন, আর গাড়ি থেকে নেমে সাজানো বাড়িতে উঠবেন। কখনো, কোনো কারণে, এতটুকু অসুবিধে যদি ওঁর হ'তে দিই, তাহ'লে আমি আছি কী করতে ?

পর-পর সাত দিন আমার এই গলদ্ঘর্ম বাগ্মিতা তিনি নিঃশব্দে সহ্য করলেন। তারপর বললেন, 'সত্যি কি তোমরা আমাকে চাও ?'

আমি ব'লে উঠলাম, 'আপনাকেই চাই আমরা—অবশ্য আপনার কাছে যদি ব্যর্থই হই, তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে অন্য কারো কাছে যাবো, কিন্তু অন্য কারো কাছে ব্যর্থ হ'য়ে আপনার কাছে আসিনি, কিংবা অন্য কারো কথা ভাবছিও না, ভাবিনি এখন পর্যন্ত।'

কথাটা এমন জোর দিয়ে বলেছিলাম যে শেষ ক'রে হাঁপাতে লাগলাম। মাস্টার মশায় আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা।'

ফিরে এসে হরিহরবাবুকে যখন সুখবরটা দিলুম, তিনি ভুরু কুঁচকোলেন।

'একেবারে ঠিক ক'রে এসেছো ?'

'ঠিক ক'রে এসেছি মানে ? আমাদের কত ভাগ্য যে তাঁকে রাজি করাতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ, এককালে নাম-ডাক ছিলো বটে সতীশঙ্করের। কিন্তু এখনকার ছেলেরা কি আর তাতে ভুলবে? বিলেতফেরৎও নন, ডক্টরেট ডিগ্রিও নেই।'

'বলছেন কী আপনি! শিক্ষক মহলে ওর তুল্য মানুষ বাংলা-দেশে আজ আর কোথায়? উনি হলেন জাত-পণ্ডিত—মানে, উপার্জনবুদ্ধির জন্য পাণ্ডিত্য সংগ্রহ করেন না উনি, পাণ্ডিত্য ওঁর স্বভাবগত। আর ও-রকম মহৎ চরিত্র যে-কোনো দেশেই বিরল।'

'হ্যাঁ,' আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হরিহরবাবু বললেন, 'সেই স্বদেশী যুগে একটু চিনতাম ওঁকে। উনিও মেতেছিলেন, কিন্তু কাজে নামলেন না, ব'সে-ব'সে শুধু ইতিহাস পড়লেন। বড্ড নিরীহ মানুষ।'

'ওঁকে তো আর ফ্যাক্টরির ম্যানেজর বা পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল হ'তে হচ্ছে না যে জবরদস্ত মানুষ হওয়া চাই!' আমি হেসে ফেললাম। 'কলেজের প্রিন্সিপালকে যে রকম হ'লে মানায়, উনি ঠিক সেইরকমই।'

'বেশ, তোমার কলেজ, তুমি যেমন বোঝো চালাবে। ভালো হ'লেই ভালো।'

আমি বুঝতে পারলাম যে হরিহরবাবু সুখী হলেন না, কিন্তু মাস্টার মশাইর কথা ভেবে আমার নিজের এত বেশি ভালো লাগছিলো যে অন্য-কিছুই গ্রাহ্য মনে হ'লো না তখনকার মতো। পরে আমি ভেবে দেখেছি যে হরিহরবাবু যখন কলেজের প্রেসিডেন্ট, তখন কর্তৃত্বের উচ্চতম মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য, যে-কোনো সিদ্ধান্ত, অন্তত নিয়মরক্ষার খাতিরে, তাঁর অনুমোদনসাপেক্ষ সেখানে: আমার কর্তব্যে একটু ত্রুটিই হয়তো হয়েছিলো। কিন্তু সতীশঙ্কর দত্তকে অধ্যক্ষের পদে আহ্বান করতে হ'লে যে কারো অনুমতির প্রয়োজন কিংবা সেটা যে তর্কাধীন, বা একটা আলোচ্য বিষয়, এ-কথা কখনো আমার মনেই হয়নি। হয়তো আমার ভক্তির উচ্ছ্বাসও হরিহরবাবুর ঠিক মনঃপুত হয়নি; সমসাময়িক জীবিত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে যদি

প্রশংসা করি, তাহ'লে শ্রোতার মনে সাধারণত এই আশাই থাকে যে 'তবে'-'কিন্তু'-সহযোগে ঘন-ঘন সেই প্রশংসা থেকে বিয়োগ করা হবে; নয়তো তা যেন সহ্যই করা যায় না। হরিহরবাবুও তো কম কৃতী নন—সাংসারিক হিশেবে মাস্টার মশায়ের চাইতে অনেক বেশি কৃতী—অতএব আমার ঐ উচ্ছ্বাসের তিনি হয়তো এই মানেই করেছিলেন যে তাঁর যোগ্যতা আমি যথোচিত মাত্রায় উপলব্ধি করি না বা স্বীকার করি না। মানুষের মনে কত রকম দুর্বলতা যে থাকে!

২

মাস্টার মশাই এলেন; জুলাই মাসে শো-দুয়েক ছেলে নিয়ে কলেজ আরম্ভ হ'লো।

মাসখানেক পরে হরিহরবাবু একদিন বললেন, 'ওহে সরোজ, তোমার মাস্টার মশাইকে আর-একটু কড়া হ'তে বলো।'

'কড়া মানে?'

'মাস্টাররা নাকি ফাঁকি দিচ্ছে এর মধ্যেই?'

'ফাঁকি দিচ্ছে?'

'ঘণ্টা বাজার পব অন্তত দশ মিনিট না-কাটলে কেউ নাকি ক্লাশেই যায় না?'

'কী জানি, আমি তো···'

'সুধীর বলছিলো, নয়তো আমিই বা জানবো কী ক'রে—'

'সুধীর?'

'কেমিস্ট্রির সুধীর, আমার ভাগনে। বলছিলো যে প্রিন্সিপাল নিজেই দেরি ক'রে যান, তাই···তা ওঁকে যা মানায়, সকলকে তো আর তা মানায় না।'

কথাটা ভালো লাগলো না আমার। মুখে হাসির ভাব রেখে বললুম, 'এ-সমস্তর ভার ওঁর উপরেই ছেড়ে দেয়া ভালো, এর জন্যই তো হাতে-পায়ে ধ'রে নিয়ে এসেছি ওঁকে।'

'আহা—তুমি হ'লে কলেজের কর্তা, তুমি দেখাশোনা না-করলে চলবে কেন?'

'কী করতে বলেন আমাকে আপনি?'

'কী আর করবে, খোঁজ-খবর রাখবে আরকি সব। কেউ দেরি ক'রে ক্লাশে গেলো কিনা, না কি ঘণ্টা বাজার আগেই ছেড়ে দিলো, এ তো বেয়ারারাই বলতে পারবে তোমাকে। আর হেড ক্লার্ককে ব'লে দেবে কোনো প্রোফেসর কলেজে না এলে, বা কলেজে এসে ক্লাশ না নিলে, তক্ষুনি যেন সেটা জানানো হয়। স্টাফ-এর মধ্যেও দু-একজনকে যদি একটু বেশি অনুগ্রহ দেখাও, তাহ'লে তারাও...'

'আপনি বলছেন কী! এটা একটা কলেজ, বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান!'

একটু চুপ ক'রে থেকে হরিহরবাবু বললেন, 'তুমি এখনো ছেলেমানুষ আছো, দেখছি। যেখানে দশ জন নিয়ে কাজ, সেখানে এ-সব করতেই হয়।...লীভ রুলস ড্রাফট করা হয়েছে?'

'অত নিয়ম-টিয়ম ক'রে কী হবে—নিয়ম যত কম হয়, ততই নিয়মভঙ্গের সম্ভাবনা কমে।'

'ভুল বললে। প্রোফেসরি তো ওকালতি নয় যে যত কাজ, ততই পয়সা; তাই প্রথম থেকেই এটা বদ্ধমূল ক'রে দেয়া চাই যে অনিয়মটাই এখানে নিয়ম নয়। প্রোফেসরদের হাজিরার খাতায় কেউ-কেউ নাকি সই করে না?'

'সত্যি কি কোনো মানে হয় সই করার?

'ঠিক বলেছো! শুধু ওখানে সই করার মানে হয় না—এমনও হ'তে পারে যে কেউ একদিন এলেন না, অথচ পরের দিন এসে দু-দিনের সই করলেন—'

'ছী-ছি!' আমার কান গরম হ'য়ে উঠলো।

'ছী-ছি-র কিছু নেই, কোনো অন্যায় অসম্ভব ব'লে যদি ভাবো, তাহ'লে তুমি কেবলই ঠকবে।...ক্লাশের রেজিস্ট্রি খাতাতেও প্রত্যেক-বার সই করতে হবে, এইরকম নিয়ম ক'রে দাও। আর ক্লাশ যেন

প্রত্যেকের পাকা আঠারো ঘণ্টা থাকে সপ্তাহে—কুড়ি-বাইশ হ'লেও দোষ নেই—এমনিতে তা না হয় তো ট্যুটবিষেল বাড়িয়ে দাও ঠেশে। বাবুরা খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, কোনোরকমে একবার কলেজে এসেই তখনই আবার বাড়ি ফিরে যাবেন, এ-রকম যেন না হয়।'

শুনতে-শুনতে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো আমার। আমি তো একটা ব্যবসা ফাঁদিনি, বা প্যাঁচালো পলিটিক্সেও প্রবেশ করিনি—আমি খুলেছি কলেজ, কিন্তু এখানেও কি শান্তি নেই, প্রীতি নেই, সৌজন্য নেই?

কথা যেন শেষ হ'য়ে গেছে, মুখের এই রকম ভাব ক'রে হরিবাবু টেবিলের উপর তাঁর নথিপত্রে মন দিলেন। আমি উঠবো-উঠবো করছি, এমন সময় চোখ তুলে হঠাৎ বললেন, 'সুধীরকে ভাইস-প্রিন্সিপাল ক'রে দাও।'

'আজ্ঞে?

'সুধীর—আমার ভাগনে—তার কথা বলছি।'

'ও।'

'সতীশঙ্কর তাঁর পড়াশুনো নিয়ে থাকুন, ম্যানেজমেণ্টের জন্য একজন পাকা লোক চাই তো। সুধীর দেখতে বোকাসোকা হ'লে হবে কী—মানুষ খুব কাজের— ওর উপর নির্ভর করতে পারবে তুমি। দু-দুটো ওষুধের কারখানায় কাজ ক'রে এসেছে, লোক খাটাতে জানে।'

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললাম, 'তাহ'লে তো ওঁকে হস্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট ক'রে দিলে হয়—কিংবা কলেজের সুপারিনটেনডেণ্ট হ'তেই বা দোষ কী—মানে, আপিশের চার্জে থাকলেন, ওখানে তো হাঙ্গামা কম নয়, ভালোই লাগবে ওঁর।'

হরিহরবাবু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করতে তোমার আপত্তিটা কী?

'না, না, আপত্তি ঠিক নয়—' আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

'অযোগ্য নয়, জর্মন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট ডিগ্রি আছে।'

'আমি তো শুনেছি জর্মনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি মানেই ডক্টরেট। আমাদের যেমন বি. এ.।'

'অত তলিয়ে আর কে দেখছে বলো। ডক্টর কথাটাই ওজনদার। ডক্টর ডিগ্রিওলা আর একজনও তো নেই কলেজে, ওর জন্য কিছু না-করলে ভালোও দেখায় না। বেশি খরচ বাড়াতে বলছি না তোমাকে, গোটা পঞ্চাশ অ্যালাউয়েন্স দিলেই হবে আপাতত। টাকাটা জলে যাবে না ঠিক জেনো, কাজ পাবে ডবল।...সামনের মাসে কমিটির মীটিং আছে, আমি কথাটা তুলবো ভেবে রেখেছি।' ব'লে হরিহরবাবু আর-একবার তাকালেন আমার দিকে।

পরের মাসের মীটিংএ সুধীরবাবুকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করা হ'লো। মেম্বরদের অনেকেই অনেক কথা বললেন, আর সকলের সব কথার শেষে আমরা যখন মাস্টার মশাইর মুখের দিকে তাকালাম, তিনি মৌনভঙ্গ না-ক'রে মাথা নেড়ে সায় দিলেন শুধু।

কলেজ নিয়মিত চলতে লাগলো দেখতে-দেখতে একটা সেশন শেষ হ'য়ে এলো প্রায়। ঠিক হ'লো, গ্রীষ্মের ছুটির আগেই বার্ষিক পরীক্ষা হবে, এবং তার ফলাফলও জানিয়ে দেয়া হবে ছেলেদের। ফল বেরোতে দেখা গেলো, পঞ্চাশটির বেশি ছেলে ফেল করেছে।

নোটিস-বোর্ডের সামনে ছেলেদের হল্লা চললো সারা দিন ভ'রে, আর পরদিন থেকে একটি একটি ক'রে ছেলে এসে দাঁড়ালো প্রিন্সিপালের দরজায় খাতা-ছেঁড়া এক এক টুকরো কাগজ তাদের হাতে। রীতিমতো ভিড় জ'মে উঠলো।

কোত্থেকে ছুটে সুধীরবাবু এলেন তাদের কাছে।—'কী, কী করছো তোমরা এখানে? সব ফেল বুঝি? যাও এখন—তোমাদের বিষয়ে ভেবে দেখা হচ্ছে—পালাও।'

ছেলেদের মধ্যে একজন কী যেন বললো, সুধীরবাবু মুখের রেখায় কঠোরতার সঙ্গে সহৃদয়তা মিশিয়ে তার জবাব দিলেন। আর তার

পরেই ছেলেরা বেশ খুশি-খুশি হ'য়ে স'রে পড়লো সেখান থেকে—একজনও বাকি থাকলো না। দেখলাম, লোকটির ক্ষমতা আছে।

প্রিন্সিপালের ঘরে পরামর্শ-সভা বসলো, মাস্টার মশাই, সুধীরবাবু আর আমাকে নিয়ে। সুধীরবাবু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'সাতান্নটি ছেলে তো ফেল করেছে।'

মাস্টার মশাই বললেন, 'হুঁ।'

এদের সম্বন্ধে স্যর কী করতে চান?'

'আপনিই না বললেন ওরা ফেল করেছে?'

'কিন্তু ওদের কি আমরা আটকেই রাখবো সত্যি?'

'চিরকাল রাখবো না।'

সুধীরবাবুর মুখ একটু লাল হ'লো। নেকটাইয়ে টান দিয়ে বললেন, 'অবশ্য ফেল যারা করেছে তাদের আটকানোই উচিত, কিন্তু তাহ'লে কলেজের কী অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখা দরকার। ছেলেদের মধ্যে বেশির ভাগই গরিব, অতিরিক্ত এক বছর পড়া খরচ চালাতে বললে প্রায় অত্যাচারই করা হয় তাদের উপর। আবার বেশির ভাগই অত্যন্ত সাধারণ ছেলে, সাধারণের চেয়েও নিচুতে, সুতরাং ফেল তারা করবেই। এখন কথা হচ্ছে, এই সাতান্নটি ছেলেকে এবার যদি আটকে রাখি, তাহ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কী? কথাটা রাষ্ট্র হবে চারদিকে, ছেলেদেব মনে, গার্জেনদের মনে ভয় ঢুকে যাবে এ-কলেজ সম্বন্ধে, সামনের বছর ভর্তি ক'মে যাবে। গর্বমেণ্ট কলেজ নয় আমাদের, গবর্মেণ্টের গ্র্যাণ্টও নেই: ছাত্ররা যা মাইনে দেয়, সেই আয়েই কলেজ চলবে, সম্ভব হ'লে উদ্বৃত্তও থাকবে কিছু, এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। যাতে ছাত্রসংখ্যা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে কলেজও বড়ো হ'তে পারে তারই জন্য সবতোভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে আমাদের; আর সেজন্যই এই ফেল-করা ছেলেদের বিষয়ে আমি আবার ভেবে দেখতে বলি।'

সুধীরবাবু থামতেই আমি বললাম, 'কিন্তু ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় যদি ফেল করে তারা?'

'তা তো করবেই, অনেকেই করবে, কিন্তু সেখানে তো আর আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। কলেজটাকে ছেলেদের পক্ষে যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক ক'রে চাই, তাহলেই ভর্তি বাড়বে। এ-বছর বাজেটে আমাদের পঁয়তিরিশ হাজার টাকা ডেফিসিট—আপনি সেটা দিয়ে দিচ্ছেন, স্যর, সামনের বছরও আপনিই দেবেন, হয়তো তার পরের বছরও, কিন্তু বছরের পর বছর এ-রকম হ'তে থাকলে শেষ পর্যন্ত কুলোনো যাবে কি? আপনিই ভেবে দেখুন, স্যর।'

সুধীরবাবু আমাকেও যখন স্যর বলেন আমার ভারি লজ্জা করে, আবার মুখ ফুটে সে-কথা বলতেও লজ্জা করে। একটু আড়ষ্টভাবে জবাব দিলাম, 'কিন্তু তাহ'লে আর পরীক্ষা নিয়ে লাভ কী?'

'তবু তো ও-উপলক্ষ্যে ছেলেরা একটু বইয়ের পাতা ওল্টায়, সেদিক থেকে ওর মূল্য আছে। এ-পরীক্ষা কিছুই নয়, ধাপ্পা, কিন্তু ধাপ্পাটায় ফাঁকি থাকলে চলবে না। দুটো কি তিনটে লিস্টে ভাগ ক'রে-ক'রে সকলকেই প্রোমোশন দেয়া হোক, কিন্তু সেটা যে সহজে হয়নি, অনেক ভেবে-চিন্তে দয়া ক'রে আমরা ছেড়ে দিলাম, এই ভাবটা বজায় থাকা চাই পুরোপুরি। ছেলেরা তাতে খুশি হবে, কৃতজ্ঞ হবে, আর ছেলেদের সন্তুষ্টিতেই কলেজের সমৃদ্ধি।'

আমি হেসে বললাম, 'কলেজ বুঝি একটা দোকান, আর ছেলেরা খদ্দের?'

'বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো তা-ই। কলেজটা বেশিদিন আপনার গলগ্রহ হ'য়ে না থাকে, সেটাও তো দেখতে হবে।'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কিন্তু ছেলেরা যখন জেনে যাবে যে কলেজের পরীক্ষাটাই ফাঁকি, তখন তাদের নিজেদের ফাঁকির কি আর সীমা থাকবে?'

'তা হয়তো থাকবে না, কিন্তু ওরই মধ্যে পাশ ক'রে যাবে অনেক ছেলেই, হঠাৎ কারো-কারো রেজাল্ট ভালো হ'তেই বা বাধা কী। কথাটা এই যে ছাত্রসংখ্যা বাড়াতে হ'লে মনের ও-সব সূক্ষ্ম বাবুগিরি

বাদ দিতে হবে, আর ছাত্রসংখ্যা বাড়ানো ছাড়া কলেজ চালাবার কোনো উপায়ও নেই আমাদের।'

'মাস্টারমশাই, আপনি—' তাকিয়ে দেখি, মাস্টার মশাই মাথা নিচু ক'রে ব্লটিং কাগজের উপর নীল পেন্সিলে একটা অদ্ভুত চতুষ্পদ জন্তু এঁকে ফেলেছেন।

জন্তুটার পুচ্ছদেশ পরিপুষ্ট করতে-করতে মুখ না-তুলেই মাস্টার মশাই বললেন, 'বেশ !'

সুধীরবাবুর চোখে বিজয়ের বিদ্যুৎ খেলে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তাহ'লে সতীশবাবুকে প্রথম লিস্টটা তৈরি করতে বলি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিয়ে আসবে আপনাব কাছে। আজই নোটিস-বোর্ডে দিয়ে দিলে ভালো হয়।'

গটগট জুতোর শব্দ ক'রে ব্যস্তভাবে সুধীরবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকলাম, কিন্তু মাস্টার মশাই ছবি আঁকা থামালেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা কববাব পব আস্তে-আস্তে আরম্ভ করলাম, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম—'

পেন্সিলটা হঠাৎ নামিয়ে রেখে মাস্টার মশাই বললেন, 'আমি দেখলাম তোমারও তা-ই মত, তাই—'

'আমার ? না তো। আমি ববং—'

'ঠিকই তো। অফুরন্ত টাকা তো তোমার নেই যে কলেজেব পিছনে অফুরন্ত ঢালবে,' ব'লে মাস্টার মশাই চেযাবে হেলান দিলেন।

অধোবদনে নিঃশব্দে ব'সে রইলাম। কলেজ যদি একটা ব্যবসাই, তাহ'লে কলেজ করলাম কেন, আর কি কোনো ব্যবসা ছিলো না ?

সন্ধেবেলা হরিহরবাবু আমার বাড়িতে এলেন। গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'শুনলুম সব সুধীরের কাছে। তোমাব মাস্টার মশাইকে বোলো যে অত কড়া হ'লে কাজ চলে না।'

'আপনিই না তাঁকে বলেছিলেন আরো একটু কড়া হ'তে ?'

'সে তো স্টাফ-এর সম্বন্ধে। তাই ব'লে ছেলেদের উপর দাবরাব ! সুধীর আজ খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে, বলতে হবে।'

'আপনি তাহ'লে বলছেন যে মাস্টারদের কর্তা হ'লো কলেজ, আর কলেজের কর্তা হ'লো ছেলেরা ?'

হরিহরবাবু নকল দাঁতের দ্যুতি দেখিয়ে হেসে উঠলেন। '—আরে এ তো সোজা কথা। তোমার পয়সা দিচ্ছে কে ? স্টাফ। তোমাকে পয়সা দিচ্ছে কে ? ছেলেরা। তবেই বোঝো কার মনরক্ষা করা দরকার। এই যে দু-হাতে টাকা ঢালছো, তা তো ফিরে আসাও চাই। কত জনকে দেখলুম কলেজ ক'রে ফেঁপে উঠতে—বুঝে-সুঝে চলতে পারলে তোমারও হবে হে, তোমারও হবে।' আর-একবার নকল দাঁতের আভা আমার চোখের সামনে ঝলসে উঠলো।

মনটা আমার অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে গেলো সেদিন।

৩

গ্রীষ্মের ছুটিতে মাস্টার মশাই দার্জিলিং গেলেন, সুধীরবাবু রইলেন কলেজের চার্জে। আমিও বাসস্থানেকের জন্য পুরী গিয়েছিলুম, ফিরে এসে দেখি কলেজের ভর্তি বাড়াবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছেন সুধীরবাবু। শুধু কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই ক্ষান্ত হননি, আশে-পাশে লোকও পাঠিয়েছেন ছেলে ধরতে। উড়ো খবর এলো যে জলপাইগুড়ি স্কুলের একটি ছেলে ম্যাট্রিকে ফিফথ হয়েছে—পাছে গেজেট হবার সঙ্গে-সঙ্গে রংপুরের কলেজ তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে, কিংবা সে বোমার ভয় না-ক'রে মূঢ়ের মতো কলকাতার দিকেই ধাবিত হয়, সেইজন্য সুধীরবাবু আগেই চর পাঠিয়েছেন তার কাছে—কলেজ ফ্রী, হস্টেল ফ্রী, উপরন্তু দশ টাকা ক'রে স্টাইপেণ্ড। শহরের যে-ছেলেটিই এবার পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই অভিভাবকের সঙ্গে নাকি দেখা করেছেন তিনি ; তাছাড়া এমন জনরবও শুনলাম যে কলকাতার গাড়ি আসার সময় প্রত্যহ দূত রাখছেন স্টেশনে—ছুটিতে যে-সব ছেলে বাড়ি আসছে, কলকাতার কলেজ থেকে তাদের ভাঙিয়ে আনা যায় কিনা, সেই চেষ্টায়।

এতটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু এ-কথা মানতেই হয় যে সুধীরবাবুর চেষ্টার ফল হ'লো আশ্চর্য। ছাত্রসংখ্যা দু-শো থেকে সাতশো ছাড়িয়ে গেলো, জলপানি-পাওয়া ছেলেও এলো দু-চারটি। নতুন সেশনে জমজমাট কলেজ বেশ ভালোই লাগলো আমার। পুজো পর্যন্ত মসৃণভাবে চললো সব, আরো কিছু ছাত্র বাড়লো, কিন্তু পুজোর ছুটির পরে টেস্ট পরীক্ষার সময় এক কাণ্ড।

একটি ছেলে নকল করছিলো, ইংরেজির যুবক প্রোফেসর বিজনবাবু তাকে ধ'রে ফেলতেই সে তেড়ে উঠে অধ্যাপককে একটি অনুচ্চারণীয় সম্ভাষণ করলো। প্রোফেসর তার বই-খাতা কেড়ে নিলেন, আশে-পাশে আট-দশটি ছেলে হৈ-হৈ ক'রে উঠলো, কিন্তু বিজনবাবুকে কর্তব্য থেকে বিরত করতে পারলো না।

প্রিন্সিপালের ঘরে ডাক পড়লো ছেলেটির, দু-এক মিনিট পরেই সে একটু ভিন্ন অর্থে চোখ লাল ক'রে বেরিয়ে এলো।

তারপর ছেলেটি আমার কাছে এসে ঘডা-খডা কাঁদতে লাগলো। আমি বললাম, 'কী ? আবার আমার কাছে কেন ?'

'স্যর, আপনি সেক্রেটারি, আপনি ইচ্ছে করলে—'

'আমি ইচ্ছে করি না তোমার মতো ছেলে কলেজে থাকে। যাও।'

হাঁকিয়ে দিলুম বাঁদরটাকে। পরে শুনলুম, সে হরিহরবাবুর কাছেও গিয়েছিলো,' সুধীরবাবুর কাছেও, হাতে-পায়ে ধ'রে কিছু-একটা আশ্বাস নাকি আদায় ক'রে এনেছে। রাগে পিত্তি জ্ব'লে গেলো আমার। ছেলেমানুষ, ছাত্র—এর মধ্যে এত সব শিখেছে! আর হরিহরবাবুরাই বা কেমন—ওকে আবার আশ্বাস দিতে গিয়েছেন! সত্যি ?

বেশ তৈরি হ'য়ে পরের দিনের বৈঠকে গেলুম। সুধীরবাবু আরম্ভ করলেন, 'সত্যব্রতকে একেবারে এক্সপেল ক'রে দিলেন, স্যর ?'

'সত্যব্রত নাম বুঝি ছেলেটির ? বেশ নাম তো।' মাস্টারমশাই হাসলেন একটু।

এই সূক্ষ্ম বিদ্রূপটুকু বুঝতে পারলেন না সুধীরবাবু, কিংবা বুঝতে পেরেও অংশ নিলেন না তাতে। সভাসংগত গাম্ভীর্য অটুট রেখেই

বললেন, 'অবশ্য অন্যায় ও খুবই করেছে, কিন্তু দেশের অবস্থাও তো দেখতে হবে। চারদিকে অশান্তি, বিপর্যয়, এর মধ্যে সুস্থির হ'য়ে পড়াশুনো করাই মুশকিল।'

'কারো যদি মনে হয়,' মাস্টার মশাই ধীর স্বরে বললেন, 'যে দেশের বর্তমান অবস্থায় পড়াশুনো করা যায় না, তাহ'লে সে পড়তে আসবে কেন—কিংবা পড়াতেই বা আসবে কেন?'

আমি একটু অবাক হলাম। এতটা কথা একসঙ্গে বলতে মাস্টার মশাইকে কমই শুনেছি।

কথা শেষ হ'তেই হরিহরবাবু খকখক ক'রে কেশে উঠলেন।— 'সুধীরের কথা আপনি ছেড়ে দিন সতীশঙ্করবাবু, ও-রকম কতই বলে ও—বুদ্ধি ওর বেশি নেই, তবে উদ্দেশ্য ভালো। বিশ্বাস করুন আপনি, কলেজের কিসে ভালো হবে, এ ছাড়া ওর চিন্তাই নেই কোনো। তা কথাটা কী, লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হ'য়ে যায়।'

আমি ব'লে উঠলাম, 'লঘু পাপ কেন? শুধু যে নকল করেছে তা তো নয়, অত্যন্ত অসভ্যতা করেছে, এর পরে ওকে কলেজে রাখলে কলেজের কোনো মর্যাদাই থাকে না।'

হরিহরবাবু নরম সুরে বললেন, 'ছেলেটার ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট ক'রে দেবে, সরোজ?'

'ভবিষ্যৎ? পরীক্ষায় পাশ করাটাই ভবিষ্যতের একমাত্র রাস্তা নাকি? ওর যদি শক্তি থাকে, ও ব্যবসা ক'রে বড়োলোক হোক, কি সন্ন্যাসী হ'য়ে আশ্রম খুলুক, কি দল পাকিয়ে বাংলা'র মন্ত্রী হোক— তাতে তো আমরা বাধা দিচ্ছি না।'

হরিহরবাবু তাঁর হাতের লাঠিটির রুপোয় বাঁধানো মাথায় দু-বার চাপড় দিয়ে বললেন, 'তুমি আজ বড্ড রেগে আছো, সরোজ। ছেলেটি ভারি গরিব—'

'গরিব হ'লেই অপরাধের অধিকার জন্মায় না,' একটু অসহিষ্ণু-ভাবেই ব'লে উঠলাম আমি।

'তাছাড়া ফুটবল খেলে ভালো—'

'এটা মোহনবাগান ক্লাব নয়, কলেজ।'

এর উত্তরে হরিহরবাবু বললেন, 'কিন্তু ভালো একটা টীম হ'লে কলেজের নাম হয়। ছেলেদের মধ্যে ও খুব পপুলার, টীমের ক্যাপ্টেন হবার উপযুক্ত ছেলে, তাই ভাবছিলুম ওকে দিয়ে একটা অ্যাপলজি লিখিয়ে নিয়ে—'

এবার সত্যি ধৈর্যচ্যুতি হ'লো আমার। ঠোঁট-কাটা ধরনে বললাম, 'আপনিই বা ওর হ'য়ে এত বলছেন কেন, জানতে পারি?'

হরিহরবাবু লাঠির মাথাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বললেন, 'কেন বলছি? তার কারণ আছে।...আচ্ছা, তুমিই বলো, সুধীর। বলো।'

'আমি জানতে পেরেছি সত্যব্রতকে এক্সপেল করলে ছেলেরা স্ট্রাইক করবে,' বলতে-বলতে সুধীরবাবুর নিচের ঠোঁট একটু বেঁকে গেলো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখের ভাবটা ভালো লাগলো না—কেমন একটা গুপ্ত চাতুরী যেন ঝিলিক দিচ্ছে সেখানে—হঠাৎ একটা বিশ্রী সন্দেহ আমার বুক ঠেলে উঠলো।

জিগেস করলাম, 'ছেলেরা কী করবে না করবে তা আপনি কী ক'রে জানলেন?'

'জানা কিছু শক্ত নয়। আমি চোখ-কান খোলা রাখি, ছেলেদের মধ্যে যখন যে-রকম হাওয়া দেয় কিছুই আমাকে এড়াতে পারে না।'

'ওরা এসেছিলো আপনার কাছে?'

'এসেছিলো বইকি। আমার কাছে একটু মন খুলেই কথা বলে ওরা।' ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটু হাসলেন সুধীরবাবু।

'এসে কী বললো?'

'এ-ই বললো।'

'এ-ই মানে?' সোজা তাকালাম সুধীরবাবুর চোখের দিকে।

'স্ট্রাইক করবে ওরা।'

'আপনি কী বললেন তার উত্তরে?'

চোখের পাতা কয়েকবার নড়লো সুধীরবাবুর, তারপর চোখ নত হ'লো।

'কী বললেন আপনি ?' প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম আমি।

'কী আর বলবো—এটা সাম্যের যুগ, স্বাধীনতার যুগ, কেউ কারো বশবর্তী হবে না।'

'ছাত্রও শিক্ষকের না ?'

রুমাল দিয়ে লালচে মুখখানা মুছে সুধীরবাবু বললেন, 'এটা স্কুল নয়, ছেলেরা বালক নয়। দেশের কাজে তারাই অগ্রণী, যে-কোনো আন্দোলনে তারাই বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—'

'আমি কি জানতে পারি আপনি তাদের ঠিক কী-কথা বলেছেন ?'

জবাব দিতে একটুও দেরি করলেন না সুধীরবাবু। 'কলেজের স্বার্থরক্ষাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা, এবং ডিপ্লমেসি ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।'

'আপনি ভুল করছেন, সুধীরবাবু, ডিপ্লমেসির ক্ষেত্র কলেজ নয়,' শান্ত গম্ভীর স্বরে এই কথা ক-টি ব'লে মাস্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন। 'এ-বিষয়ে আর কথা বলা অনর্থক—আমি বাড়ি যাই।'

আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন মাস্টার মশাই। তাঁকে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে দেখি, হরিহরবাবু একলা ব'সে আছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'সুধীরকে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিলুম—একরোখা মানুষ, তার উপর ব্লাড-প্রেশার আছে, রেগে গেলে মুশকিল।'

'ব্লাড-প্রেশার আমারও আছে, আর সেইজন্য আমি চেষ্টা করি যারা আমাকে রাগিয়ে দিতে পারে এমন মানুষের দূরে-দূরে থাকতে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে হরিহরবাবু বললেন, 'সুধীর . কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছে। দেখো তুমি, ছেলেরা গোলমাল করবে।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'সেটা এড়াতে পারলেই ভালো। এমন কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে, যাতে দু-দিকই রক্ষা হয়। ছেলেদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা চাই—বুঝেছো তো ? অত দিনের পুরোনো অত বড়ো নাম-করা সিটি কলেজ সেই একবার সরস্বতী পুজোর হাঙ্গামার পর কী-রকম প'ড়ে

গেলো—আর আমরা তো এখনো আঁতুড়-ঘবে।' ব'লে হবিহরবাবু উত্তরের আশায় আমাব দিকে তাকালেন।

কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

'সতীশঙ্কর অত্যন্ত সৎ লোক—'

এবাব আমি বললাম, 'সৎ হওয়াটা কি দোষেব?'

'না, না, দোষের নয়, দোষের নয়—তবে—'

'এর মধ্যে আবার তবে কী?'

চেয়ারটা আমার একটু কাছে সরিযে এনে হরিহববাবু নিচু গলায বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলো তো? ছেলেরা কি নকল করে না পবীক্ষায়? দিন-বাত কবছে, চারদিকেই করছে। এ তো টেস্ট পরীক্ষা, কত-কত ফাইনেল পরীক্ষায় নকলেব মেলা ব'সে যায় তা কি জানো না? সকলকে যদি ধরতে যাও তবে তো ইউনিভার্সিটি তুলে দিতে হয। আমাদের সময়ে সত্যি খেটে-খুটে পাশ করতে হ'তো—সবই অন্য রকম ছিলো তখন—আমি যেবাব বি.এ. দিলুম প্যাবাডাইস লস্ট-এর ফার্স্ট ক্যাণ্টো ঝাড়া মুখস্থ বলতে পারতুম। হাজার-হাজাবও পাশ করতো না তখন, আব চাষাব ছেলেও কলেজের ছাপ নিযে বাবু সাজবার জন্য খেপে যায়নি।... ও-সব ছেড়ে দাও, এখন যে-যুগ এসেছে তাবই তালে-তালে পা ফেলে চলতে হবে, নয়তো বাঁচবে না।'

মুখে আমাব কথা সবলো না, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলাম হরিহরবাবুর বার্ধক্যের লাইন-টানা শ্রদ্ধা-জাগানো মুখেব দিকে।

'ছেলেরা নকল করছে—চোখ বুজে থাকলেই হয—বিজনবাবুবই বা অতটা বাড়াবাড়ি কববাব কী দবকার ছিলো? সেদিন কি আব-কোনো ছেলে নকল করেনি? না কি এই একটা ছেলেকে তাড়িযে দিলেই নকল কবা বন্ধ হবে?'

'তাই ব'লে বন্ধ করবাব চেষ্টাও করবো না আমরা?'

'চেষ্টা করার আবো জরুরি বিষয আছে আমাদেব। পরীক্ষা সামনে, যে-সব সবজেক্টে কোর্স শেষ হয়নি, সেগুলিতে স্পেশল

ক্লাশ-এর ব্যবস্থা করো, আর মাস্টারদের ব'লে দাও যে-ক'টি একটু ভালো ছেলে আছে, সকালে-বিকেলে তাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পড়াতে—কোনোরকমে একটা স্কলারশিপ যদি বাগানো যায়, তাহ'লে কেমন বিজ্ঞাপন হবে ভাবো দেখি!'

আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না, তবু একটু প্রতিবাদ না-ক'রে পারলাম না, 'তাই জন্যে প্রোফেসরদের বেগার খাটতে বলছেন?'

হরিহরবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় হেসে উঠলেন।—'বেগার? না তো! আরে রেজাল্ট ভালো হ'লে ছাত্র বাড়বে না, আর ছাত্র বাড়লেই তো ওঁদের ইনক্রীমেণ্টের আশা। মাস্টারদের অত পেয়ার করলে সুবিধে হবে না হে।' 'মাস্টার' কথাটা 'ম্যাষ্টের' উচ্চারণ করলেন হরিহরবাবু। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, সরোজ—আমি তোমার বাপের মতো তাই বলছি—সাংসারিক বুদ্ধি তোমার যদি কিছু থাকতোই তাহ'লে তোমার বিষয়-সম্পত্তির এ-দুর্দশা হ'তো না আজ! কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠো না—কিন্তু,' গলা বাড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'পরীক্ষার সময় আমাদের স্টাফই তো ইনভিজিলেটর—একটু যদি ব'লে-ট'লে দেয় ছেলেদের—কে-ই বা দেখতে আসছে আর কে-ই বা জানছে—পাশের পার্সেণ্টেজ কম হ'লে আবার না এফিলিএশন নিয়ে টানাটানি লাগে—এবারই তো প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছে কলেজ।··· কী মুশকিল, মুখ তুলে তাকাও না, সরোজ, এত লজ্জা কিসের—জানোই তো সবার উপরে সংখ্যা সত্য, তাহার উপরে নাই।' টেনে-টেনে, প্রফুল্ল পরিহাসের ধরনে শেষ কথাটি আবৃত্তি ক'রে বৃদ্ধ হরিহর লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারলাম না।

সুধীরবাবুর সাবধানী বাণী ব্যর্থ হ'লো না ; টেস্ট পরীক্ষার পরে প্রথম যেদিন ক্লাশ হবার কথা, সেদিনই ছেলেরা স্ট্রাইক করলো।

আমি যখন খবর পেলাম বেলা তখন একটা বেজে গেছে। বাটিবহুল মধ্যাহ্নভোজনে বসেছিলাম, গৃহিণীর সনির্বন্ধতা সত্ত্বেও সেটা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে সেরে কলেজের দিকে ছুটতে হ'লো। গিয়ে দেখি কলেজে প্রায় ঢোকাই যায় না। রাস্তায়, সামনের হল্‌-এ, দোতলায় সিঁড়িতে, থইথই করছে ছেলেরা ; সারি-সারি নেমে আসছে সব, সমবেত কণ্ঠের গর্জন উঠছে থেকে-থেকে : 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' আমি একটু স'রে দাঁড়ালাম, দেখতে-দেখতে শেষ সারিটি বেরিয়ে এলো, বেচারার মতো প'ড়ে থাকলো শূন্য-হওয়া কলেজ। যুদ্ধযাত্রী সৈন্যদের মতো, সংঘবদ্ধ মজুরদের মতো, সার বেঁধে-বেঁধে চীৎকার করতে-করতে পাশের মাঠে নামলো তারা, সকলের আগে বুক ফুলিয়ে মার্চ ক'রে চললো তাদের নেতা, বীর সত্যব্রত। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' মাঝে-মাঝে 'সত্যব্রত জিন্দাবাদ'ও বলছিলো—তবে সত্যব্রত নিজেও সেটা বলছিলো কিনা অতটা অবশ্য লক্ষ্য করতে পারলাম না।

পরে আমি শুনলাম যে এই ব্যাপারে ছেলেরা খুব প্রশংসনীয় ডিসিপ্লিনের পরিচয় দিয়েছে। সাড়ে-দশটায় কলেজ যখন বসলো, কিচ্ছু বোঝা যায়নি। প্রথম তিনটি পিরিয়ড সম্পন্ন হ'লো অন্যান্য দিনের চাইতেও মসৃণভাবে—টুঁ শব্দটি নেই কোথাও—এই অস্বাভাবিক শান্তিটাই মনে হ'তে পারতো সন্দেহজনক। তারপর, চতুর্থ ঘণ্টার আরম্ভে, অধ্যাপকরা প্রত্যেকে যখন ক্লাশে গিয়ে নাম ডাকছেন, সেই সুন্দর নাটকীয় মুহূর্তে করিডোর কম্পিত ক'রে গর্জন উঠলো—'বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো সব!' আর দেখতে হ'লো না, হুড়মুড় ক'রে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়লো ছেলেরা, দলে-দলে

বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে—শুরু হ'লো সেই নাটকের উপর যবনিকার উত্তোলন, আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাব শেষের দিকটা দেখেছিলাম।

অগ্রানের রোদ্দুরে খোলা হাওয়ায় মস্ত মীটিং জমলো ছেলেদের—বক্তৃতা, বিতর্ক, মন্ত্রণা—তারপর বেলা তিনটের সময় সেই সভার সিদ্ধান্ত একখানা টাইপ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজে প্রমাদবহুল ইংরেজিতে প্রিন্সিপালের দপ্তরে উপস্থিত হ'লো। তার মর্ম এই যে সত্যব্রত নায়ককে আবার কলেজে নিতে হবে, শুধু তা-ই নয়, আগামী ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও সে যাতে দিতে পারে, এই রকম ব্যবস্থা করা চাই, তা যত দিন না হবে ততদিন ছেলেরা কেউ কলেজে আসবে না।

মাস্টার মশাই কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ছেলেটির দুটি নামই বেশ মানিয়েছে দেখছি।' তারপর সেটাকে গোল ক'রে পাকিয়ে ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

দু-দিন গেলো, চার দিন গেলো, কলেজ নিশ্ছান। গোবেচারা গোছের ছেলেরা বই-খাতা নিয়ে ঘোরাঘুরি করলো, কিন্তু এই বিভীষণদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করতে অল্প একটু বাহুবলই যথেষ্ট হ'লো। খুব অগ্রহ বা বলি কেমন ক'রে—একদিন হস্টেলের একটি ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেলো রেল-লাইনের ধারে। আবার কর্তৃপক্ষ-রূপী অজ্ঞানকে সজ্ঞান করবার চেষ্টাও চললো সেই সঙ্গে. কলকাতার কাগজে উঠলো খবরটা, দুটো-একটায় বড়ো হরফে।

হরিহরবাবু প্রিন্সিপালের কাছে এসে বললেন, 'বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না? এখন যা-হয় একটা মিটমাট—'

মাস্টার মশাই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, একটু বাড়াবাড়িই করছে ছেলেরা।'

ধর্মঘটের এক সপ্তাহ কাটলো, তারপর একদিন উজ্জ্বল মিছিল বেরুলো ছাত্রদের ;—কলেজের ছাত্র, হাই স্কুলের, মাইনর স্কুলের, ট্রেনিং

স্কুলের—এমন কি গার্লস স্কুলের মেয়েরাও বাদ গেলো না। শহরের সব ক-টি বিদ্যালয়ে আকস্মিক লাল তারিখ ঘোষণা ক'রে সাত থেকে সতেরো পর্যন্ত বয়সের শো খানেক মেয়ে আর সাত থেকে কুড়ি-একুশ পর্যন্ত শো পাঁচেক ছেলে সুদীর্ঘ সশব্দ বাহিনীতে শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো—বার কয়েক প্রদক্ষিণ করতে-করতে জয়ধ্বনি তুললো আকাশে, প্রিন্সিপালের বাড়ির সামনেও চেঁচামেচি করলো খুব, এবং শেষ পর্যন্ত আমার দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কতগুলি বাছা-বাছা স্লোগানে আমার দ্বৈপ্রহরিক তন্দ্রালু আমেজটাকে ফুটো ক'রে দিলো। চমকে প্রায় উঠেই বসেছিলাম, যখন কানে এলো—'জমিদারের ভিক্ষা চাই!' 'ধনতন্ত্র ধন্য হোক!' কিন্তু একটু মন দিতেই যেই বুঝলাম যে আসলে ওরা বলছে 'জমিদারকে শিক্ষা দাও!' 'ধনতন্ত্র ধ্বংস হোক!' তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাকিযায় ঠেশান দিলাম আবার। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'তে-হ'তে ভালো-ভালো কথারও কী রকম বিকৃতি ঘটে, তা ভাবতে আশ্চর্যই লাগে একটু।

মোটের উপর জাঁকজমক যেটা হ'লো, আমাদের ছোটো শহরের পক্ষে সেটা রীতিমতো রোমাঞ্চকর। শিশুরা মত্ত হ'লো, মহিলারা মুগ্ধ হলেন। সকলেই স্বীকার করলো যে এতটা হৈ-চৈ যখন হচ্ছে, কিছু তার সংগত কারণও আছে নিশ্চয়ই। এমনকি আমার স্ত্রী পর্যন্ত বললেন, 'দুটো মিষ্টি কথা ব'লে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দিলেই তো পারো ওদের। ছেলেমানুষ তো!' মিছিলে সত্যব্রতর হাতে ছিলো নিশান, দু-পাশে তূরী-ভেরী, অর্থাৎ ধ্বনিবর্ধক চোঙ—ভালোই দেখাচ্ছিলো তাকে—বালকদের কাছে, বালিকাদের কাছে, হীরো হ'যে উঠলো সে, সম্ভবত তাদের মায়েদের কাছেও।

সন্ধেবেলা হরিহরবাবু এসে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, 'করছো কী? কলেজ কি তুলে দিতে চাও?'

জবাব দিলাম, 'এত সহজেই যদি উঠে যায় তো গেলোই বা।'

'সত্যব্রত দলবল নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে—হয়তো কলকাতার

কলেজেও স্ট্রাইক ছড়াবে—তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, সরোজ, এখনো যদি আমার কথা না শোনো, তাহ'লে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, কেলেঙ্কারি হবে—লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।'

'কোনো অন্যায় করিনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধতা করেছি, এইজন্য মুখ দেখাতে পারবো না?'

'আরে বাবা, ও-সব ন্যায়-অন্যায়ের কথা রেখে দাও—' দু-হাত তুলে আবেদন জানালেন হরিহরবাবু—'যত বড়োই ন্যায়বান হও, বন্যার সামনে দাঁড়াতে পারবে তুমি? আর এই যে সত্যব্রতর মতো একটা বদমাসকে লীডার বানিয়ে দিলে, এটাই কি খুব ন্যায় কর্ম হ'লো?'

তাই তো! এ-কথা তো ভেবে দেখিনি। অন্যায়কে ঠেকাতে গেলেই অন্যায় যদি প্রবল হয়, তাহ'লে উপায়? একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আমি কিছু জানি না, মাস্টার মশায়ের কাছে যান।'

'বেশ, তা-ই যাচ্ছি। তুমিও চলো।'

গিয়ে শুনি, মাস্টার মশায়ের জ্বর হয়েছে। হরিহরবাবুকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভিতরে গেলাম। খদ্দরের চাদরে গা ঢেকে শুয়ে একটি বিলেতি ঐতিহাসিক পড়ছেন মাস্টার মশায়। আমাকে দেখেই বললেন, 'এসো। ভেবেছিলাম তুমি আসবে।'

ব্যস্তভাবে বললুম, 'না না, আমি সেজন্য আসিনি—আপনার জ্বর হয়েছে?'

'জ্বর কিছু না।' ব'লে চুপ ক'রে রইলেন, যেন আমি আরো কিছু বলবো, এই অপেক্ষায়।

বললাম, 'আপনি সেরে উঠুন, তারপর যা হয় হবে। আপাতত এক্ষুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে আর একজন লোক, সারারাত থাকবে সে আপনার কাছে, আর-কিছু যদি দরকার মনে করেন—'

'দরকার আর কী—' ব'লে শিয়রের টেবিলে পোস্টকার্ডে ঢাকা

গেলাশ থেকে একটু জল খেয়ে চোখ বুজলেন। আমি একটুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থেকে বিদায় নিলাম।

হরিহরবাবুকে বললাম, 'মাস্টার মশায়ের জ্বর হয়েছে, আজ আর কোনো কথা হবে না।'

'ও, জ্বর হয়েছে? তা জ্বরের আর দোষ কী,' ব'লে হরিহরবাবু সূক্ষ্ম ক'রে এমন একটু হাসলেন যে আমার মাথার ভিতর দপ ক'রে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো।

দু-দিন শয্যাগত থাকলেন মাস্টার মশায়, এ-সময়টা তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হ'লো। একলা মানুষ—আর অত্যন্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির, হাতের কাছে এনে না-দিলে কিছুই হ'য়ে ওঠে না—স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর ওখানেই থাকলুম বেশির ভাগ সময়, ওষুধ-পথ্য চললো ঘড়ি ধ'রে, তিন দিনের দিন জ্বর ছাড়লো।

বাঁচলাম। আমাদের এদিকে আবার বিশ্রীরকম একটা ম্যালেরিয়া আছে। বিছানায় উঠে ব'সে মাস্টার মশাই বললেন, 'কলেজের কী খবর?'

'জানি না ঠিক।'

'একবার খোঁজ নাও তো।'

খবর এসে পৌঁছলো সেদিন বিকেলেই। এক গাল হেসে হরিহরবাবু বললেন, 'ওহে, আর ভাবনা নেই। সত্যব্রত একেবারে অনকণ্ডিশনাল অ্যাপলজি দিয়েছে।'

'কিন্তু আমরা তো অ্যাপলজি চাইনি ওর কাছে; ওকে এক্সপেল করেছি।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, সরোজ, মাথা ঠাণ্ডা করো,' হরিহরবাবু গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকালেন। 'শোনো—'

'কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যব্রত এ-কলেজের ছাত্রই আর নয়; তাহ'লে অ্যাপলজি দিচ্ছেই বা কে আর কাকেই বা দিচ্ছে।'

'সেই তো।' ছোট্ট একটু বিজয়ের হাসি ফুটলো হরিহরবাবুর

ঠোঁটের কোণে—তাঁর আদালতের মক্কেল-জেতানো চেহারাটি মনে প'ড়ে গেলো আমার—'সেই তো! প্রিন্সিপাল অসুস্থ, তোমারও দেখা নেই, অগত্যা সুধীরকেই কাজ চালিয়ে নিতে হ'লো। সুধীর ওটা অ্যাকসেপ্ট করেছে।'

'অ্যাকসেপ্ট করেছে?'

'আহা—অমন ক'রে তাকাচ্ছো কেন—শোনো না সবটা। সহজে কি আর করেছে ভাবেছো—তেমন পাত্রই নয় সুধীর—অনেকবার ঘুরিয়েছে—তারপর দশ টাকা ফাইন ক'রে—তবে ছেড়েছে। বলতে পারবে না যে কোনো শাস্তি হয়নি। তা কাল থেকে আবার কলেজ চলবে ঠিকমতো—আর সেটাই তো আসল কথা।'

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে হরিহরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হয়েছে, হয়েছে, ছোটো জিনিশকে আর ঘেঁটে-ঘেঁটে বাড়িয়ে তুলো না তো, কলেজটাকে দাঁড়াতে দাও।' ব'লে হরিহরবাবু আমার কাঁধের উপর সস্নেহে হাত রাখলেন। আমি আস্তে তাঁর স্পর্শ ছাড়িয়ে স'রে এলাম।

৫

এর পরেও আবার মাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হ'লো। বেশি বলতে হ'লো না আমাকে, একটু শুনেই বাকিটা যেন বুঝে নিলেন, যেন মনে-মনে এ-রকম একটা সম্ভাবনাই ভেবে রেখেছিলেন তিনি। এ-বিষয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য শোনার আশায় কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে যখন ব্যর্থ হলাম, তখন আমি বললাম, 'মাস্টার মশায়, আমার অন্যায় হয়েছে, এখানে আপনাকে নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি। আমাকে ক্ষমা করুন।'

আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'থাক এ-সব কথা।'

এর পর অবশ্য যথারীতি কলেজ চললো—যথারীতি কেন, রীতিমতো ভালোই। প্রোফেসররা কয়েকটি ছেলের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে

সকাল-সন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করালেন—বলতে লজ্জা হচ্ছে কথাটা, কিন্তু আর লজ্জাই বা কিসের। হয়তো এরই ফলে, কিংবা ছেলেদের স্বকীয় মেধার জোরে, কিংবা হয়তো হরিহরবাবুর হাতযশে এবং কলেজের কপালগুণে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দু-দুটো স্কলারশিপ উঠলো এই সত্মোজাত অখ্যাত কলেজের নামে। পরের সেশনে হাজার ছাড়ালো ছাত্রসংখ্যা, হস্টেল বাড়াতে হ'লো। সত্যব্রত আই. এ. পরীক্ষা দিলো, পাশও করলো—কেমন ক'রে জানি না—তার পর বি. এ.তে ভর্তি হ'য়ে ফুটবলের কাপ্তেন হ'লো সগৌরবে। শিক্ষার প্রতি দয়া হ'লে ক্লাশে যায় আর শিক্ষকের প্রতি দয়া হ'লে ক্লাশ পালায়: তার অনুচরপোষিত বর্বরতায় প্রোফেসররা পাগল হলেন; কমনরুম থেকে মাসিকপত্র চুরি করে সে, অ্যাথলেটিক ফণ্ড থেকে টাকা—কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায় না। পুজোর আগে পাশের দুটো জেলার কলেজের সঙ্গে খেলায় জিতে এলো সে, আর সে-উপলক্ষ্যে একদিন ছুটি হ'লো, ভোজ দু-দিন। ভর্তি আরো বাড়লো পরের বছর, কলেজ স্বাবলম্বী হ'লো, মাইনে বাড়লো প্রোফেসরদের, আরো দু-জন নিযুক্ত হলেন। সুধীরবাবু অকাট্য তথ্যসহযোগে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য উন্নতির রেকর্ড মফস্বলের কোনো কলেজই আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি।

সবই হ'লো, কিন্তু এই কলেজে আমার আনন্দ আর নেই— সমস্ত জিনিশটা থেকে রস চ'লে গেছে। মিথ্যার, প্রবঞ্চনার, ইতরতার আশ্রয়স্থল পৃথিবীতে কি এতই কম যে তার জন্য আবার নতুন ক'রে একটা বিদ্যালয় বানাতে হবে? বিদ্যালয়!···কিন্তু এর চেয়ে পূর্বপুরুষের প্রমোদভবনই তো ভালো ছিলো, তা নামেও যা কাজেও তা-ই, তাতে কোনো ভান অন্তত ছিলো না। কিন্তু বিদ্যার নামে ব্যবসা? শিক্ষার ছলে দুর্নীতি? না, না, না। রস চ'লে গেছে, স্বাদ চ'লে গেছে, প্রাণ চ'লে গেছে।

মাস্টার মশাইর মনের ভাব আমার অগোচর নয়। ভালো লাগছে না তাঁর, কিন্তু এই ভালো-না-লাগাটা যেটুকু ক্ষেত্র জুড়ে আছে,

তার পরিধি তাঁর জীবনে সংকীর্ণ। প্রতিদিন আমার মনে হয় তিনি চ'লে যাবেন, চ'লে যে যান না তারও কারণ আর-কিছুই নয়—শুধু সেই শারীরিক আলস্য, মনের উদাসীনতা, সংসারের কাছে কোনো প্রত্যাশার একান্ত অভাব, যেটা এতদিনে তাঁর স্বভাবেরই অংশ হ'য়ে গেছে। কলকাতা থেকে কখনোই নড়তেন না, যদি-না আমি হত্যে দিয়ে পড়তুম; আবার এখানে যখন এসেই পড়েছেন, এখানেই বাকি জীবন কেটে যায় তো কাটলোই বা—মনের ভাবটা তাঁর অনেকটা এই রকম। বাইরের ঘটনাজড়িত জগতে তাঁর অস্তিত্বটা যেন নামমাত্র; নিজের মনের মধ্যে এতটাই তিনি সমাহিত যে বাইরের কোনো কিছুই অত্যন্ত অপ্রীতিকর হ'য়ে উঠলেও তাঁর অসহ্য লাগে না। এতদিনে তাঁর সম্বন্ধে লোকের বেশ সুস্পষ্ট একটা ধারণা জন্মেছে—শুধু হরিহরবাবুর আর তাঁর ভাগনের নয়, অধিকাংশ অধ্যাপকের, ছাত্রের, শহরের ভদ্রলোকদের। সেটা এই যে তিনি নিতান্তই ভালোমানুষ, মানে, দুবল মানুষ, তাঁর অনভিপ্রেত কোনো প্রস্তাবে বার-বার না বলবার মতো উদ্যমটুকুও তাঁর নেই ব'লে একটু বেশি পিড়াপিড়ি করলেই প্রায় যে-কোনো বিষয়ে তাঁকে রাজি করানো শক্ত নয়। তিনি কোনো বই লেখেননি, তাই তাঁর গ্রন্থ-মগ্নতার নাম হয়েছে এস্কেপিজম; চল্লিশ বছরে বিপত্নীক হ'য়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি, এবং তিরিশ বছর ধ'রে অর্থোপার্জন ক'রেও এ পর্যন্ত একটি বাড়ি করেননি, তাই তাঁর নাম হয়েছে বাউণ্ডুলে। এও আমি জানি যে ছেলেরা তাঁর পড়ানো পছন্দ করে না, যেহেতু তিনি নোটও দেন না, রসিকতাও করেন না; এবং লাইব্রেরিতে আধুনিক বাংলা কাব্য কিছু আনিয়েছিলেন ব'লে ম্যাথমেটিক্সের সীনিয়র প্রোফেসর দেবাশিসবাবু তো প্রকাশ্যেই বিদ্রূপ ক'রে থাকেন—অবশ্য ঠিক তাঁকে নয়, একটু ঘুরিয়ে সেই সব কাব্যের প্রণেতাদের। মোটের উপর, এখন আর এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে আমি ভুল করেছিলাম; মাস্টার মশায়ের যোগ্য আমরা নই। হরিহরবাবু ভাবে-ভঙ্গিতে স্পষ্টই বুঝিয়ে দেন যে সতীশঙ্কর এই কলেজের একটি অলংকার-

মাত্র, মহামূল্য অলংকার, তার মানে মূল্যবান নয়, ব্যয়সাপেক্ষ; কার্যত তিনিই কলেজ চালাচ্ছেন ভাগনেকে দিয়ে। তিনি মাথা খাটান, আর সতীশঙ্কর মাথা নাড়েন; কাজ করেন সুধীরচন্দ্র আর সই করেন সতীশঙ্কর। আর আমাকে বোধহয় গণ্যই করেন না তিনি; মোটাসোটা বোকাসোকা জমিদার আমি, কলেজের শখ হয়েছে, ভালোই, কিন্তু শখ মিটতে আর ক-দিন—আর তারপর টিঁকিয়ে রাখার জন্য শক্ত-মাথা-ওলা মজবুত লোক চাই তো। হরিহরবাবু পিছনে না-থাকলে উপায় কী।

আমার অর্থ আমার অপরাধ, আমার কর্ম আমার অপবাদ, তাই আমাকে ওঁরা যা ইচ্ছে মনে করুন তাতে কিছু এসে যায় না; কিন্তু স্বভাবতই যিনি বড়ো, তিনি যে ছোটো হ'য়ে থাকবেন, আর তাও আমাকে চোখের উপর দেখতে হবে আর সইতে হবে, এতে আমি মরমে ম'রে আছি। সত্যিই তো মাস্টার মশাই শুধু মাথা নাড়েন আর সই করেন, ভালো-মন্দ কিছু বলেন না; আস্তে-আস্তে—মানে, দ্রুতবেগে—সমস্ত কলেজটা একটা সুবৃহৎ ফাঁকি হ'য়ে উঠছে—বিশ্ববিদ্যালয়কে ফাঁকি দিচ্ছি আমরা, মাস্টারদের ফাঁকি দিচ্ছি, ছাত্রদের তো নিশ্চয়ই—আর নিজের অন্তরাত্মার কথা কিছু না-তোলাই ভালো। মাস্টার মশাই যেন দেখেও ত্যাখেন না, বুঝেও বোঝেন না। হরিহরবাবু এ-কথা বলতেও ছাড়েন না শুনেছি যে কাজে যাদের গা নেই, অনেস্টি দেখিয়ে বাহবা নিতে চায় তারাই, আর ভালোমানুষ না-হ'য়ে তাদেরই উপায় নেই, মাসের শেষে মাইনেটি যাদের মোক্ষম। এ-সব কথা যে মাস্টার মশাইর কানেও না ওঠে তাও নয়, তবু মুখে কথা নেই তাঁর, তবু চোখের দৃষ্টি বইয়ের পাতায় আনত। এক-এক সময় তাঁর উপরই অভিমান হয় আমার, কেন তিনি সহ্য করেন, কেন তিনি জ্ব'লে ওঠেন না, কেন প্রমাণ করেন না তাঁর শ্রেষ্ঠতা, ঘোষণা করেন না তাঁর কর্তৃত্ব? আর তা যদি না-ই করেন, তাহ'লে তিনি কেন প'ড়ে আছেন এখানে—কেন অন্তত চ'লে গিয়েও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না?

কলেজের চতুর্থ বছর শেষ হ'তে চললো; বি. এ. পরীক্ষার সীট পড়লো কলেজে। প্রথম দিনের পরীক্ষার পরে ছেলেরা হৈ-হৈ করতে লাগলো এই ব'লে যে প্রশ্নপত্র দুঃসাধ্য রকমের দুরূহ হয়েছে। দুরূহ মানে, যে-সব নোটের আঠায় তারা মাছির মতো আটকে ছিলো, তা থেকে টপাটপ রসগোল্লার মতো তুলে দেয়া গেলো না উত্তর, কিংবা ভাষাটা ঈষৎ বাঁকা ব'লে প্রশ্নটাই মাথায় ঢুকলো না। দ্বিতীয় দিনে আরো প্রবল হ'লো আন্দোলন, অজ্ঞাতনামা প্রশ্নকর্তার বাপান্ত করতে-করতে অনেক ছেলে নিষ্কলঙ্ক খাতা ফেলে হল ছেড়ে বেরোলো, মাঠে-মাঠে গোল হ'য়ে ব'সে জটলা করলো অনেক রাত পর্যন্ত। লক্ষণ ভালো না।

পরের দিন গণিত পরীক্ষা। পাছে কোনো বিপর্যয় ঘটে, আমি হাজির হলুম পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগেই—তার মানে অবশ্য এ নয় যে গোলমাল হ'লে আমি কিছু করতে পারবো, তবে বিপদের সময় উপস্থিত থাকাটাই আমার কর্তব্য মনে করলাম। পরীক্ষা আরম্ভ হবার মিনিট কুড়ি পরে দেবাশিসবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললেন, 'ছেলেরা গোলমাল করছে।'

মাস্টার মশাই চোখ তুলে তাকালেন।

'কিচ্ছু লিখতে পারছে না কেউ—"ব'লে দিন, স্যর" ব'লে চ্যাচাচ্ছে।'

'আপনি কী বললেন?'

'তাই তো এলুম আপনার কাছে।'

'ব'লে দেবেন কি দেবেন না, সেই কথা জিগেস করতে এলেন?'

'না, না, তা নয়, তা নয়—কিন্তু কী করা যায় এখন—একটা কালির আঁচড় কাটেনি কেউ—এক কথা একশো বার বোঝাতে-

বোঝাতে ফুশফুশ ফুটো হ'য়ে গেলো আমার, অথচ—' কথা শেষ না-ক'রে দেবাশিসবাবু মাথার চুল টানতে লাগলেন।

'কে আছেন ওখানে?'

'সুধীরবাবু—'

'আপনি যান, আপনাকে দেখলেই উৎসাহ পাবে ওরা।'

পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালেন দেবাশিসবাবু।—'আপনি যদি একবার—'

গণিতের অধ্যাপকের দিকে এক পলক তাকিয়ে মাস্টার মশাই বললেন, 'চলুন।'

একটু দ্রুত ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, অপ্রত্যাশিত দ্রুত গতিতে লম্বা বারান্দা ধ'রে হাঁটতে লাগলেন। টাট্টু ঘোড়ার মতো চটপটে দেবাশিসবাবু চলতে লাগলেন সঙ্গে-সঙ্গে; আমি মোটা মানুষ, থপথপ করতে-করতে কেবলই পিছনে পড়তে লাগলাম।

আমি যতক্ষণে অর্ধেক পথে ততক্ষণে ওঁরা দেখলুম হল-এ ঢুকে গেলেন। আর আমি হল-এর দরজায় পৌঁছিয়ে দেখি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সুধীরবাবু আর মাস্টার মশাই। সুধীরবাবু ফিশফিশ ক'রে বলছেন, 'সব ফেল করবে, স্যর, ম্যাসাকার হবে, নাম ডুবনে কলেজের—'

'আপনি যান, বাড়ি চ'লে যান,' ব'লে মাস্টার মশাই কোনো-দিকে না-তাকিয়ে আবার হনহন ক'রে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলেন, আবার আমি পিছু নিলুম তাঁর। ঘরে ফিরে ঘাম মুছতে-মুছতে জিগেস করলুম, 'কী হয়েছিলো?'

'শিক্ষকের কর্তব্যই করছিলেন উনি, ছাত্রদের সাহায্য করছিলেন।'

'সাহায্য করছিলেন?'

'শুধু ছাত্রদের নয়, কলেজকেও। একেবারে পাইকেড়ি হিশেবে ফেল করলে বড়োই বদনাম তো। বড্ড খাটেন উনি কলেজের জন্য, একটু বিশ্রাম দরকার, আমি তাই বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি ব'লে উঠলাম, 'উদ্ধার করুন, মাস্টার মশায়, কলেজটাকে উদ্ধার করুন আপনি।'

কাটা দরজায় ঠাশ ক'রে শব্দ হলো, সুধীরবাবু ঘরে ঢুকলেন। চোখ লাল, উশকোখুশকো চুল। মাস্টার মশাই চোখ তুলে বললেন, 'আপনি—'

'ছেলেরা দোয়াত ছুঁড়ে মারছে, খাতা ছিঁড়ে ফেলছে, খেপে গেছে সব—লোহার হাতে চেপে না-ধরলে এখন আর উপায় নেই,' বলতে-বলতে সুধীরবাবু কাঁপতে লাগলেন।

'দেখছি আমি—'

'আমাকে যদি বলেন—'

'আপনাকে তো বলেছি বাড়ি যেতে।'

'বেশ। তা-ই যাচ্ছি। এ-কলেজের জন্য প্রাণপাত করেছি আমি—এখন আমাকেই তাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনারা। বেশ। কিন্তু তাড়িয়ে দিলেও কলেজের যাতে ভালো হবে তা করতে আমি ছাড়বো না।' ঠোঁট বেঁকিয়ে দুমদাম শব্দে বেরিয়ে গেলেন সুধীরবাবু।

মাস্টার মশাইর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও উঠলাম, পরীক্ষার হল-এর কাছাকাছি আসতেই গোলমাল শোনা গেলো। দেবাশিসবাবু চীৎকার করছেন, হাতজোড় করছেন, আরো তিনজন প্রোফেসর ছুটোছুটি করছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সত্যি খেপে গেছে ছেলেরা।

মাস্টার মশাই ঢুকলেন, প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে চাপড় দিলেন টেবিলে। ছেলেরা সবাই যখন তাঁকে দেখতে পেলো, হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো মস্ত হলটি, এমন স্তব্ধ যে বাইরে ঘুঘুর ডাক স্পষ্ট শোনা গেলো।

মৃদুগম্ভীর গলায় মাস্টার মশাই বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমরা ভুল করছো। বয়স অল্প তোমাদের, কী করছো বোঝো না, বুঝলে নিশ্চয়ই করতে না। নিজেরা প্রস্তুত হওনি, সে-দোষ তোমাদেরই, প্রশ্নপত্রের নয়—'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো একটি ছেলে। তাকে আমি চিনলাম, সেই সত্যব্রত। বললো, 'দেশের এই অবস্থায় পড়াশুনো—'

'বেশ তো, মন না বসে পড়াশুনো কোরো না। কিন্তু পড়াশুনোর সুবিধেটা চাইবে, অথচ করবে না কিছুই, তা তো হ'তে পারে না। যার যা কাজ তা-ই সে ভালো ক'রে করবে, মন দিয়ে করবে, এটাই হ'লো মানুষের শক্তির পরিচয়, যে-শক্তির ফলে স্বাধীনতা, সম্পদ, সম্পূর্ণতা অর্জন করা যায়। এ-শক্তি হারিয়েছি ব'লেই আজ এই দুর্দশা আমাদের। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টায় এই শক্তিকেই যদি আরো হারাই, তাহ'লে তো স্বাধীনতা পাবো না, কিংবা পেলেও সেটা সার্থক হবে না কিছুতেই। পরাধীন ব'লে কি প্রতারণা করবে তুমি? দুঃখী ব'লে পকেট কাটবে? না, তা নয়, তা হ'তে পারে না, আমি জানি তোমরাও তা বলবে না। যারা পরীক্ষা দেবে না তারা আস্তে-আস্তে চ'লে যাও; যদি ইচ্ছা থাকে, চেষ্টা থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহ'লে সামনের বছরের পরীক্ষার জন্য তৈরি হও। আর তা যদি না থাকে, তাহ'লে কলেজ ছেড়ে দাও, যা তোমাদের ভালো লাগে তা-ই করো, কিন্তু সেটাই মন দিয়ে করো, ভালো ক'রে করো।'

মাস্টার মশাই চুপ করলেন। ছেলেদের মধ্যে কথা বললো না কেউ, কেউ মুখ তুললো না। একটু অপেক্ষা ক'রে আবার বললেন, 'আমি ধ'রে নিচ্ছি যে আমার কথায় তোমাদের সায় আছে। যারা পরীক্ষা দেবে না তারা বাড়ি চ'লে যাও, আর দেরি কোরো না।'

ছেলেরা কেউ উঠলো না, নড়লো না, পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ ব'সে থাকলো সবাই। তারপর যেই মাস্টার মশাই বেরিয়ে এলেন, অমনি ভিতর থেকে দুরন্ত চীৎকার উঠলো, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!'

মাস্টার মশাই থমকে দাঁড়ালেন, একটি গম্ভীর আরক্ত উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়লো তাঁর প্রশান্ত মুখে। মাথা নিচু ক'রে ভাবলেন একটু,

চোখ তুলে তাকাতেই পুলিশের খাকি-কোর্তা-পরা একজন লোক তাঁকে অভিবাদন করলো।

আমি ব'লে উঠলাম, 'ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি এখানে কী মনে ক'রে?'

'ঠিক সময়েই এসে পড়েছি, দেখছি, এখনই ভাঙচুর শুরু হবে। বলুন তো রিং-লীডর কে? কয়েকটাকে ধ'রে এক রাত হাজতের মশা খাওয়ালেই ঠাণ্ডা হবে বাছারা। যে যা-ই বলুক, লাল ঝাণ্ডার ওষুধই লাল পাগড়ি।' ব'লে ইন্সপেক্টরবাবু এগোতে যাচ্ছিলেন, মাস্টার মশাই সোজা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে খবর দিলো কে?'

'সুধীরবাবু নিজেই গিয়েছিলেন সাইকেল নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে। এখন আমার হাতে ছেড়ে দিন ব্যাপারটা—আপনারা স'রে পড়ুন—কিছু ভাববেন না, ঠিক ক'রে দিচ্ছি দু-মিনিটে।'

মাস্টার মশাই আস্তে-আস্তে বললেন, 'কিন্তু এখানে আপনার তো কিছু করবার নেই, ইন্সপেক্টরবাবু।'

'বলেন কী! এ-সব গোলমালে আমরা ছাড়া—'

'ঠিক তা-ই! আপনাদের বাদ দিয়েই চলতে চাই আমরা। আপনি চ'লে যান।'

'চ'লে যাবো? কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই। আমি কলেজের প্রিন্সিপাল, আমার অনুমতি না-নিয়ে বাইরের কেউ ঢুকতে পারে না কলেজের মধ্যে। আর আমি যতক্ষণ প্রিন্সিপাল আছি, পুলিশের ছায়া পড়তে দেবো না এখানে। আপনি এখনই চ'লে যান।'

'বেশ।' ইন্সপেক্টরবাবুর মুখ কালো হ'লো। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখবেন, শেষটায় যেন আবার আমাদেরই না শরণাপন্ন হ'তে হয়।'

'শুনছেন না কথা?'

এমন প্রচণ্ড স্বর কখনো শুনিনি মাস্টার মশায়ের। আমি পর্যন্ত কেঁপে উঠলাম।

ইন্সপেক্টরবাবু লাঠি-পুলিশের দল নিয়ে ফিরে গেলেন। মাস্টার মশাইও দাঁড়ালেন, তারপর তিনি ফিরে হল-এর দরজার ধারে দাঁড়াতেই শতাধিক সিংহশিশু একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠলো, 'জয় হিন্দ!' দুটো-তিনটে দোয়াত আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে ঝনঝন শব্দে কালি লেপে দিলো চুনকাম-করা দেয়ালে। ঘোর করতালিতে কানে তালা লাগলো আমাদের।

আর তারপর? তার পরের কথা কী আর বলবো। আস্ত একটা চিড়িয়াখানা যেন ছাড়া পেয়েছে, সেই সঙ্গে পাগলা গারদ। মনুষ্যজাতীয় জীবের কণ্ঠ দিয়ে এত রকমের বিচিত্র জান্তব চীৎকার যে বেরোতে পারে, তা স্বকর্ণে না-শুনলে কখনোই বিশ্বাস করতুম না আমি। বেঞ্চি-টেবিল ভাঙলো ওরা, দেয়াল ক্ষত-বিক্ষত করলো, লাইব্রেরিতে ঢুকে ম্যাপ কাটলো ছুরি দিয়ে, বই ছিঁড়লো, ছারখার ক'রে দিলো ল্যাবরেটরি, আপিশের খাতাপত্র পুড়িয়ে দিলো। দিগ্বিজয় সমাধা ক'রে সগৌরবে বেরিয়ে এলো দল—সত্যব্রত বুক ফুলিয়ে সকলের আগে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!'

পশু-শক্তির সামনে কিছুই করা গেলো না।

সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শহরে র'টে গেলো যে কলেজের প্রিন্সিপাল পুলিশ ডেকেছিলেন জোর ক'রে পরীক্ষা চালাবেন ব'লে, ছেলেদের রুখে দাঁড়াতে দেখে শেষ পর্যন্ত আর সাহস পাননি। সূর্যাস্তের আগে রাস্তার বড়ো-বড়ো প্রত্যেকটি মোড়ে প্ল্যাকার্ড পড়লো: পুরোনো খবর-কাগজের উপর জলজ্বলে লাল কালির ঘোষণায় শহর-সুদ্ধু লোককে এই কথা জানানো হ'লো যে সতীশঙ্কর দেশদ্রোহী এবং গবর্মেণ্টের গুপ্তচর। শহর-সুদ্ধু লোক ছী-ছি করতে লাগলো।

তাঁর পদত্যাগপত্র আমার হাতে পৌঁছলো সন্ধ্যার পর।

রাত ন-টার পরে তাঁর কাছে গিয়ে আমি বললুম, 'গাড়ি রিজার্ভ ক'রে এসেছি, আপনি তৈরি হ'য়ে নিন।'

'আমি তৈরি হ'য়েই আছি।'

তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর জিনিশপত্র তেমনি ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। ভৃত্যের সাহায্যে কাপড়-চোপড় আর খানকয়েক বই আমিই গু'ছে নিলাম স্যুটকেসে, বিছানাও বাঁধা হ'লো। খাওয়া হয়েছে কিনা, এ-কথা জিগেস না-করার মতো বুদ্ধি আমারও হ'লো তখন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম, 'দশটা দশ মিনিটে গাড়ি।'

রাত্রির অন্ধকারে মিশে আমার কালো গাড়ি স্টেশনের দিকে চললো। পথে-পথে শুনলাম চীৎকার, অশ্লীল হাসি, হাততালি, একবার একটা ঢিল এসে লাগলো গাড়ির কাচে। স্টেশনে এসে দেখি, স্টেশন মাস্টার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন, বোধহয় আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যই। মাস্টার মশাইর দিকে চোখের ইশারা ক'রে তিনি জিগেস করলেন, 'কলকাতা যাচ্ছেন বুঝি আজই?' ব'লে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন একটু। প্ল্যাটফর্মে ভিড় ছিলো; মনে হ'লো শহরের অনেক লোকই কলকাতা যাচ্ছে আজ। দুর্গন্ধি ওয়েটিংরুমে ব'সে থাকলাম মাস্টার মশাইকে নিয়ে।

গাড়ি এলো, পাঁচ মিনিট মাত্র দাঁড়াবে।

তাড়াতাড়ি বিছানা পেতে দিলাম—জলের কুঁজো রাখলাম হাতের কাছে, খান দুই বই বের ক'রে দিলাম। 'ভুবন রইলো পাশের গাড়িতে, মাঝে-মাঝে এসে খবর নেবে।·· আর এখানে আপনার জিনিশপত্র যা রইলো···' কথা শেষ করতে পারলাম না, গলা বুজে এলো। প্রণাম করার অছিলায় নিচু হলাম—পাছে ওঁর চোখ আমার চোখে পড়ে—আর-কোনো কথা উচ্চারণ না-ক'রে একটু তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতেই নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। মাস্টার মশাই নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলেন।

ঘণ্টা বাজলো। সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম থেকে চীৎকার উঠলো, 'সতীশঙ্করকে ধিক্! সতীশঙ্করকে ধিক্! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ! জয় হিন্দ!' প্ল্যাটফর্মে শাদা-শাদা ছায়ামূর্তির মতো একটি দল দেখতে পেলাম—সেই অস্পষ্ট আলোতেও সত্যব্রতকে চিনতে পারলাম আমি।

গাড়ি ন'ড়ে উঠলো, গাড়ি চলতে লাগলো যেন ওদের চীৎকারের তালে তাল রেখে। আলো-জ্বলা জানলায় মাস্টার মশায়ের মুখ চকিতে দেখলাম আমি, বেগবান লম্বা গাড়িটা স'রে-স'রে গেলো চোখের সামনে থেকে, গার্ডের গাড়ির লাল চোখ ক্রমশ ছোটো হ'য়ে মিলিয়ে গেলো। তারপর থাকলো অন্ধকার, আকাশের তারা, আর আমার বুকের শূন্যতার মতো প্ল্যাটফর্ম। চীৎকারের শেষ পালা শেষ ক'রে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো সত্যব্রত দল, নির্জন নিঃশব্দ হ'লো স্টেশন, তবু আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম রেলগাড়ির ক্ষীণ, অস্পষ্ট শব্দ—তারপর ক্ষীণতর কোনো শব্দও আর রইলো না, শব্দের রেশ পর্যন্ত না—স্মৃতি না, আশা না, ইচ্ছা না, অভিশাপ কি মনস্তাপ, সংকল্প কি সম্ভাবনা, কিছুই না—ঐ রেলগাড়ির শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই মিলিয়ে গেলো সব, সব গেলো।

আমরা তিনজন

আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম : আমি, আর, অসিত, আর হিতাংশু ; ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে ঢাকা সকাল।

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিলো তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেন্সন-পাওয়া সব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন, এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড়ো রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তা-ই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে-ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোরকাঁটা-ছাওয়া মাঠ ভ'রে গেলো, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হ'লো না।

আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিলো, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিলো পুরানা পল্টনে ; বাকিটা ছিলো এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হলদে-হলদে-সবুজ রঙের ব্যাং, আর নধর সবুজ ভিজে ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর।

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সব সময়—যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকতো, 'বিকাশ! বিকা—শ।' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে ব'সে আছে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধ'রে যেতো আমার। হিতাংশুকে ডাকতে হ'তো না, দাঁড়িয়ে থাকতো তাদের বাগানের ছোটো ফটকের ধারে, কি ব'সে থাকতো

বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চ'লে যেতো পাকা শড়ক ধ'রে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে, আমি আর হিতাংশু ঘুরে-ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধ'রে, হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চ'ড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনোদিন শহরের একটিমাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হ'লো না—চেষ্টা ক'রেও শিখতে পারিনি ওটা, কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক ; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হ'য়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে ব'সে, ছোটো-ছোটো তারা ফুটেছে আকাশে, চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করেছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতো না— আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হ'তো বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিলো না, অসিতের উপরও না, দু-জনে ব'সে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি-চুপি দু-একটা কথা ব'লেই সে চ'লে যেতো।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশ সনে।

নাম তার—অম্বরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতেও প্যাণ্ট প'রে থাকেন, আর ভদ্রমহিল' এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে

ব'লে ভুল হয়—আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলবো। সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় ব'সে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সব সময় দেখা যায় তাকে, মাঝে-মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ;—সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো-একটি মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিলো না, যখন বন্ধ গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিলো আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই এক-একদিন এক-এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়বো না এমন সাধ্য কী আমাদের!

নামটা কিন্তু বের করেছিলাম আমি। রোজ সই ক'রে পাঁউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটি নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার ক'রে লেখা। 'অন্তরা দে।' একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরিই করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, 'নাম কি অন্তরা?'

'কার—' কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বললো, 'বোধ হয়।'

অসিত বললো, 'সুন্দর নাম!'

'ডাকে তরু ব'লে।'

তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিন শো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হ'লো, এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হ'লো, যে সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর্ মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেননা যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, ওদেরই বাড়ির একতলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বললো, 'অন্তরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না কেন, খুব ভালো!' গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভিতরটা কেমন দ'মে গেলো।

'আমি হ'লে অন্তরাই ডাকতাম।'

কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধ'রে! ঈশ! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হ'য়ে উঠলো, বেশ চোখা-চোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফশ ক'রে অসিত ব'লে উঠলো, 'আমিও তা-ই।'

বিশ্বাসঘাতক!

এ-একম ছোটো-ছোটো ঝগড়া প্রায়ই হ'তো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হ'তে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিলো তাতেই বেশি মানিয়েছিলো, না কালকের বেগনি রঙেরটায়; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়েছিলো তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিলো, না চুল ছিলো খোলা; বিকেলে বারান্দায় ব'সে কোলের উপর কাগজ রেখে কি চিঠি লিখছিলো না আঁক কষছিলো— এমনি সব বিষয় নিযে চ্যাঁচামেচি ক'বে আমবা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হ'তো যে-কথা নিযে সেটা একটু অদ্ভুত: ওর মুখের সঙ্গে মোনা লিসাব মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনা লিসাব ছাপা ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি: হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোলো কথাটা—'ওব মুখ অনেকটা মোনা লিসার মতো।' তারপব এ নিযে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমবা, কোনো মীমাংসা হয়নি; তবে একটা সুবিধে এই হ'লো যে আমাদের মুখে-মুখে ওব নাম হ'য়ে গেলো মোনা লিসা। অন্তরাতে যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না—অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর-কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, 'তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই—একই তো বাড়ি,' আব হিতাংশুও একটু লাল হ'য়ে বলতো, 'যাঃ!' যার মানে হচ্ছে যে সেটা হ'লেও হ'তে পারে—আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলতো আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধ'রেই নিয়েছিলাম যে এ-সব কিছু না, শুধুই কথা, কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার একটু পবে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুব পিছনে। নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ ক'রে সাইকেলের উপরে কী-রকম কেঁপে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে আমি প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর আমার গলা, 'উঃ' ব'লে সে নেমে পড়লো, আমিও পায়েব তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন ব'লে উঠলো, 'Take care, young man!' তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী—আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।

'Really you must—' বলতে-বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ রাখলেন।—'Oh it's you! কেশববাবুর ছেলে!'

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে।

'আব এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সব সময়। বন্ধু বুঝি? বেশ, বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।'

ওঁরা চ'লে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হ'য়ে। একটু পরে অসিত বললো, 'কী কাণ্ড!...হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে, না?'

'না তো! ঘাবড়াবো কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—'

'কোনোদিন তো এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা একেবারে ওঁদের সামনে—'

'বেশ তো! হয়েছে কী? কারো গায়েও পড়িনি, প'ড়েও যাইনি হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে—'

'না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলো। আর বিকাশ তো—'

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'চুপ করো, ভালো লাগে না!'

'ও বোধহয় একটু হেসেছিলো,' অসিত তবু ছাড়লো না। ('ও' বলতে কাকে বোঝায় তা বোধ হয় না-বললেও চলে।)

'হেসেছিলো তো ব'য়ে গেলো!' চীৎকার করলো হিতাংশু, কিন্তু সে-চীৎকার যেন কান্না।

'তুমি দেখেছিলে, বিকাশ? ঠিক মোনা লিসার হাসির মতো কি?'

'যা বোঝো না তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!' বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেলো। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দু-দিন আধ-মরা হ'য়ে রইলাম, সাত দিন মন-মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগলো, 'চলো না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।'

'পাগল!'

'পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে! বললেন না?'

ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মালো যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদেব যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে দুঃখিত হবেন—এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তাঁর সম্মানরক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশিরকম ব্যস্ত হ'তে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি, 'আজ', রোজ বিকেলে মনে করি, 'আজ থাক'। কোনোদিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে; কোনোদিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে

শহরের একমাত্র ব্যারিস্টর দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন : আর কোনোদিন বা চুপচাপ দেখে ধ'রে নিই ওঁরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা ব'সে খবর-কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের ততটা নয় যতটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিশফিশানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চ'লে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কিসের, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাবো, বসবো, আলাপ করবো, চ'লে আসবো—ব্যস!

সেদিন আকাশে মেঘ, টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হ'লো, ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকলো অসিত, লম্বা, ফর্শা, সুশ্রী, তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা-পরা, ভদ্রলোক-মাফিক, আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হ'য়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকবো কিনা, কাকে ডাকবো, কী ব'লে ডাকবো, এই সব আমরা যতক্ষণ ধ'রে ভাবছি ততক্ষণে পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধ'রে বললেন, 'Yes?'

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হ'লো। 'আমি—আমরা—মানে আমরা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—'

আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। 'ও, তোমরা! তা...'

অসিত আবার বললো, 'আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ...' একটু কেশে—'এসো, এসো তোমরা,' পরদা তুলে দরজা ছেড়ে স'রে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'যাও, ভিতরে যাও।'

ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিলো, খুব লাগলো আমার, কিন্তু চুপ ক'রে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদা-মাখা-মাখা জুতোয় ঝকঝকে মেঝে নোংরা ক'রে-ক'রে এগিয়ে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় ব'সে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে ব'সে আছে আমাদের মোনা লিসা, কোলের উপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন, 'রুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রী মস্কেটিঅর্স। এটি কেশববাবুর ছেলে, আর এরা...'

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এর নাম অসিত, আর এই হচ্ছে বিকাশ।'

মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদু স্বরে বললেন, 'তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বোসো।'

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ ব'সে পড়লাম তিন জনে। মিসেস দে ডাক দিলেন, 'ভরু!'

মোনা লিসা চোখ তুললো।

'এঁরা আমাদের প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।'

মোনা লিসা বই রেখে উঠলো, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়ালো, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি ক'রে মাথা নোয়ালো একটু, তারপর আবার চেয়ারে ব'সে বই খুলে চোখ নিচু করলো।

আমার মনে হ'লো আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চাইতে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু—সে-ও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তাছাড়া এই তারা-কুটির তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা-একটু ওরা দু-জনেই বললো, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কী বলবো ভেবেও

পেলাম না, বলতেও ভরসা হ'লো না, পাছে আমার বাঙাল টান বেরিয়ে পড়ে। মোনা লিসাকে দেখবার ইচ্ছা ভিতরে-ভিতরে পাগল ক'রে দিচ্ছিলো আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম!

ইলেকট্রিসিটি না-থাকলে জীবন কী-রকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এ-সব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, 'তোমরা কি কলেজে পড়ো?'

অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বললো, 'ইতোমধ্যে পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'বাঃ, বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।'

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠলো, 'বাবা, কীটস কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?'

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ বলতে পারো?'

অসিত ফশ ক'রে বললো, 'বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে—বিকাশ কবিতা লেখে।'

'সত্যি?' মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনা লিসার চোখও আমার উপর পড়লো। হাত ঘেমে উঠলো আমার, কানের ভিতর যেন পিঁ-পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

সবসুদ্ধ, কতটুকু সময়? পনেরো মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগলো, কলেজে চারটে-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।

মিসেস দে জোর ক'রেই একটা ছাতা দিয়েছিলেন, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না-ক'রে ও থাকতেই পারে না—ব'লে উঠলো, 'কী চমৎকার ওঁরা!'

'সত্যি! চমৎকার!' হিতাংশু সায় দিলো সঙ্গে-সঙ্গে।

আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিলো না আমার।

একটু পরে অসিত আবার বললো, 'আজ আবার তুমি হোঁচট খেলে, হিতাংশু!'

'কখন?'

'ঘরে ঢুকতে গিয়ে।'

'যাঃ!'

'যাঃ আবার কী। আর ঘরে ঢুকে নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?'

'নিশ্চয়ই!' একটু চুপ ক'রে থাকলো হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বললো, 'কিন্তু যখন···যখন মোনা লিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো···'

অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম, এবং অন্ধকারেই বোঝা গেলো যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদগবের মতো ব'সেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না কিছু বললাম না, কিচ্ছু না। ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাশ কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখরক্ষা করতে পারলো না।

কী যে মন-খারাপ হ'লো, কী আর বলবো।

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরৎ দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসালো, তারপর···তারপর মোনা লিসাই এলো ঘরে, তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, 'এই ছাতাটা ··' 'ও মা! এর জন্য আবার···বসুন···।' মনে-মনে এইরকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হ'লো একটু অন্য রকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভিতরে চ'লে গেলো, আর ফিরে এলো না, কেউই এলো না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু ক'রে

নিঃশব্দে ফিরে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

না, না। ঐ সুন্দর ক'রে সাজানো ঘর, যেখানে শাদা ধবধবে আলোয় দেয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে ব'সে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো-এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়—সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনা লিসা—মোনা লিসাই।

ঝমঝম করে ক'রে বর্ষা নামলো পুরানা পল্টনে, মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুরুদুরু দুপুর, নীল জ্যোৎস্নায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনেরো দিন ধ'রে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পরে প্রথম যেদিন রোদ উঠলো, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তারের মোটরগাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিগেস করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?'

'না তো।'

তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না-হ'য়েও ব্যক্ত হ'লো। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বললো, 'ওদের বাড়িতেই অসুখ।'

'কার?'

'ওরই অসুখ।'

ওর অসুখ।'

'ওর।'

সেদিনও বড়ো ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দু বেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা একবার যাও তো ভিতরে, উনি একটু কথা বলবেন।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বললো, 'আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা?' কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি ম'রে গেলেও ও-সব পারি না।

মিসেস দে বললেন, 'তরুর অসুখ।' তাঁর কণ্ঠস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিলো।

'কী-অসুখ?'

'টাইফয়েড।' ঐ ভয়ংকর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ ক'রে তিনি বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না।'

অসিত ব'লে উঠলো, 'কিছু ভাববেন না। আমরা সব ক'রে দেবো।'

'পারবে, পারবে তোমরা? ছাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার...' বলতে-বলতে চোখে তাঁর জল এলো।

মোনা লিসা, কোনদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না, কী ভালো আমাদের লেগেছিলো, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়ে ছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধ'রে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামলো না আমাদেব হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিশ যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে; তোমার মা-র সারাদিন পায়ের পাতা দাঁড়ায় না, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন, আর সারা রাত পালা ক'রে-ক'রে জেগে থাকি আমরা, কখনো একসঙ্গে দু-জনে, ক্বচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগার সুখ আমিই পেয়েছি সবচেয়ে বেশি—অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বার-বার, সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দু-মাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে-তিন

মাইল—কোনোদিন অসিত দশবার যাচ্ছে, দশবার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকোলো তার গায়ে, কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটলো বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ রেলের স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেলো তার, এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বার-বার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোটো-ছোটো ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই ব'লে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুরঘুর করি তোমার মা-র কাছে-কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচর লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে ক'রে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না, মোনা লিসা, কোনোদিন জানবে না।

সারাদিন, সারারাত মোনা লিসা মূর্ছিতের মতো প'ড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে-মাঝে—এত ক্ষীণ স্বর যে কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে-ক'টি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দু-জনকে বলাই চাই; কখনো হঠাৎ একটু অবসর হ'লে তিনজনে ব'সে সেই কথা ক'টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিনজন কৃপণ সারা পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাতে। যদি বলেছে 'উঃ', সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে গেছে; যদি বলেছে 'জল', তাতে যেন জলের সমস্ত তরলতা ছলছল ক'রে উঠেছে আমাদের মনে।

এক রাত্রে, হিতাংশু বাড়ি গেছে আর অসিত বারান্দার বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেয়ালের গায়ে ছায়া কাঁপছে বড়ো-বড়ো, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে ঐ আলোটুকু আর যেন পারছে না; আমিও আর পারছি না

ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম, আমার হাত-পা কেটে-কেটে টুকরো ক'রে দিলো, মোমের মতোই গ'লে যাচ্ছে আমার শরীর, যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি, লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে-ডুবতে মনে হ'লো, মোনা লিসা, তুমিও কি এমনি ক'রেই যুদ্ধ করছো মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছো, কেমন ক'রে আছো! মনে হ'তেই ঘুম ছুটলো, সোজা হ'য়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে, সেই ক্ষীণ আলোয়, কাঁপা-কাঁপা ছায়ায়, রাত চারটের স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? তুমি কি বেঁচে উঠবে? কোনো উত্তর নেই। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? উত্তর নেই। তুমি ঘুমিয়েছো, না জেগে আছো? উত্তর নেই। তবু আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হ'লো এর উত্তর আমি পাবোই, পাবো তোমারই মুখে, তোমার মুখের কোনো-একটি ভঙ্গিতে, হয়তো—কে জানে—তোমার কণ্ঠেরই কোনো-একটি কথায়। আর, আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম, আস্তে-আস্তে চোখ তোমার খুলে গেলো, মস্ত বড়ো হ'লো, উন্মাদের মতো ঘুরে-ঘুরে স্থির হ'লো আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো, 'কে?'

আমি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগ চেপে ধরলাম মাথায়।

'কে তুমি?'

'আমি।'

'তুমি কে?'

'আমি বিকাশ।'

'ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন, না রাত্রি?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না?'

'হবে। আর দেরি নেই।'

'দেরি নেই? আমার ঘুম পাচ্ছে, বিকাশ।'

আমি তার কপালে আমার বরফে ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।

'আঃ, খুব ভালো লাগছে আমার।'

আমি বললাম, 'ঘুমোও।'

'তুমি চ'লে যাবে না তো?'

'না।'

'যাবে না তো?'

'না।'

'আমি তাহ'লে ঘুমুই, কেমন?'

নিশ্বাস উঠলো আমার ভিতর থেকে, নিশ্বাসের স্বরে বললাম—'ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।'

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আর বাইরে দু-একটা পাখি ডাকলো। ভোর হ'লো।

প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক, একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দু-জনকে বলিনি, হয়তো ওদেরও এমন-কিছু আছে যা আমি জানি না, আর-কেউ জানে না। তুমি, মোনা লিসা, তুমিও জানলে না, জানবে না কোনোদিন।

তারপর একদিন তুমি ভালো হ'লে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হ'যে পড়লাম। আর তুমি ভাত-টাত খাবার দিন-পনেরো পরে যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন, সেদিন আমার অন্তত মনে হ'লো যে এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওএল পার্টি।

কিন্তু তা-ই বা কেন? এখনো আমরা যেতে পারি, বসতে পারি কাছে, গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি তাকে, সে ক্লান্ত হ'লে পিঠের বালিশটা দিতে পারি ঠিক ক'রে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে শাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে-ফাঁকে নীলের মেলা, এই ক'রে-ক'রে আশ্বিন যেই এলো, ওঁরা চ'লে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে রাঁচি। বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ ক'রে

নারানগঞ্জের স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।

ফার্স্ট ক্লাশের ডেকে রেলিং ধ'রে দাঁড়ানো মোনা লিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হ'লো, তখন আমাদের মনে পড়লো যে ওঁদের রাঁচির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। আমার ইচ্ছে করছিলো বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হ'লো না।

অসিত বললো, 'ওরই তো আগে লেখা উচিত।'

'তা কি আর লিখবে,' একটু হতাশভাবেই বললো হিতাংশু।

'কেন লিখবে না, না-লেখার কী আছে।'

কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এলো না। এলো হিতাংশুর বাবার নামে মনিঅর্ডারে বাড়ি-ভাড়ার টাকা। তা-ই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আমরা চিঠি লিখবো স্থির করলাম। ও লেখেনি ব'লে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাবো, এটা কোনোরকম যুক্তি ব'লেই মনে হ'লো না আমাদের। অসুখ থেকে উঠে গেছে, হয়তো এখনো ভালো ক'রে শরীর সারেনি—কেমন আছে, সে-খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠ লিখবো কী? আপনি লিখবো, না তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই বা এ-পর্যন্ত বলেছি আমরা—এতখানি কথা নিশ্চয়ই বলিনি যার জোরে কালির আঁচড়ে জলজলে একটা তুমি লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবোই বা চিঠিতে? কেমন, ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরিয়ে গেলো। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে কতই তো লেখা যায়—কিন্তু মোনা লিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?

অনেকক্ষণ ধ'রে জটলা ক'রেও কোনো মীমাংসা যখন হ'লো না, তখন ওরা আমাকেই বললো চিঠিখানা রচনা ক'রে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখি, তাই।

সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে-ঘামতে আমি লিখে ফেললাম :

সুচরিতাসু,

ভেবেছিলাম একখানা চিঠি আসবে, চিঠি এলো না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলতো কিনা রোজ সন্ধ্যায়।

ব'সে-ব'সে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের রাস্তা, কালো-কালো সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো— আর যেন কখনো অসুখ না করে।

কারো কোনো অসুখ না-ক'রেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-ব'সে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জুটবে আমাদের।

মাসিমা, মেসোমশায়কে প্রণাম।

আপনি তুমি দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজলো। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই ক-টি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি রোদ্দুর। বার-বার পড়লাম; মনে হ'লো বেশ হয়েছে, আবার মনে হ'লো ছী-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগে ভালো একটি কাগজে নকল ক'রে নিলাম, আর পরদিন তিন জনে বসিয়ে দিলাম যে যার নাম-সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।

ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চার দিন, পাঁচ দিন··· আচ্ছা, ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু-একটু শীত; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটলো; চিঠি নেই।

চিঠি এলো শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটি পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা। অনেকটা এইরকম :

কল্যাণীয়েষু,

হিতাংশু, অসিত, বিকাশ, তোমরা তিনজনে আমাদের বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। আমাদের রাঁচির মেয়াদ শেষ হ'লো, শিগগিরই ফিরবো। ইতিমধ্যে, হিতাংশু,

তুমি যদি আমাদের ঘরগুলি খুলিয়ে তোমাদের চাকর দিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখো, তা'হ'লে বড়ো ভালো হয়। চাবি তোমার বাবার কাছে।

আশা করি ভালো আছো সকলে। তরুর শরীর এখন বেশ ভালো হয়েছে, মাঝে মাঝে সে তোমাদের কথা বলে। ইতি

তোমাদের
মাসিমা

মাঝে-মাঝে আমাদের কথা বলে! আর আমাদের চিঠি! পোস্টকার্ডটি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও এমন-কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না যে চিঠিটি পৌঁচেছিলো। কী হ'লো চিঠির? কিন্তু স-কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদের, তক্ষুনি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যেই তারা-কুটিরের একতলাকে আমরা এমন ক'রে ফেললাম যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড: 'রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।' শুধু স্টেশনে! আমরা ছুটলাম নারানগঞ্জে।

আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনা লিসাকে, কচিপাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লালচে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা পড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে-দূরে থাকলাম, হিতাংশু ছুটোছুটি ক'রে বরফ লেমনেড কিনতে লাগলো, আর অসিত কুলিকে ঠেলে দিয়ে বড়ো-বড়ো বাক্স-বিছানা হাঁই-হাঁই ক'রে তুলতে লাগলো গাড়িতে।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।'

'না, না, সে কী কথা, আমরা—আমরা এই পাশের গাড়িতেই—'

'আরে এসো না—' ব'লে দে-সাহেব অসিতের পিঠের উপর হাত রাখলেন।

নারানগঞ্জ থেকে ঢাকা: মনে হ'লো আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিটের জন্যই অপেক্ষা ক'রে ছিলো। ফার্স্ট ক্লাশের গদিকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা বসলাম বাক্স বিছানার উপর, তাতে একটা সুবিধে এই হ'লো যে একসঙ্গে

সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম মোনা লিসা খুশি, ওর মা খুশি, বাবা খুশি, দেখতে-দেখতে আমরাও খুশিতে ভ'রে গেলাম ; এতদিন যা বাধো-বাধো ছিলো তা সহজ হ'লো, এতদিন যা ইচ্ছা ছিলো তা মূর্ত হ'লো—রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা, এত বড়ো রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশির বেগেই চলেছে। মোনা লিসা নাম ধ'রে-ধ'রে ডাকতে লাগলো আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোনো-এক ঝরনার বর্ণনা দিচ্ছে সে, হঠাৎ আমি ব'লে উঠলাম, 'আমাদের চিঠি পেয়েছিলে ?'

'তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি ?'

আমি একটু লাল হ'য়ে বললাম, 'জবাব দাওনি যে ?'

'এতক্ষণ ধ'রে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরো দেখো।'

মিথ্যে বলেনি মোনা লিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আমাদের। আমরা তিন জন আমরা চার জন হ'য়ে উঠলাম।

তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, 'একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছো, আর-একবার খাটতে হবে। উনতিরিশে অঘ্রান ওর বিয়ে।'

উনতিরিশে ! আর দশ দিন পরে !

ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, 'মোনা লিসা, এ কী শুনছি !'

ভুরু কুঁচকে বললো, 'কী ? কী বললে ?'

গোপন নামটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী। মরীয়া হ'লে মানুষের যে-সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা আগে আমি কখনো করিনি—বেগনি-বেগনি কালো রঙের ওর চোখ, এক ফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, 'মোনা লিসা।'

'মোনা লিসা ! সে আবার কে ?'

'মোনা লিসা তোমারই নাম,' বললো অসিত। 'জানো না?'

'সে কী!'

হিতাংশু বললো, 'আর-কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।'

'মজা তো—' কৌতুকের রং লাগলো ওর মুখে, মিলিয়ে গেলো, পলকের জন্য ছায়া পড়লো সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেলো মুখের উপর দিয়ে। একটু তাকিয়ে রইলো, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর নামলো একবার।

হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য—কী কারণে বুঝলাম না—আমাদেরও একটু যেন মন-খারাপ হ'লো, কিন্তু তখনই তা উড়িয়ে দিলো হাসির হাওয়া, আমাদের কথায় লাগলো ঠাট্টার বুড়বুড়ি।

'কী শুনছি? মোনা লিসা, কী শুনছি?'

'কী শুনছো বলো তো?' ব'লে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল ক'রে হেসে পালিয়ে গেলো।

বর এলো বিয়ের দু-দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্শা, ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হ'য়ে কোথায় উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বার-বার বলতে লাগলো, 'হীরেনবাবু কী সুন্দর দেখতে!'

অসিত জুড়লো, 'ধুতির পাড়টা!'

'পা দুটো!' ব'লে উঠলো হিতাংশু। 'অমন ফর্শা পা না-হ'লে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!'

আমি ফশ ক'রে বললাম, 'যা-ই বলো, ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা।'

'কী! বোকা-বোকা!' অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চীৎকার বেরোলো না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাঁচামেচি ক'রে-ক'রে বিয়ের অনেক আগেই সে গলা ভেঙে ব'সে আছে। রেগে-যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁশফ্যাঁশ ক'রে বললো, 'এমন সুন্দর দেখেছো কখনো!'

'মোনা লিসার মতো তো নয়!' আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।

'একজন কি আর-একজনের মতো হয় কখনো! খুব মানিয়েছে দু-জনে। চমৎকার!' ব'লে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ ক'রে কোথায় যেন চ'লে গেলো। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।

বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলেই মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষরাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিলো তখন—মোনা লিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু-একটু ক'রে আলোর বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে-আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এলো আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখ ভ'রে-ভ'রে উঠলো জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে, শুনতে পেলাম বিয়ে-বাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ;—কাছে গেলাম। মনে হ'লো একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ভোর—এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাবো না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরলো, আমার চোখের সামনে কাঁপতে-কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো মাঠে-মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর-একবার ভোর হ'লো।

সেদিন অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিশফিশে হ'লো, এত ব্যস্ত সে, আমাকে যেন চেনেই না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা দোতলায় দুতের কাজ করতে-করতে সে স্যাণ্ডেল ক্ষইয়ে ফেললো। আমি একবার হিতাংশুকে,

একবার অসিতকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম সারা দিন ভ'রে, কিন্তু আমার নিজের মনে হ'লো না বিশেষ-কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাত পাক ঘোরাবার সময় যখন এলো, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুললো, দু-হাতে দু-জনের গলা জড়িয়ে ধ'রে ও সাত পাক ঘুরলো, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বিয়ের পরদিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেনবাবুর চাকর ব'নে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যেবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা করতে কেউ পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হ'লো তুলনায়—আমারও আর মনে হ'লো না যে তাঁর ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা। এমনকি, আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর মতো ক'রে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে; ওরা দু-জনও তা-ই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেলো আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দু-জনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলিনি।

একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'ছাখো তো ভাই, তরু গেলো কোথায়।'

'ডেকে আনবো?' ব'লে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে সোনা লিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ কেমন নতুন লাগলো তাকে, একটু অন্য রকম, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন-একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে—হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডরেরও না—আমার মনে হ'লো এই সমস্ত মিলিত গন্ধের যেটা নির্যাস, সেটাই ভর করেছে সোনা লিসার শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথা যেন ঝিমঝিম ক'রে উঠলো।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী ?'

'কিছু না—' সঙ্গে-সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো, 'হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেলো না মোনা লিসা ; নিশ্চিন্তে চুলই আঁচড়াতে লাগলো।

'শুনছো না কথা ! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'ডাকছেন তো হয়েছে কী। উনি ডাকলেই যেতে হবে ?'

'বাঃ—!'

চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো—'আর কী—চ'লেই তো যাবো শিগগির।'

আমি বললাম, 'কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায় গিয়ে—ঢাকা কি একটা জায়গা !'

'ঢাকা খুব ভালো।' ঘাড় বেঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকালো একটু, শীতের দুপুরের সবুজ-সোনালি মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই আবার বললো, 'তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ ?'

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'আর কথা না ! চলো এখন।'

'দেখছো না চুল আঁচড়াচ্ছি ! বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।'

কথা শুনে প্রায় চ'টকে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনা লিসা উঠলো, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। এসেই বললাম, 'তারপর ? সেই লোকটার কী হ'লো, হীরেনবাবু ?'

কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনা লিসা চেয়ারে ব'সে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগলো।

আমি পিড়াপিড়ি করলাম, 'বলুন না কী হ'লো !'

'এখন থাক।'

আমি খাটে ব'সে একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, 'এটা পড়েছি। ভারি মজার বই।'

হীরেনবাবু হঠাৎ শোওয়া থেকে উঠে ব'সে বললেন, 'এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি—এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে প'ড়ে ফ্যালো, আমি চট ক'রে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেমন?' বলতে-বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

আর কথা না-ব'লে আস্তে বেরিয়ে এলাম আমি, পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ঘরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও ব'সে ছিলো, ঠিক সেখানটায় ব'সে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই প'ড়ে ছিলো, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আঙুল চালাতে লাগলাম, বার-বার, বার-বার।

আরো এক দিন, আরো এক দিন। যাবার দিন এলো, পেছোলো, আর একটা, একটা দিন শুধু; তারপর চ'লে গেলো।

চিঠি এলো এবার, তিনজনের কাছে একখানা চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে। তিনজনের হ'য়ে জবাব লিখলাম আমি, একটু লম্বাই হ'লো, সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠি বন্ধ হ'য়ে গেলো শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম, দেখতে-দেখতে খাতা ভ'রে উঠলো।

মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছে, সেদিন ওরা আসানসোল বেরিয়ে এলো। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছে, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত ক'মে গেছে হঠাৎ, অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গরম পড়লেই ওরা চ'লে যাবে দারজিলিং।

না-দেখা দারজিলিং-এর ছবি দেখতে লাগলাম মনে-মনে, কিন্তু সে-ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, 'ওরা তো আসছে।'

আসছে! এখানে! ঢাকায়! দারজিলিঙের কী হ'লো?

আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে মাসিমা বললেন, 'শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।'

'কী? অসুখ করেছে আবার?' চমকে উঠলাম তিনজনে।

'না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি,' মাসিমা মৃদু হাসলেন।

খুব খারাপ লাগলো। খারাপ লাগলো মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখও না—এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, যেন খুশিই হয়েছেন খবর পেয়ে। রীতিমতো রাগ হ'লো মনে-মনে।

ওরা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির হলাম। মোনা লিসা সোফায় ব'সে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরিয়েছেন ওকে?

আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।

'কেমন আছো, মোনা লিসা?' আমরা চেষ্টা করলাম ফুর্তির সুর লাগাতে।

সিগারেটের টিনটি মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে একবার মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ ক'রে বললো, 'এই—'

'তোমার নাকি অসুখ?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বললো, 'তোমাদের কী খবর?' তারপর আস্তে-আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগলো, আর সিগারেটের টিনটা মুখে তুলতে লাগলো ঘন-ঘন।

হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যস্তভাবে বললেন, 'তরু, এখন কেমন আছো?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বললো, 'ভালো।'

'তুমি বরং একটু শোও।'

'না, এই বেশ আছি।'

'এই যে তোমরা এসেছো দেখছি। তরু তো এদিকে—' হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।

'হয়েছে কী ওর?'

'হয়নি কিছু, তবে···'

তবে কী? ওর কি এমন সাংঘাতিক কোনো অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হ'য়ে গেছে, যেন আধ-মরা, আস্তে কথা বলে, একভাবে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে, হাসি পেলে ভালো ক'রে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনা লিসার নাকি এই হ'লো।

ছোটো একটি প্লেট হাতে ক'রে মাসিমা এসে বললেন, 'এটা একটু মুখে দিয়ে খ্যাখ তো।'

'কী, মা?'

'খ্যাখ না—' ব'লে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।

'না, না, আর না,' মোনা লিসার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।

বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম আমরা, মন খুবই বিষণ্ণ। হঠাৎ অসিত বললো, 'ও বার-বার থুতু ফেলছিলো সিগারেটের টিনে।'

'যাঃ!' আমি আঁৎকে উঠলাম।

'সত্যি! আমি দেখলাম।'

হিতাংশু বললো, 'তাহ'লে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।'

'অসুখ না,' অসিত গম্ভীরভাবে বললো, 'ওর ছেলে হবে।'

শুনে হিতাংশুটা খুকখুক ক রে হেসে উঠলো। 'হাসছো কেন?'— আমি রেগে গেলাম—'হাসবার কী আছে এতে?'

অসিত বললো, 'ঐ জন্যই তো আচার এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হ'লে টক খেতে ভালো লাগে।'

'তুমি সবই জানো।' রাগে আমি গ'র্জে উঠলাম।

'হ'লো কী তোমার?' অসিত, যেন সকৌতুকে, আমার দিকে তাকালো।

'যাওঃ! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।' ওদের ত্যাগ ক'রে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলাশেষের আলোয় খাতা খুলে কবিতা লিখতে ব'সে গেলাম।

হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু-দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হ'লো : হীরেনবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো ?'

'না, না, আমিই যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না-তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হ'লো। অসিত সাইকেলে উঠলো—স্টেশনে যাবে সে। হিতাংশু গলা বাড়িয়ে জিগেস করলো, 'কবে আসবেন আবার ?'

'আসবো···তোমরা দেখো ওকে,' ব'লে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু-হু ক'রে উঠলো।

কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কী-রকম ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ শো আটাশ সনে, পুরানো পল্টনের ফাল্গুন মাসে! ঘোড়ার গাড়ি, আর অসিতের সাইকেল, ছোটো হ'তে-হ'তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হ'লো ; আমি আর হিতাংশু ভিতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনা লিসা ফুলে-ফুলে কাঁদছে।

'মোনা লিসা !'

'শোনো, কথা শোনো।'

'হীরেনবাবু আবার তো আসবেন—'

'এর পর ওঁকে আর যেতেই দেবো না আমরা !'

'আর না—আর কেঁদো না, মোনা লিসা, তোমার পায়ে পড়ি।'

থামলো না কান্না। আমি মেঝেতে ওর কাছে হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে গুনগুন ক'রে বলতে লাগলাম, 'আর না, আর কাঁদে না, একটু থামো, একটু চুপ করো, মোনা লিসা !' বলতে-বলতে হঠাৎ গলা ভেঙে গিয়ে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

একটু পরে মোনা লিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, 'এই—কাঁদছো কেন? বোকা!' আমি দু-হাতে মুখ ঢেকে থাকলাম, আমাকে চুলে ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, 'পুরুষমানুষ—কাঁদতে লজ্জা করে না! থামো এক্ষুনি!'

আমি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তাকালাম। ওর সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধ'রে একটু-একটু কাঁপলো, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।

আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, কখনো মন-খারাপ না করে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিশ ওর খেতে ইচ্ছে করে, অসিত শহর ঢুঁড়ে তা জোগাড় ক'রে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চ'লে যাবে, জানা কথাই ; কবে আবার নতুন ইচ্ছে হবে, সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো বলে, তাহ'লে তো কথাই নেই—আহ্লাদে আমরা হাবুডুবু।

হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হ'লেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক ক'রে দেবেন ব'লেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতি বারই মোনা লিসার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। আমরা চুপ ক'রে উপভোগ করি।

হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিনে ওর শরীর অনেকটা সেরেছে, খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারি-ভারি হয়েছে একটু। এবারে দিন দশেক থাকলেন তিনি, তারপর পুজোর সময় এসে একমাস কাটালেন।

ততদিনে ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় কিছুই হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই ;—চোখে কালি পড়েছে, দুটো কথা বললেই হাঁপিয়ে পড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হ'য়ে যায়। আমরা কাছে-কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসিঠাট্টায় ভোলাতে চাই—কিছুই পারি না।

একদিন আমি বললাম, 'বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম পারলে বেশ হ'তো।'

অসিত হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।—'আর যা-ই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!'

লাল হ'য়ে বললাম, 'অসুখ না, অসুখের কষ্ট।'

হিতাংশু বললো, 'কী কষ্ট, সত্যি! সারা রাত নাকি পাইচারি করে—ঘুমোতে পারে না, শুতেও নাকি কষ্ট হয়।'

অসিত বললো, 'হবে না! দেখতে কী-রকম হয়েছে, দেখেছো!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'কী-রকম আবার হবে! সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।'

'যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা—'

আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে বললাম, 'এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!'

সত্যি তা-ই, আমার চোখে সত্যি তা-ই দেখলাম। দিন যত কাটলো, ততই ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখলাম আমি, ওর সমস্ত শরীর এক অসহ্য সৌন্দর্যে ভ'রে-ভ'রে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না-ব'লে পারলাম না সে-কথা। আগের বছর যে-দিনে ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিলো, যেদিন রেলগাড়ির একটি ছোটো কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধ'রে গিয়েছিলো, ঠিক সেইরকম একটি প্রথম শীতের আমেজ-লাগা দিনে ও হঠাৎ বললো, 'বিকাশ, তোমার হয়েছে কী বলো তো? বড্ড আজকাল তাকিয়ে থাকো আমার দিকে!'

আমি একটুও লজ্জিত না-হ'য়ে জবাব দিলাম, 'তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছো কিনা, তাই।'

'আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?'

'এখনকার মতো না।'

'তা-ই বুঝি?' মোনা লিসা ভুরু কুঁচকে বাইরে মাঠের দিকে তাকালো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'সত্যি আমাকে ভালোবাসো তোমরা। কিন্তু ও-রকম ক'রে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার।...ঈশ, কী রোদ।'

আমি উঠে সামনের জানলাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?'

পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিলো ভাঁজ-করা, খুলে গায়ের

উপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'আজকাল তুমি বেশ ভালোই আছো, না ?'

'আমি তো ভালোই আছি।'

ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা দুটির উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হীরেনবাবু চ'লে গেলেন কেন ?'

'বা রে! ওঁর বুঝি কাজকর্ম নেই ?'

'কবে আসবেন আবার ?'

'আসবেন সময়মতো।'

'কী দরকার ছিলো যাবার—আমার মোটে ভালো লাগে না!'

'হয়েছে, হয়েছে—আর সর্দারি করতে হবে না,' ব'লে পাশ ফিরে চোখ বুজলো। বোজা চোখেই ব'লে নিলো, 'আমি কিন্তু ঘুমোলাম,' এবং বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, বাত্তিবে ঘুমোতে পাবে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে! মনে-মনে বললাম—কার কাছে বললাম জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হ'লো ও হয়তো এতক্ষণে ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পাইচারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার, আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে ? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য ? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই ? ভাবতে-ভাবতে ঘুম ছুটলো চোখের, কবিতার লাইন মনে এলো, উঠে বসতেই চোখে পড়লো ছায়া-ছায়া জ্যোছনা ফুটেছে বাইরে, আমার জানলা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির, স্বপ্নের মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে ব'সে-ব'সে কবিতা বানাতে লাগলাম।

রোজ হ'তে লাগলো এ-রকম, আমার রাত্রি থেকে ঘুম প্রায় চ'লে

গেলো। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে, আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাবো ওকে—এ-কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হ'লো নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর-সুন্দর সব কথা এলো যে নিজেই অবাক হলাম।

এমনি এক রাত্রে—রাত তখন দুটো প্রায়—লিখতে-লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেলো। শুনলাম বাইরে কে ডাকছে আমাকে, 'বিকাশ, বিকা—শ!' একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দু-জন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সে-রাত্রে তখনো চাঁদ ওঠেনি, সারা রাত্রেও বোধ হয় ওঠেনি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত সেটা। আকাশ ছিলো তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রে, মাঠের মধ্যে, ঢিপঢিপ বুকে।

'কী, অসিত? হিতাংশু, কী খবর?'

'আরম্ভ হয়েছে বোধহয়,' কথা বললো হিতাংশু।

'আরম্ভ হয়েছে?'

'একতলায় শুনলাম চলাফেরা কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে?'

আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ শাদা হ'য়ে গেছে, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এ-ক দিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম, হাসি ঠাট্টা ঘোরাঘুরি ক'মে গিয়েছিলো আমাদের, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধ'রে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার সম্বন্ধে একেবারে নীরব হ'য়ে গিয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোটো গেট খুলে কখন এসে সিঁড়ির তলায়

দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করিনি, কোনো কথাও বলিনি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচু গলায় বললেন, 'অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে— একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেলো অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই ব'সে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা, একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকলো, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিন থামবে না।

ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না; ওর ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না: শুধু বাইরে ব'সে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।

ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হ'লো, চললো বাকি রাত ভ'রে, চললো তার পরের দিন। ভোর হ'তেই চড়া মাশুলের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে-মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, আর তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়। ডাক্তার, নর্স, ওষুধ, ইনজেকশন পরিশ্রম, প্রার্থনা;—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়—কী হচ্ছে, কী হ'লো, কী হবে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া আর-কোনো কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি পর্যন্ত করেন না, আর দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারাটির তলায় একজন কুঁকড়োনো বুড়োমানুষ যে লুকিয়ে ছিলো তা কে জানতো। কে জানতো আকাশের নীল নরম ঘোমটার তলায় এই কান্না

লুকিয়ে আছে। আর আমাদের কি আর-কিছু নেই, আর করবার নেই, শুধু কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?

দুপুরের আগেই বিকেল হ'য়ে গেলো সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি হয়েছে, হঠাৎ যেন পৃথিবীর বুক চিরে চীৎকার উঠলো একটা; উঠলো, পড়লো, আবার উঠলো আকাশের দিকে; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হ'লো না; আবার উঠলো চীৎকার, যেন প্রতিমার সামনে ছাগশিশুর আর্তরব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে চ'লে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে, কিন্তু যত দূর যাই সে-শব্দ সঙ্গে চলে আমাদের, মাতা পৃথিবীর আদিম কান্না এটা, এ থেকে নিস্তার কোথায়?

ফিরে গেলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফাঁকে-ফাঁকে ডাক্তারের মোটা গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি। কিন্তু পৃথিবীর কান্না তো থামে না।

যে-তারা ছিলো মাথার উপর নেমে এলো পশ্চিমে, যে-তারা ছিলো চোখের বাইরে উঠে এলো দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হ'লো, ছোটো-ছোটো অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগলো সেখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, সেই অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিন, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম, মৃত্যুর হাত থেকে অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটিমাত্র ভেসে-চলা আলো-জ্বলা নৌকের। অন্তত এক মুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিলো আজ কি আবার এলো সেই মুহূর্ত?

অসিত ফিশফিশ ক'রে বললো, 'কী হ'লো?'

'হিতাংশু বললো, 'কই, না।'

'সব যেন চুপ?'

'তাই তো।'

'যাবো একবার ভিতরে?' অসিত উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু গেলো না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা কিন্তু আর-কোনো শব্দ

স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে রয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম তাঁর ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো, এমন স্থির হ'য়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম.

'এসো তোমরা ওকে দেখবে।'

অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি-রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে আরো কত কিছু, বেলা দুটো পর্যন্ত শুধু সাজালো... সাজালো, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইলো দু-জন। আরো অনেকে এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে ব'লে... পড়লাম, পিছন-পিছন হেঁটে চললাম একা-একা। ঠিক একা-একাও নয়, কারণ ততক্ষণে হীরেনবাবু এসে পৌঁচেছেন, গাড়ির কাপড়ে, জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে-পাশে।

হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চ'লে গেলেন বদলি হ'য়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করলো ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এলো, পুরানা পল্টনে আরো অনেক বাড়ি উঠলো, ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিলো তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী-একটা অসুখ ক'রে হঠাৎ ম'রে গেলো। হিতাংশু এম. এস-সি. পাশ ক'রে জর্মনিতে গেলো পড়তে আর ফিরলে না, সেখানকারই একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে সংসার পাতলে, এখন এই যুদ্ধের পরে কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে আর আমি—আমি এখনো আছি ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয় উনিশ শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে একটু স্বপ্ন ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে একটু হাওয়া —সেই মেঘে ঢাকা সকাল মেঘ-ডাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি সেই—তুমি। মোনা লিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে